ত্রৈরাশিক

আশাপূর্ণা দেবী

প্রত্যয় প্রকাশনী
৬১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশক
শ্রীবংশীধর সিংহ
প্রত্যয় প্রকাশনী
৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ
কার্ত্তিক, ১৩৭২

প্রচ্ছদঃ গৌতম রায়

মুদ্রণ
শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া সিংহ
স্বপন প্রিণ্টিং
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচী

উঁচুতে ওঠা / ১
জীবন পাওয়ার মানে / ৫৩
এমনও হতে পারে / ১০৭

উঁচুতে ওঠা

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি বাবা যেন একটু বড়লোক বড়লোক হয়ে উঠছে। বাবার কথাবার্তায় চালচলনে হঠাৎ হঠাৎ এসে যাচ্ছে দিব্যি একটু বড়লোকি ছাপ। বাবার সেই সর্বদাই একটা ক্লিষ্ট আর চিন্তাচ্ছন্ন ভাব ছিলো, সেটা আর দেখা যাচ্ছে না তেমন।

মাকেও আর সর্বদা বাবার নাকের সামনে আঙুল তুলে তুলে কটু আর কড়া কথার ঝড় বহাতে দেখা যাচ্ছে না। এই জন্যেই হয়তো দেখা যাচ্ছে না যে, ব'বা আর এখন মার প্রতিটি চাহিদার সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠছে না, 'দরকার তো বুঝলাম। কিন্তু হবে কী করে? পাবো কোথা থেকে?'

এটাইতো ছিলো বাবার অভ্যস্ত বুলি। নির্জীব নির্জীব ভাবে। আর মার ভূমিকাতো সর্বদাই অভিযোগকারিণীর। অনেক সময় রূঢ়রুক্ষ তীব্র অভিযোগে মা প্রায় ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মতো হয়ে উঠতো! এখন আর বেশ কিছুদিন হলো তেমন ভাবটা নেই। বরং বাবার সঙ্গে যেন মার বেশ একটু আঁতাত ভাব! কেবলই যেন বাবাতে মাতে চুপি চুপি কিছু একটা পরামর্শ হচ্ছে। মার ধাতে যেটা ছিল বিরল। মার সব কথা সব অভিযোগ সব চাওয়া আর না পাওয়ার অভিব্যক্তি সবই তো বরাবরই পাড়া জানানো সোচ্চার।

সেই মা এখন গলা নামিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলছে। আর প্রায়ই কিছু না কিছুর কোনো একটা ক্যাটালগ বই থাকছে মার কাছে। মাঝে মাঝে মার মুখে একটা চাপা আহ্লাদের ভাব ফুটে উঠছে সেটাও প্রায় আমাদের অদেখা। মার মুখে আহ্লাদের বিকাশ দেখা যেতো তো শুধু বাপের বাড়ির দিকের কেউ এলে। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্যের। প্রথম উচ্ছ্বাসের পরই তো শুরু হয়ে যেতো বাবার নামে অভিযোগের বন্যা! অভিযোগ সে পক্ষের ওপরও দেখা যেতো, মাকে একটা অপদার্থ লোকের হাতে সঁপে দেওয়ার জন্যে! 'মুখ্যু নয়? কানা খোঁড়া নয়?' তাতে কী? ল্যাদাড়ু বুদ্ধু তো? অতো বিদেসাধ্যি নিয়েও যে লোক স্ত্রী-পুত্রকে হাঁড়ির হালে রাখে, সে অপদার্থ নয় তো কী?

'পিতৃনিন্দে শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝাঁজরা'। এ কথাটা বলেছে দিদি। বলেছে, 'এতো কী হাঁড়ির হাল তাও তো বুঝি না।' কিন্তু মা তো সর্বদাই বলে তাই। মানে বলতো। কিছুদিন থেকে আর বলছে না।

একথা সত্যি, বাপের বাড়ির লোক-টোক এলে মা ইচ্ছে মতন প্রাণ ভরে যত্ন-আদর করতে পায় না আর তার জন্যে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মার ব্যথা বেদনা হতাশা প্রকাশের ভাষাভাষীটা বড়ো উচ্চকিত।

হঠাৎ লক্ষ্য করছি মার সেই উচ্চকিত ভাবটা স্তিমিত। মা বাবার সঙ্গে নরম ভাবে কথা কইছে।...প্রথম প্রথম এতেও ভয় ভয় লাগছিলো! এমন বদল কেন? তারপর দেখছি বদল ঘটছে সর্বত্র।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দ্রুত উত্থানের একটা গতিভঙ্গী এসে যাচ্ছে, খাওয়া পরা আরাম আয়েস ইচ্ছে-পূরণের অনায়াস ব্যবস্থা বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছে, আমরা

দ্রুত সিঁড়ি টপকে টপকে 'ওপর তলায়' উঠে যাচ্ছি।

কিছুকাল আগেও কী আমরা স্বপ্নেও ভেবেছি, লোডশেডিং-এ দুর্ভোগ ঘোচাতে আমাদের ঘরে ঘরে ইনভার্টারের আলো এসে যাবে? আর বলা কওয়া নেই হঠাৎ বাড়িতে একটা রঙিন টি. ভি. এসে যাবে? বলা-কওয়া ব্যতীত তো আমাদের রোগে ওষুধও এসে হাজির হয় না।

অথচ রঙিন টি. ভি.-টা এসে গেল নিঃশব্দে। সেটা বোধহয় ওই 'চুপিচুপি' ফসল!

অথচ ওই সাদাকালো টি. ভি.-টা সেটা প্রায় বছর দশেক ধরে আমাদের ঘরের ওই দেওয়ালটার প্রায় একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে বসেছিল, অথবা বলা যায় বাড়ির একজন সদস্যতুল্যই ছিলো, আপাততঃ তার নির্বাসন ঘটেছে পিছনের বারান্দায়, জড়ো হয়ে পড়ে থাকা কতকগুলো রংচটা ট্রাঙ্ক, কব্জা খোলা সুটকেস আর পুরনো বইপত্তরের জঙ্গলে। পরে হয়তো সস্তা দরে বেচে দেওয়া হবে! সেই সাদাকালোটা আসার আগের কালো দিনরাত্রিগুলো আমার শৈশবের স্মৃতিতে এক ভয়ঙ্কর অনুভূতির ইতিহাস হয়ে আছে। প্রায় প্রতিদিনই দেখতাম খেতে বসে, মার তীব্র তীক্ষ্ণ কটু কাটব্যের ঝড়ের ধাক্কায় বাবা আধখাওয়া থালাটা ফেলে উঠে গিয়ে বিনাবাক্যে জামাজুতো পরে অফিস গেল। আর প্রায় প্রতি রাত্রেই দেখতাম মাঝরাত্রে সেই ঝড়ের ধাক্কায় বাবা বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ওই পিছনের বারান্দায় একটা নড়বড়ে টুলের ওপর বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে রাত ভোর করে ফেলছে।

কোনো কোনো রাতে সেখানে এসে হানা দিয়েও মা চিল চেঁচানি গলায় বলতো, 'যে টাকাগুলো নিজের নেশার শখে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়, সেগুলো রাখতে পারলে আমার একটা শখ মিটতো। ওই একটা মাত্রই শখ।'

কতো বয়েস ছিলো তখন আমার? হয়তো চার-পাঁচ? তবু কথাগুলো স্পষ্ট মনে আছে। দিদির বয়েস তখন বোধহয় বছর আট। তাই হবে। দিদি তো আমার থেকে তিন বছরের বড়ো। সেই সময়ই দিদি হঠাৎ একদিন মাঝ রাত্তিরে, বাবা মা আমি দিদি চারজনের মাঠের মতো বড়ো জোড়া খাটের বিছানা থেকে উঠে এসে, পাশের এই ঘরটায় মাটিতে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ে বলেছিলো রোজ রোজ মাঝরাত্তিরে এই লাগঝমাঝম আর সহ্য হয় না বাবা! আমার আর খাটে শুয়ে দরকার নেই, মাদুরই ভালো।

ওই জোড়া খাটটা নাকি মার বিয়েতে পাওয়া। একমতে যেটাই ছিলো আমাদের বাড়ির দামী ফার্নিচার। ওই খাটখানা ছাড়া আর কোনো ফার্নিচার অবশ্য মা বাপের বাড়ি থেকে পায়নি, তবু মা এমনভাবে বাবাকে কথা শোনাতো, যেন মা মস্ত একটা বড়লোকের ঘরের মেয়ে হয়েও এই হাভাতের ঘরে এসে পড়েছে কপালের দোষে।

কপাল। হ্যাঁ জ্ঞান অবধি এই শব্দটা আমরা অহরহই শুনে আসছি। 'কপাল' মাও বলে, বাবাও বলে। তবে সুরটা দুজনের ভিন্ন। একজনের হচ্ছে রোষে ক্ষোভে তিক্ততীব্র। অপরজনের হতাশায় আর অক্ষমতার লজ্জায় নির্লিপ্ত। 'কপাল!'

দিদি মাঝে মাঝে মাকে বলে, 'কপালই যদি' তো রাতদিন সেই কপাল চাপড়ে আর কপাল খুঁড়ে মরা কেন? আর অন্য একটা লোককে আসামী করাই বা কেন?

মেনে নাও তোমার 'কপাল'।

মা তাতে ধেই ধেই করে ওঠে। এবং এই কথার মধ্যে যে প্রকারান্তরে বাবাকে সহানুভূতি দেখানো হচ্ছে, এই বলে দিদিকে তুলোধোনে।

সেই রাত্তিরে কিন্তু মানে যে রাত্তিরে আট বছরের দিদি রোজ রোজ রাত্তিরে এই লাগঝমাঝম সহ্য হয় না বাবা, বলে অন্য ঘরে এসে শুয়েছিলো সে রাত্তিরে মা এসে দিদিকে তুলোধুনতে শুরু করেনি। মা কী সেদিন দিদিকে ভয় পেয়েছিল? তাই চুপ মেরে গিয়েছিলো?

তবু পরদিন মা আবার যথারীতিই খাটে চারটে বালিশ সাজিয়ে বিছানা পেতেছিল। ভাবটা যেন কিছুই হয়নি। যেন মার গত রাতের কথা মনেও নেই। কিন্তু দিদি এসে নিঃশব্দে নিজের বালিশটা টেনে নিয়ে গিয়ে এঘরে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিলো।

বাবা একবার এসে মৃদুভাবে বলেছিলো, এখানে মশারি-ফশারি নেই মশা কামড়াবে।

শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আট বছরের মেয়ে দিদি, অনায়াসে বাবার মুখের ওপর বলেছিলো, 'সাপে কামড়ানোর থেকে মশা কামড়ানো ভালো।'

বাবা আর কিছু বলেনি। আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলো।

বাবার মুখটা দেখে আমার একটু দুঃখু দুঃখু ভাব এসেছিলো। মনে হয়েছিলো, দিদি যেন কেমন। মায়া-দয়া নেই।

ক'দিন পরে দেখা গেলো এ ঘরে একটা ষণ্ডামার্কা কাঠের চৌকি এসেছে, এবং তার ওপর মশারি টাঙানোর ব্যবস্থা হয়েছে।...

কিছুদিন পরে আমিও সেই দামী খাটের মোহ ছেড়ে দিদির বিছানার একাংশে একটু ঠাঁই পেতে এলুম। খাট বলে নয়, তখনো মা বাবার কাছাকাছি শুতে পাওয়াটা একটু মোহময় ছিলো। সেটা রইল না। দিদির একছত্র সাম্রাজ্যটা সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালকটিকে প্রলুব্ধ করতে লাগলো।

দিদি বললো, কী হলো? তুই আবার মরতে এঘরে এলি যে?

হ্যাঁ, দিদির বাকভঙ্গী ওই রকমই।

আমি অনায়াসে কপটতা করে বললাম, গপ্পো শুনতে। মা কী গপ্পো বলে?

হ্যাঁ, তিন বছরের বড় দিদিই আমার শোবার পর গল্প বলতো। মানে যতক্ষণ না বিছানার প্রধান অংশীদার দুজন এসে হাজির হতেন। তাঁদের তো অনেক কাজ থাকতো। আমরা শোবার পরে হয়তো ঘুমিয়ে পড়ার পরেও আসতেন।

তদবধি সেই চৌকিটায় দিদি আর আমি শুয়েছি। গল্প শোনার বদলে ক্রমশঃ গল্প করার স্টেজে এসে পৌঁছেছি এক সময়। এবং অতঃপর সেই চৌকিতে আর না কুলোনোয় আমার জন্যে একখানা ক্যাম্প খাটের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কুলোবেই বা কেন? আমি তো আড়ে দীর্ঘে বেশ তাগড়াই হয়ে উঠে বসে আছি। এই বয়েসটা, যাকে নাকি কৈশোরকাল বলে, ছেলেগুলো যে হঠাৎ কী হতকুচ্ছিৎ দেখতে হয়ে যায়। হাত পাগুলো হঠাৎ যেন তেধ্যাড়াঙ্গা হয়ে ওঠে, গলার স্বর ভাঙে, আর গোঁফ-দাড়িদের উঁকি দেওয়ার ফলে মুখটা লাবণ্য হারায়। মেয়েদের ঠিক উল্টো।

দিদি সুন্দরীই। দিদি ওই 'টিন' এজার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আরো সুন্দরী

হয়ে উঠেছিলো। যেন আলাদা একটা লাবণ্যের প্রলেপ পড়েছিলো দিদির মুখে। সেটা রয়েই গেছে।

এতদিন যেভাবেই চলুক, আমরা বড়লোক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দিদির সম্পর্কে মা পরম যত্নবতী হয়ে উঠতে শুরু করছে। দিদির জন্যে শাড়ি তো আসছেই সুন্দর সুন্দর, সাজাগোজার জিনিসও আসছে নানা রকম। তবে শাড়িগুলো দিদি গ্রহণ করলেও, ওই শিশি কৌটো টিউব ইত্যাদিগুলো নেহাৎ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ঠেলে রাখছে, আর মাকে বলছে, কেন এই জংলিটার জন্যে ওইসব দামী জিনিস বাজে খরচ করবে মা, বরং তুমি কাজে লাগাও, সেটাই সদ্ব্যয় হবে।

মা খুব রাগারাগি করেছে, বাবার কাছে নালিশও জানিয়েছে তবে দিদিকে টলাতে না পেরেই শেষ অবধি পয়সা দিয়ে কেনা জিনিসগুলো নষ্ট হবার ভয়েই নিজে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে।

আশ্চর্য।

মাও তো দেখছি যেন সুন্দরীই।

সর্বদা যেমন তেমন করে পরা যেমন তেমন একটা শাড়িজামা আর অবিরত খাটুনির সঙ্গে অবিরত গলার শির ফুলিয়ে কপালকে ধিক্কার দেওয়া, এই মূর্তিটার সঙ্গেই আমাদের পরিচয়। তার মধ্যে কোনো সৌন্দর্য প্রকাশিত হবার অবকাশ হত না।

এখন মা সব সময় বেশ ফর্সা আর মোটামুটি ভালো মতো শাড়িজামা পরছে পরিপাটি করে। বাইরে বেরোতে যেমনভাবে পরতো। আর ওই দিদির জন্যে আনা সাজবার জিনিসগুলোর সদ্ব্যয় করে চলে চুলে আর মুখে বেশ লাবণ্য লাবণ্য ভাব। এখন আর সব সময় সংসারের বিচ্ছিরি কাজগুলো নিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে না মাকে। কারণ সর্বদার জন্যে একটা কাজের মেয়ে রাখা হয়েছে, সে অনেক কিছুই করে। বাসন মাজুনি ঘরমুছুনির ওপর এই ছন্দা হচ্ছে একস্ট্রা!

রান্নাটা মা নিজেই করছে বটে, তবে ছন্দা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে খিদমদগারি করতে।

ছন্দা আমাদের খেতে বসবার আগে এই যে আমাদের একটা খাবার টেবিল আছে, যেটা নাকি আমার ঠাকুর্দার আমলের বৈঠকখানার টেবিল ছিলো, সেটাকেই ঘষেমেজে একখানা প্ল্যাস্টিকের সিট পেতে খাবার টেবিল বানানো হয়েছে, সেটাকে মুছে পরিষ্কার করে 'টেবিল সাজায়', রান্নাঘর থেকে থালা গেলাস জল রান্নার জিনিসপত্র সব এনে এগিয়ে দেয় মা পরিবেশন করে।

এ সময় মাকে দেখে সত্যই মনে হয়, মা বোধহয় দিদির মতো বয়েসে দিদির মতোই সুন্দর দেখতে ছিলো। মা তো দেখছি বেশ ফর্সাও।

বাবার অবশ্য চেহারায় তেমন কোনো পার্থক্য ধরা পড়ে না, বাবা যেমন দেখতে ছিলো তেমনিই আছে। পরিষ্কার কাট-এর মুখ একগাদা চুল ময়লা রং ছিপছিপে লম্বা গড়ন। শুধু মুখের সেই ক্লিষ্ট ভাবের বদলে হঠাৎ যেন একটা উদার-উদার ভাব ফুটতে শুরু করেছে। যেন বাবা কোনোদিনই অভাবগ্রস্ত ছিলো না, যেন কোনোদিনই বলতো না, 'হবে কোথা থেকে?...পাবো কোথায়?'...যেন বরাবরই এই ভাবে বলে এসেছে। ঠিক আছে। এসে যাবে। কবে চাই?

আমাদের লেখাপড়া বাবদ প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর কথা বলতে কী খারাপই লাগতো এতদিন। বলবার আগেই ধরে নিতাম শোনামাত্রই বাবার মুখটা একটু শুকনো শুকনো হয়ে যাবে, আর বাবা সেই মুখের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শুকনো গলায় বলবে কবে চাই?

আর তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলবে আচ্ছা, দেখছি।

মা কিন্তু আমাদের বিষয়ে তেমন গা করতো না, বলতো, ওই তো ছিরির ইস্কুল। তার আবার ইউনিফর্ম। তার আবার এতো ফানিকাস্যি।

'ফানিকাস্যি' কথাটার মানে যে কী তা আমার জানা নেই তবে মার মুখে শুনে আসছি চিরকাল।

ইউনিফর্ম নিয়ে কথা উঠেছে আমার হঠাৎ ধাঁ ধাঁ করে লম্বা হয়ে ওঠায়। ওগুলো আর গায়ে হচ্ছে না। কাজেই তার জন্যে আবেদন না করে উপায় হয়নি।

মা বলেছে শক্তপোক্ত আস্ত থাকতে থাকতে বাতিল করতে হবে। কী জ্বালা।.. আবার তার সঙ্গেই হয়তো জুড়ে দিয়েছে, ভেবেছিলাম এবার দুখানা মানুষের মতো বেডকভার কিনবো, বিছানার যা ছিরি। তা সে আশায় ছাই পড়লো।

দিদির অবশ্য লম্বা হওয়া বাবদ নয়, দিদি ক্লাস টেন-এ ওঠার আগে ঘোষণা করে বসলো টেন থেকে শাড়ি পরতে হবে, স্কুল থেকে বলে দিয়েছে। সাদা শাড়ি সবুজ বর্ডার। তার সঙ্গে সবুজ ব্লাউজ।

সেদিন মা নিজ পদ্ধতিতে ধেই ধেই করে উঠেছিল, শাড়ি মানেই তার সঙ্গে একশো রকম ফানিকাস্যি। আবার ঢং কতো। সাদা শাড়ি। সাদা শাড়ি পরিষ্কার রাখা সোজা?

দিদি গম্ভীরভাবে বলেছিল, তাহলে স্কুলে গিয়ে আমার নামটা কাটিয়ে দিয়ে এসো। তুমিও বাঁচো আমিও বাঁচি!...এখন তো দিদি কলেজগার্ল। এখন আর ইউনিফর্মের দায় নেই। যা ইচ্ছে রঙের শাড়ি পরা যায়। পরছিলও ছাপা শাড়ি-টাড়ি। কতো সময় সাবান কেচে ঘরে ইস্ত্রি করেও।...হঠাৎ দিদির জন্যে অহেতুক ভালো ভালো শাড়ি এসে যাচ্ছে আজকাল।

সেদিন দিদি বললো, অনেকগুলো তো জমে গেছে, আবার কেন?

মা একগাল হেসে বললো, বাঃ। এখন কলেজের মেয়ে। রোজ রোজ একঘেয়ে শাড়ি পরে যাবি?

শাড়ি দুটো যে দিদির বেশ পছন্দ হয়েছে তা ওর চোখের আলোর ঝিলিক দেখেই বোঝা গেলো, তবু দিদি শাড়ির বাক্স দুটো বাঁহাতে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললো, কলেজে যাবো পড়তে না শাড়ির বাহার দেখাতে? পুজোর সময়ের জন্যে রেখে দাওগে।

আগে বাক্স করে শাড়ি একমাত্র পুজোর সময়ই আসতো। দেখেছি। অন্য সময় কাগজের খামে।

কথাটা বলে 'পাষাণ হৃদয়' দিদির বোধহয় মার মুখটা দেখে একটু মন কেমন করলো, তাই বলে উঠলো, শাড়ির দোকানে গিয়ে শুধু আমার জন্যে? নিজের জন্যে কিছু সওদা করলে না?

মার মুখটা আবার উথলে উঠলো।

বললো, তা কী আর না করেছি বাপ্‌ু? শাড়ির দোকানে যাবো আর নিজের জন্যে দ্‌ুখানা কিনবো না, এ আবার হয় না কী?

এমনভাবে বললো মা যেন এতেই চির অভ্যস্ত। যেন কিছ্‌ুকাল আগেও মা একট্‌ু ছি'ড়ে যাওয়া শাড়ির ঠিক ছে'ড়া দিকটাই সামনে ঝ্‌ুলিয়ে শ্‌ুনিয়ে বলেনি, দেখ্‌ুক দ্‌ুনিয়াস্‌ুদ্ধ্‌ু সবাই দেখ্‌ুক এ বাড়ির গিন্নীর কী হাল।

জামাকাপড় শ্‌ুকোতে আজকাল আর ছাতে ওঠা হয় না কারণ ছাতের সি'ড়িটা না কি বিপজ্জনক হয়ে গেছে, তাই বাড়িওয়ালা ছাতের সি'ড়ির দরজায় চাবি লাগিয়ে রেখেছে।

'বিপজ্জনক' হওয়াটা অবশ্য আশ্চর্য নয়, কতকালের বাড়ি কে জানে। ঠাকুর্দার আমল থেকে ধরলে, 'আমরাই' নাকি বাড়িটায় বাহান্ন বছর আছি। এবং সাত জন্মেও নাকি মিস্ত্রী লাগে না। তব্‌ু মা বলে, 'ওসব বাড়িওলাব্‌ুড়োর ছল। ছাতের অধিকারটা আর দেবে না, নিজের ম্‌ুঠোয় রাখবে। আমরা তো এখন শত্র্‌ু।'

আমরা কেন শত্র্‌ু?

এ প্রশ্নের অবশ্য উত্তর আছে। কারণ বাড়িওলা এই জরাজীর্ণ বাড়িখানা বেচে ফেলতে চায় এবং ভীষণ বেশি টাকায় বেচবার মতো একটা খদ্দেরও জ্‌ুটেছে, কিন্তু সেই খদ্দের ভাড়াটে স্‌ুদ্ধ্‌ু বাড়ি কিনবে না। আর এদিকে ভাড়াটেকেও ওঠাতে পারছে না। বাবা বলেছে, উঠে কোথায় যাবো বল্‌ুন? আপনিই তাহলে একটা ব্যবস্থা করে দিন।

আমি আপনার জন্যে দোতলা একখানা বাড়ি পঞ্চান্ন টাকা ভাড়ায় কোথায় পাবো শ্‌ুনি?

তাহলে আমি নাচার।

আপনি আমার গলায় বাঁশ দিয়ে চিরকাল ওই তিন পয়সা ভাড়ায় ব্‌ুকে চেপে বসে থাকবেন, এটাই তাহলে ঠিক করেছেন?

সেই সময় মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খরখরিয়ে বলে উঠেছিল, আপনার এই পচা বাড়িতে আমরাও যে খ্‌ুব স্‌ুখে আরামে আছি তা ভাববেন না, ভগবান 'দিন' দিলে নিজে থেকেই উঠে যাবো।

তদবধি বাড়িওলার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। এবং বাড়িওলা ওই 'বিপজ্জনক' বলে ছাতে ওঠাটা বন্ধ করে দিয়ে গেছে।

ওই বন্ধয় আমার কিছ্‌ুই এসে যায় না, বাবারও না। মার হয়তো একট্‌ু একট্‌ু, কারণ মা অনেক সময় আলস্য করে ছাতে না উঠে নীচের উঠোনের তারেই জামাকাপড় শ্‌ুকোতে দেয়। মনে হয় এতে ক্ষতি যা হয়েছে সেটা দিদিরই। দিদি ছাতের অনেকখানি জ্‌ুড়ে ফ্‌ুলের বাগান করেছিলো। সকলের ভাগ্যেই যে টব জ্‌ুটেছিলো তা নয়। মাটির গামলা, গলাভাঙা মাটির কলসি, খালি তেলের ক্যান্, কিসের যেন টিন, সবাইকে মাটি ভরে কাজে লাগিয়েছিলো দিদি। দিদির বাগানে ফ্‌ুল কিছ্‌ু কমও হতো না। সবাইয়ের অতো নামটাম জানি না, তবে গোলাপ আর জবাফ্‌ুল হতে দেখেছি।

সি'ড়ি ওঠা বন্ধ হতে ছাতের দরজায় চাবি পড়তে, দিদির বাগানের বারোটা বেজে গিয়েছিল। সবগ্‌ুলোকে টেনে টেনে নামিয়ে আনা হয়েছিলো বটে, দোতলার

বারান্দায় নীচের উঠোনে, কিন্তু আর তাদের দ্যাখভাল করেনি দিদি।...বললে বলতো দূর! আর ভাল লাগে না। শেষে দেখেছি বাবাই তাদের জলটল দিচ্ছে।

তবে নেহাৎ নাছোড়বান্দা কিছু ফুল ছাড়া আর কোনো গাছে ফুল ফুটতে দেখা যায়নি। শেষ পর্যন্ত গাছগুলোর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে গেছে।...অথচ ওগুলো দিদির প্রাণ ছিলো। কতবার যে ছাতে যেতো দিদি ওদের জন্যে।

কিন্তু শুধুই কী গাছগুলোর জন্যে ছাতে প্রাণ পড়ে থাকতো দিদির? মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে আমার। আরো যেন ছিলো কোনো আকর্ষণ!

যাকগে বাড়িওয়ালার চাতুরিতে দিদির একটা আহ্লাদের জায়গা ঘুচে গেছলো।

ইতিমধ্যে আমাদের সংসারে নতুন হাওয়া ঢুকে পড়েছে, বাবা বড়লোক হয়ে উঠছে।

এটাকেই তো দিন আসা বলে, না কি? তাহলেই তো মা ওই সাহাবাবুর কাছে দেওয়া কথাটা রাখতে পারবে এবার! সাহাবাবুদের সংগে একটা বিরুদ্ধ মনোভাব আমি তো জ্ঞান অবধিই দেখে আসছি। তবে শুনতে পাই নাকি আগে আমার ঠাকুর্দার আমলে দুটো পরিবারে গলায় গলায় ভাব ছিলো। তা তেমন অবস্থা না দেখলেও, এমনি ছাতে উঠে দু'পরিবারের মহিলাদের মধ্যে গালগল্প হতো না তা নয়। আসলে ছাতটা তো একটাই। জ্ঞাতির সংগে ভাগাভাগির ফলে দোতলা এক-তলার যোগসূত্রয় পাকা দেওয়াল উঠে গেছে, কিন্তু ছাতটাকে আর কী করবে? মাঝখানে একটা ফুট তিনেক উঁচু নেহাৎ দীনহীন পাঁচিল গেঁথে সীমানা নির্ধারিত হয়েছে।

কাজেই গল্প করা কেন অনায়াসেই পাঁচিল টপকে দু'বাড়ির মধ্যে আসা-যাওয়া করা যায়। আমাদের যেদিন সাদাকালো টিভি-টা এসেছিল, সেদিন ঘণ্টুর মা আর দিদি ওই পাঁচিলটা ডিঙিয়ে চলে এসে দেখতে এসেছিল।...তখন এ পাড়ায় এখনকার মতো প্রতিটি বাড়ির মাথায় অ্যাণ্টেনা দেখা যেতো না। ঘণ্টুদের বাড়িতেও না।

আমাদেরটা কেনার পর মাঝে মাঝে ছাতের পাঁচিল টপকে আমাদের এখানে চলে এসে সিনেমা দেখতো গান শুনতো ঘণ্টুর খুড়ি আর বৌদি।

তখন মা তাদের খুব আপ্যায়ন করতো, পানটান দিতো। কিন্তু চলে যাবার পর মুখ বাঁকিয়ে বলতো, সামান্য একটা জিনিস! কেনই যে কেনে না বাবা! পয়সার তো অভাব নেই! হ্যাংলার মতো পরের বাড়ি এসে এসে—।

তা সত্যি, পয়সার অভাব যে ঘণ্টুদের নেই তা বাবাও বলতো! তবে মুখ বাঁকিয়ে নয়। বলতো, 'পয়সার অভাব নেই, কিন্তু কী সাদাসিধে চালে থাকে। বাবুয়ানা বিলাসিতার ধার দিয়ে যায় না।'

দিদি বলতো ব্যাপারটা বেশ মজার নারে? যাদের পয়সার অভাব নেই, তাদের শখ সাধের বালাই নেই। যাদের অভাব, তাদেরই যতো শখ সাধের বায়নার স্বভাব।

তা সে তো অনেকদিন আগের কথা। কিছুদিন পরে ঘণ্টুদেরও টিভি এসে গিয়েছিলো। অবশ্য সাদাকালোই। ওরা আর হ্যাংলার মতো এ বাড়িতে এসে হাজির হয়নি সিনেমা দেখতে গান শুনতে।

কিন্তু এখন তো আবার অন্য পরিস্থিতি!

এখন আমাদের বাড়িতে রঙিন টিভি এসে গেছে। যাদের নাকি পয়সার অভাব নেই, তারা যেটা ভাবতেও পারছে না এখনো পর্যন্ত।

কিন্তু এখন মার মধ্যে একটা আক্ষেপের আলোড়ন এহেন ঐশ্বর্যটি ডেকে দেখাবার লোক নেই। ছাতের আনাগোনার পথ বন্ধ। রাস্তা দিয়ে আসা মানে তো একটা ঘটনা। লোকজানাজানিও। তাছাড়া ঘণ্টুদের বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগও তো প্রায় ছিন্ন। যাতায়াত করতে হলে ওই সাহাবাবুর দরজার সামনে দিয়ে যেতে হবে। বাড়ি ভাগের সময় ওইরকম কাদাখোঁচা ব্যবস্থাই হয়েছিলো। ওরা কেউ কারুর মুখ দেখে না। কাজেই একপক্ষের ভাড়াটেরা উজিয়ে অপরপক্ষের বাড়িতে যায় কী করে? মানাবে কেন?

তা এ আক্ষেপ মার বেশ কিছুদিন থেকেই হয়েছে। ওই সিঁড়ির দরজায় তালা পড়ার পর থেকেই। বরাবর আজেবাজে, ময়লাটয়লা শাড়িই ছাতে শুকোতে দিতে হয়েছে মাকে। আর বলেছে, 'দেখুক! দুনিয়ার লোক দেখুক এ বাড়ির গিন্নীর কী হাল।'

অথচ এখন? সর্বদা যে সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো শাড়ি পরেছে, তা দেখবার কেউ নেই! সেগুলোকে নীচেতলার উঠোনের তারে শুকোতে দিতে হয়। দুনিয়ার চোখের আড়ালে।

শুধু ভালো শাড়ি, রঙিন টিভি-ই তো নয়, আরো কতো অভূতপূর্ব জিনিসই তো আসছে আমাদের বাড়িতে মাঝে মধ্যে। রান্নার জন্যে টিভি-তে দেখা বিজ্ঞাপনের মতো 'প্রেসার কুকার' মশলা গুঁড়োবার জন্যে কী যেন একটা সবকিছুর অতো নামও জানি না। কিন্তু আহ্লাদের আধখানা মাঠেই মারা যাচ্ছে! পড়শীরা দেখছে না।

কিন্তু এতো সব আসছে কোথা থেকে?

সেটাই তো রহস্য লাগছে আমাদের। বাবা তো চিরকালের চাকরীটা ছেড়ে নতুন কোনো চাকরীও করেনি। পুরনোটায় যদি মাইনে-টাইনে বেড়েও থাকে, কতো বাড়বে?

পুজোর বাজার করতে এবার মা যে পেটমোটা মানিব্যাগটা নিয়ে আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে পড়লো দেখে তো মনে হলো না বাবার বোনাসের টাকার অতোটা বাড়বৃদ্ধি ঘটেছে! তাছাড়া—এবারে তো 'বোনাসের' নামটামও শুনিনি। এখনো বোধহয় পায়ওনি। অন্য অন্য বার তো ফিরলেই মা পুজোর বাজারের কথা তুললেই বাবা 'বোনাস'এর কথা তুলেছে। বোনাসটা না পাওয়া পর্যন্ত কী করে হবে?

মা বেদম রাগারাগি করেছে। এমনকি কখনো কখনো কেঁদেছেও—'দোকানের সব ভালো ভালো কাপড় ফুরিয়ে যাচ্ছে' বলে।

তখন আবার আরও একটা আক্ষেপ থাকতো—'ঘণ্টুদের বাড়ির ওরা' কতো আগে সব সেরে ফেলছে। পুজোর বাজার করার সময় কিন্তু ঘণ্টুদের বাড়ির ওদের খুব দরাজ হাত দেখা যেত। ওদের যে কতো দিকে কতো আত্মীয়-টাত্মীয়, তাদের জন্যে কিনতো! আমাদের তো শুধুই আমরা আর মার দুই বোন, অর্থাৎ বড় মাসি ছোটমাসি, আর এদিকে মাত্র বাবার একজন বুড়ি পিসিমা।

বড় মাসি ছোট মাসির অবস্থা নাকি আমাদের থেকে 'অনেক ভালো', তাই মা

তাদের 'যেমন তেমন' কাপড় দিতে লজ্জা পায়। বাবার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে বেশি দামের কাপড় কেনে। বলে, 'ওরা অমন সস্তামার্কা শাড়ি অঙ্গে তোলে না।'

কিন্তু মজা এই মাসিরা মাকে যে শাড়ি দেয় তা কিন্তু সস্তা মার্কাই। বোধহয় ভাবে, মা তো এই রকমই পরে।

তা সে কথা বলবার সাধ্য আর কার আছে?

বাবার তো নয়ই। আমি অবশ্য অতো সস্তা না ফস্তা বুঝি না, তবে দিদি আড়ালে বলেছে, আহা মার বড়লোক বোনদের নজর কী উঁচু। দেখেছিস, কী শাড়ি দিয়েছে মাকে?

ভালো নয় বুঝি?

'ভালো নয় বুঝি!' ন্যাকাচণ্ডী! দেখে ভালো মন্দ বুঝতে পারিস না?

না বাবা! বেশ তো রং।

ওই রংই আছে। যেমন না পাড়ের ছিরি তেমনি জমির ছিরি।

শাড়ির গাটাকে যে 'জমি' বলে, তা দিদির ওইরকম কথা থেকেই শিখেছিলাম আমি। জমি মানে 'মাঠ' 'মাটি' 'জায়গা' এইসবই তো জানি। তাইতো শুনি সর্বদা। দিদির সঙ্গে থেকে থেকে অনেক কথা শিখে ফেলি আমি। অবশ্য সবটাই দিদি নয়। ঘণ্টুদের বাড়িতেও খুব কথার চাষ! ঘণ্টুকে তো মাঝে-মধ্যে স্কুলের বন্ধুরা বলে 'পিসি!' তোর যা মেয়েলি কথা। ঠিক 'পিসি'র প্যাটার্নের। তোকে আমরা এবার থেকে পিসি ডাকবো।

ঘণ্টু দমে না। বলে, তা ডাক না। একটা কিছু বলে ডাকা নিয়ে কথা! পিসি বললেই কী আর আমি তাই হয়ে যাবো?

ঘণ্টুর একটা মজার গুণও কোনো কিছুতেই দমে না। হাসে, আর বলে, বলে নে। আমার তো আর গায়ে ফোসকা পড়বে না।

ওদের নাকি 'ঘানির তেল'-এর ব্যবসা! বন্ধুরা হেসে হেসে বলে, 'তার মানে তোরা 'তৈলপায়ী' অর্থাৎ তেলাপোকা।'

তাতেও ঘণ্টুর গায়ে ফোসকা পড়ে না। এমন কী পাড়া সূত্রে ওর ডাকনামটা জেনে ফেলে স্কুলে চাউর করে দেওয়ায় সক্কলে ওকে ওর পোশাকী নাম 'কিশলয়'-এর বদলে ঘণ্টু নামে ডাকতে শুরু করেছে তাতেও না।

কিসেই বা ওর গায়ে ফোসকা পড়ে?

ওই যে ও মাঝে মাঝে এক একদিন আমার বাবার কাছে ইংরিজি পড়া বুঝে নিতে আসে, দেখে মা একদিন ইঁটের মতো মুখ করে বলে উঠেছিলো, 'আচ্ছা ঘণ্টু তোমাদের তো পয়সার অভাব নেই, তোমার দাদা কাকা তো তোমার জন্যে পাঁচটা মাস্টার রাখতে পারেন!'

তাতেও ঘণ্টুর গায়ে ফোসকা পড়েনি। বরং খুব অবহেলায় বলেছিলো, হ্যাঁ! মা বাপ মরা একটা ছেলে, তার জন্যে মাস্টার রাখবে। খেতে পরতে দেয়, এই ঢের!

মা বললো, তার মানে? তোমাদের সব টাকাপত্রে তোমার বাবার দরুন কোনো ভাগ নেই?

ঘণ্টু দুটো হাত উল্টে বললো, ভগবান জানে!

আবার দিদি যে বলে, তোদের বাড়ির আর সবাই তো দেখতে ভালোই রে, মা

বলে সোনারবেনেরা নাকি দেখতে ভালোই হয়। তোর এমন কাদাখোঁচা ধাভড়া একখানা চেহারা কেন রে? থাকিসও তেমনি বিচ্ছিরি করে। দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। তাতেই কী ওর গায়ে ফোসকা ওঠে?

ও হেসে হেসে বলে, জন্মানোর সময়ই আমার মা মরে গিয়েছিলো বলে দিদিমা বোধহয় আমায় ঠ্যাং ধরে সাবান জলের বদলে কালি-গোলা জলে চুবিয়ে চান করিয়েছিলো, তাই এমন একখানা চেহারা।...বলে পিত্তি জ্বলা খুব খারাপ রে পুতুল, সকালে এক গেলাস করে পাতিলেবু মেশানো জল খাস!

ঘণ্টু যদিও আমার বন্ধু, আমার ক্লাশ ফ্রেন্ডও তবু দিদিকে ও তুই করে কথা বলবেই। আসলে ও দিদি আর আমার দুজনের কমন ফ্রেন্ড। কারণ ওর বয়েসটা দিদি আর আমার মাঝামাঝি। আমার থেকে দু'বছরের বড়ো, দিদির থেকে এক বছরের ছোটো। স্কুলে একই ক্লাশ তার কারণ ওদের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করার জন্যে তেমন ব্যস্ততা নেই। দিলেই হবে। তাছাড়া আবার 'হাতেখড়ির' ব্যাপারটাও মানে। 'পাঁচ বছর না হওয়া পর্যন্ত চরে বেড়াক', এই হচ্ছে নিয়ম।

সেই নিয়মের ফলে ঘণ্টুকে দু'বছরের ছোটদের সঙ্গে একই ক্লাশে পড়তে হচ্ছে। আর এক বছরের বড় বন্ধুটা ওর থেকে তিন ক্লাশ উঁচুতে উঠে গিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক দিয়ে ফেলে কলেজে ভর্তির ফর্ম জোগাড় করে বেড়াচ্ছে।

তা বলে ঘণ্টু যে তার জন্যে লজ্জিত কুণ্ঠিত তা মোটেই নয়।

মা যখন একদিন মার অভ্যস্ত ইঁট ইঁট মুখটা করে বলেছিলেন, পুতুল তো তোমার বন্ধুর 'দিদি', তুমি ওকে তুই তুই কর কেন ঘণ্টু? ওকে তোমারও দিদি বলা উচিত! শুনে ঘণ্টু প্রায় ঘর ফাটানো হাসি হেসে বলেছিল, কী? পুতুলকে 'দিদি' 'আপনি' এইসব বলতে হবে?

'আপনি' বলতে বলা হয়নি। বলছি দিদি তুমি করে কথা বলা উচিত তোমার।

আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। ওই মাত্র এক বছরের বড়োটাকে দিদি বলতে যাবো! হা হা হা। পুতুল তো আমারও বন্ধু।

দেখলাম পুতুল ওরও বন্ধু বলায়, মা ভীষণ বিরক্ত হয়ে গেলো। তেতো তেতো গলায় বললো, কথাটা বলতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিলো ঘণ্টু। 'বন্ধু' হয় সমানে সমানে। লেখাপড়ায় তুমি তো ওর নখের যুগ্যিও নয়। পুতুল আর দু'দিন পরে কলেজে ঢুকবে। আর তুমি ক্লাশে ফেল করে একটা বছর পিছিয়ে বসে আছো।

এতেও ঘণ্টুর গায়ে ছ্যাঁকা লাগলো না! কাজেই ফোসকা পড়ার কথাও ওঠে না। তাই অনায়াসেই বললো কি না, সবাই কী আর সব বিষয়ে সমান হতে পারে কাকিমা? আমি পুতুলকে তুলে ধরে লোফালুফি করতে পারি, এক হাতে তুলে ধরে আছাড় মারতে পারি, ও তা পারবে আমায়? আমাকে এক ইঞ্চি নড়াতে পারে কি না তাই দেখুন।

মা রেগে বললেন, তোমাদের বাড়ির কালচারের উপযুক্ত কথাই বলেছো।

এতেও ওর গায়ে ফোসকা পড়লো না।

তবে শুনে ফোসকা পড়েছিলো দিদির। বলেছিলো এই পলু ডাকতো লক্ষ্মী-ছাড়া ঘণ্টাটাকে।

ঘণ্টু এসে বললো, কী বলছিস?

বলছি, তুই না কি বলেছিস, আমায় ধরে লোফালুফি করতে পারিস? এক হাতে তুলে আছাড় মারতে পারিস?

ও বললো, বলেছিই তো।

বটে। ভারী আসপদ্দা হয়েছে। দেখি তো—কেমন সাধ্যি। দেখা বলছি।

দেখে আমি অবাক, ও সত্যিই টপ করে দিদিকে দু'হাতে তুলে নিয়ে বারকয়েক প্রায় লোফালুফিই করলো। শূন্যে উ'চু করে তুলে বলতে লাগলো, এই পলু দেখে রাখ। সাক্ষী রইলি। পাশমার্ক রইলো।

ছাড় ছাড় বলছি। নামা শীগ্গির।

দিদি নেমে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, জংলী! বুনো!

কিন্তু তারপরই বলে বসলো, একটা পেপারেই পাশমার্ক হয় না! দ্বিতীয়টা দেখি?

দ্বিতীয় মানে?

কেন এক হাতে ধরে আছাড় মারা। দেখি কতো জোর।

ঘণ্টু প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেল। ধ্যাৎ! ওটা আবার দেখানো যায় না কি? দিদি বলে কেন নয়? হেসে ফেলে বলে, ওটা দেখানো যাবে না।

দিদি বললে, শুনছি না। দেখাতেই হবে তোকে! যখন অহঙ্কার দেখিয়েছিস।

ঘণ্টু হাত জোড় করে বললো, ঘাট হয়ে গেছে বাবা। মাপ করে দে।

মাপ করাকরির মধ্যে আমি নেই। তোকে দেখাতেই হবে।

ঘণ্টু দু'হাতে নিজের দুই কান মুলে বললো, একশোবার ঘাট মানছি বাবা! বলিস তো মেপে সাত হাত নাকে খৎ দিচ্ছি। এবারকার মতো ক্ষ্যামা করে দে।

দিদি বললো, ঠিক আছে, খবরদার আর কখনো ওরকম হে'ড়ে বোকার মতো কথা বলবি না।

'হে'ড়ে বোকা' কথাটা মোটেই আমাদের বাড়ির কথা নয়, ওটা ওই সাহাবাড়ির কথা। আমাদের বাড়িওলা সাহাবাবুও (ঘণ্টুদেরই জ্ঞাতি তো) বলে আমার ঠাকুদ্দা বুড়ো একখানা হে'ড়ে বোকার মতো কাজ করে গেছলো। ভাঙা ই'টের দরে আস্ত দোতলা একখানা বাড়ি ভাড়া দিয়ে বসেছিল।

দিদি যে কেন সেই ভাষাটা শিখে বসে আছে।

মা শুনতে পেলে রেগে আগুন হয়। বলে, তোর কী আগাপাশতলা জংলি! হে'ড়ে বোকা! সাতজন্মে শুনিনি এমন কথা। তোর কী করে শিখে নিতে ইচ্ছে করলো?

দিদি অবশ্য মার রাগটাগ কেয়ার করে না। বরং মার কান ঘে'ষেই আরো বেশি বেশি বলে!

তবে মাও কী আর তেমন কিছু বলে না? ঘণ্টুর উদ্দেশ্যে বলে না, 'ধেড়ে খোকা!' ধেড়ে খোকার আদিখ্যেতা দেখেছিস? যেন এটা ওর সাতপুরুষের ঘরবাড়ি। দিব্যি ফ্রীজ খুলে ঠাণ্ডা জলের বোতল বার করে ঢকঢক করে গলায় ঢালা হয়।

ফ্রীজও আমাদের বাড়িতেই আগে ঢুকেছিলো। যদিও মাঝারি মতো একটা, আর সেকেণ্ড হ্যাণ্ড। রং করাতে আর অনবরত মেরামতের তাপ্পি মারতে মারতে

যতো খরচ হয়ে চলেছে, তাতে একটা নতুন কেনা হয়ে যেতো। এই নিয়ে মা বরাবর গজগজ' করে আসছে। তবে মনে হচ্ছে এবারে হয়তো মার সে দুঃখু ঘুচবে।

ঘণ্টুদেরও ফ্রীজ এসেছে, তবে অনেক পরে। অবশ্য নতুনই। আর পেল্লায়। বড়ো সংসার তো।

তখন তো ঘণ্টুদের ছিলো না।

মা একদিন খুব নিরীহ গলায় বলেছিলো, তোমাদের বাড়িতে তো ফ্রীজ নেই ঘণ্টু, তোমার কী করে এমন 'র' ঠাণ্ডা জল খাওয়ার অভ্যাস হলো?

ঘণ্টু তাচ্ছিল্যের গলায় উত্তর দিয়েছিলো, কাকিমার এক অদ্ভুত কথা! আরাম আয়েসের অভ্যাসের জন্যে আবার শিখতে দরকার লাগে নাকি, এই যে আপনি, কিনেছেন তাই অভ্যাস হলো। একদিনেই হলো। আগে থেকে শিখতে হয়েছে কী?'

এইরকমই কথা ঘণ্টুর।

মা বলেন, ক্যাঁটকেটে। বলেন, 'ন্যাকা সেজে' দুকথা শুনিয়ে দেওয়ার ফন্দি।

আসলে কিন্তু তা নয়। ওর যা মনে হয় বলে ফেলে। কে কী ভাববে, তা ভাবে না। আর এও আশ্চর্যি! দেখতে একটু ধাব্‌ড়া বড়োসড়ো বলে, মার মনে পড়ে না ঘণ্টু মার মেয়ের থেকেও বয়েসে ছোটো।

আসলে ওকে যেন মার ওই 'সাহাবাড়ির' একটা 'প্রতিপক্ষ প্রতিনিধি' ভাবে। যাদের ওপর মার বরাবর আক্রোশ, 'পয়সা আছে' বলে।

ক্রমশঃ আমাদের অবস্থা পালটানোর সঙেগ সঙেগ মার ভাষা-টাষার ভঙ্গীও পালটাতে শুরু করেছে।. .অনেক সময় কানে খট্ করে বাজে। তা ভালো কথাও খট্ করে বাজে বৈকি অনেক সময়। আমার তো লাগে। মা যখন চিরকালের অভ্যাসে জিনিসপত্তর দিন দিন যা মাগ্যি হচ্ছে তাতে গেরস্থ লোককে না খেয়ে মরতে হবে— না বলে বলে, 'বাজারদর ক্রমেই যেরকম আকাশছোঁয়া হয়ে উঠছে, তাতে মধ্যবিত্তদের কপালে ঘটতে থাকবে অনাহারে মৃত্যু।'

আমার কানে খট খট করে বাজে।

কী করে যে এমন অন্য ধরনের ভাষা রপ্ত করে ফেলেছে মা! মার হেয়ার স্টাইলটা পালটাতে যে এখন মাঝে মাঝে বিউটি পার্লারে যাচ্ছে, কথার স্টাইল পালটাতে কী কোনো পার্লার আছে? দেখিনা তো। তবু পালটাচ্ছে।

যেমন রঙিন টিভি-টা বাড়িতে আসার পর মা তার 'দুচক্ষের বিষ' ওই ঘণ্টুটাকেই ছুতো করে ডেকে এনে দেখিয়ে-টেখিয়ে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, তোমাদের তো আর্থিক অনটন বলে কিছু নেই ঘণ্টু, তবু যে কেন তোমরা সেই পচা পুরনো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটটাই ব্যবহার করছো। আশ্চর্য!

আমার কানে ভীষণ 'আশ্চর্য' ভাবে খট্ করলো।

বোধহয় ঘণ্টুরও করলো।

ঘণ্টু অবাক অবাক গলায় বললো, আমাদের 'কী নেই' বললেন?

বলছি আর্থিক অসুবিধে আর কী?

ও। টাকাপয়সার অভাব নেই বলছেন? তা সত্যি কাকিমা, কাকার যা টাকা আছে, ইচ্ছে করলে একটা কেন দুটো চারটে কিনে ফেলতে পারে। ইচ্ছে থাকলে তো?

যা 'চলছে তাই চলুক।' বৌদি মাঝে মাঝে কী সব বলে বটে দাদাকে, আপনার কেমন সুন্দর শখটখ আছে বলে দৃষ্টান্ত দেখায়, তো দাদা উড়িয়ে দিয়ে বলে, ওসব হচ্ছে ফোতোমি।' আসলে দাদা বাবা কারুরই একদম টেস্ট নেই! আর বোঝে শুধু টাকা।

কথাটা তো মার 'ফর'এই তবু মা যে কেন চটে যায় কে জানে। বলে, ঘোড়েল ছেলে। কেমন ঘুরিয়ে কথাটি শুনিয়ে দেয়।

দিদি বই পড়তে পড়তে হঠাৎ মুখ তুলে বলে, বোধহয় তোমার দেখে দেখে শিখেছে। আজন্ম দেখছে তো!

মা যেন দিদির প্রতিপক্ষ। সবসময় দিদি মাকে ঠোকে। তবু মা তার উঁচুতে ওঠার সাধনায় থামা দেয় না। সেই বাবার সঙ্গে গুজ গুজ করে কী যেন পরামর্শ করে, আর তারপরই বাড়িতে একটা নতুন জিনিস এসে হাজির হয়।

ওই রঙীন টিভি-র কিছুদিন পরই এসে গেলো বেশ ভালো মতো একটা সোফাসেট।

দেখে সত্যিই আমরা হাঁ।

কোথা থেকে করছে এসব বাবা?

মা মুখে আলোর আভা ফুটিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে জিনিসটাকে। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, কীরে? কেমন? খুব সুন্দর না?

আমি বললাম, হ্যাঁ। খুবই তো সুন্দর।

আমার পছন্দকে তারিফ কর তবে! হুঁ বাবা! তোমাদের বাবা একা গেলে আর এমনটি হতে হতো না।

মার মুখে বিজয় গৌরব।

বাবা ওই মুটেগুলোর মজুরি মিটিয়ে দিয়ে ঘরে এলো।

মা পাখার স্পীডটা বাড়িয়ে দিয়ে একটু হেসে বললো, বোসো! হাওয়া খাও।

বাবাকে এমন ভালোবাসার কথা কবে বলেছে মা?

বাবা বললো, তুমিই আগে বসো। তোমারই তো শখের জিনিস। মা কিছু উত্তর দেবার আগেই দিদি ঝপ করে বলে উঠলো, কোন ব্যবসাটা ধরেছো বাবা? স্মাগলিং না ফোঁকোট দালালি? নাকি বেআইনি প্রোমোটারি? এ বয়েসে তো আর ব্যাঙ্ক ডাকাতি সম্ভব নয়।

বাবা কেমন শুষ্ক হয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো দিদির দিকে। তারপর শান্ত মুখে বললো, বাবার জন্যে আর কোনো কিছু বরাদ্দ করতে পারিসনি? কেন? বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী এটাওতো ভাবতে পারতিস।

মা নতুন সোফায় নয়, পুরনো খাটের বিছানাতেই বসে পড়ে বললো, সবসময় এমন ধিক্কার দিয়ে কথা বলিস কেন পুতুল? (আগে হলে অবশ্য বলতো 'ঘেন্না দিয়ে' এখন বললো, 'ধিক্কার দিয়ে') একটু সুখের মুখ দেখতে পাচ্ছি, এতে যেন তোর গাত্রদাহ! তোদের জন্যেই তো সব। তোরা ভালো থাকবি, সুন্দরভাবে সুখে থাকবি —এই বাসনা তো—

দিদি এখন আস্তে বললো, সেটা 'সুন্দর' আর ভালো পথ ধরে আসছে জানলে

হয়তো সুখই মনে করতে পারবো মা।

বাবা আর কোনো কথা না বলে স্নান করতে চলে গেলো। দোতলায় কোনো স্নানের ঘর নেই এ বাড়িতে নীচের তলায় যেতে হয়।

এইসব ছোটখাটো অসুবিধেই যে ভয়ংকর অসুবিধে, তা জ্ঞান হয়ে অবধিই শুনে আসছি, অথচ দিন তো কেটেও যাচ্ছে।

দিদিও আর কিছু না বলে, বাবার জন্যে চা বানাতে গেল। যদিও তখন একটা কাজের মেয়ে আছে, সেই সব করে, তবু বাবার জন্যে চা-টা দিদিই করে সকাল সন্ধ্যে। আগে তো বাবা বরাবর এই সময় চায়ের সঙ্গে মুড়ি খেতো। তেল নুন কাঁচালঙ্কা দিয়ে। হয়তো তার সঙ্গে একটু শশা কী নারকেলকুচি, কিংবা দু'একটা বেগুনি। এখন আর মা রোজ মুড়ি চালাতে দেয় না। বলে 'দুঃখী খাবার'! ব্যঙ্গ করে বলে, 'মেছুনির আঁশচুপড়ির মতো! প্রাণটি পড়ে থাকে ওই দুঃখী খাবারের ওপর। ..এই হচ্ছে মধ্যবিত্ত মানসিকতা।'...নতুন কিছু নেবার ক্ষমতা নেই।

মা যে এতো ভালো ভালো কথা কী করে শিখে ফেলেছে এন্তার, তা বুঝতে পারি না! আগে তো তবু গল্পের বই কি মাসিক পত্র-পত্রিকা পড়তে দেখতাম, এখন তো তাও দেখি না। এখন শুধু নানান ক্যাটালগের বই, আর যতরাজ্যের রান্নার বইটই। অথচ এখন কথা শিখছে ভালো ভালো।'

তবে রান্নার বই দেখে ভালো ভালো রান্নার পরীক্ষা চালাচ্ছে এটা আমাদের পক্ষে অন্ততঃ আমার পক্ষে বেশ মনোরম। এই যে মা প্রায়ই কিমার চপ বানায়, মাছের ফ্রাই বানায়, মাংসর পুর দিয়ে ডিমের পাটিসাপটা বানায়, কিছু না হলো তো মা প্রেসার কুকারে মাংসের ঘুগনি বানায়, এসব বাপু বেশ আকর্ষণীয়। দিদিও অখুশি নয়। অথচ বাবার যেন চায়ের সঙ্গে মুড়ি দেখলেই খুশি। এতে মার রাগ করবার নিশ্চয়ই রাইট আছে।

মা তো আজকাল বাজার করে এনে দেবার জন্যেও বাবার ধার ধারে না। নিজেই নেমন্তন্নবাড়ি যাবার মতো সেজেগুজে বাজার করতে বেরোয়। পাড়ার বাজারকে নস্যাৎ করে দূরে কোথাও বাজারে যায়। পাড়ায় গিয়ে লাভ কী? পাড়ার বাজারে তো মেয়েদের বিশেষ দেখা যায় না। মার চেনাদের তো নয়ই। এ পাড়ায় বৌ মেয়েদের বাজার যাবার অভ্যাস নেই। তবে আর কাকে মা ওই সাজগোজ আর বাহারি থলিতে শৌখিন শৌখিন জিনিস কেনা দেখাবে? শৌখিন জিনিস না কিনলে তো আর শৌখিন রান্নাও হবে না।

দিদি বলে, ভদ্রমহিলার এলেম আছে। উঁচুতলায় উঠবার জন্যে খাটতেও তো কম হয় না।

দিদির ওই এক অভ্যাস। মার কথায় বলবে, 'ভদ্রমহিলা' বাবার কথায় বলবে 'বেচারী ভদ্রলোক'।

এই যে সোফা আনার দিন মা সেই কোন দুপুরে বেরিয়েছিল, সন্ধ্যার সময় গলদঘর্ম হয়ে ফেরে। খাটুনি নয়? বাবার সঙ্গে বোধহয় বলা কওয়া ছিলো, তাই মা-বাবা দুজনে একসঙ্গেই ফিরলো।

বাবা স্নান করতে গেলো, মা পরে যাবে। বাবার তো দশ মিনিট, মায়ের সওয়া ঘণ্টা। ওই একতলায় পুরনো বাথরুমের দেওয়ালেও ব্র্যাকেট পুঁতে তাক বসিয়ে

মা এখন অনেক রকম শিশি কৌটো আর চিরুনীও রেখেছে। এতকাল তো বাথরুমের জানালাটার ধাপের ওপর সাবান মাজন আর তেলের শিশি এই তিনরকমই মাত্র থাকতো। কিন্তু বড়লোক হতে হলে তো আর চিরকালের তুচ্ছ জিনিসপত্র নিয়েই কাটানো চলে না।

আজ মা রান্নাঘরে কিছু করবার সময় পাবে না বলে কাজের মেয়েটাকে বলে গেছলো বোধহয়, 'যা পারবি করে রাখবি।' সে তার নিজস্ব বুদ্ধিতে, যেটা সহজে পারবে, তাই করে রেখেছিলো। স্রেফ শুধু 'আলুর চপ'! আগে যেটাকেই আমরা 'চপ' বলে জানতাম। তার সঙ্গে বেগুনীও।

দিদি চায়ের সঙ্গে বাবার সামনে এনে দিলো—একবাটি তেল নুন মাখা মুড়ি আর একটা প্লেটে চার-পাঁচটা সেই আলুর চপ এবং কখানা বেগুনি।

বাবার মুখে বেশ একটু খুশির আলো ফুটে উঠলো। যেন অনেকদিন পবে চেনাজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বললো বেশ! তোদের কই?

আসছে। ভাজছে এখনো।

বাবা একটা বেগুনীতে কামড় দিলো, বললো গ্র্যান্ড!

তারপর একটা আলুর চপে কামড় দিয়ে বলে উঠলো, ফাইন!

দিদি হেসে বললো, বাবা! তোমার আর কোনোদিনই 'বড়লোক' হয়ে ওঠা হবে না। বড়জোর 'ধনী মহিলার স্বামী' এই পরিচয়েই সমাজে একটু জায়গা পাবে।

দিদির কথাবার্তা এইরকমই। 'বাবা' বলে সমীহ করে না। ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না।

বাবাও কিছু মনে করে না। জানে তো। তাই হেসে উঠে বললো, শুধু তাই বা কেন? 'বড়মানুষের ছেলেমেয়ের বাবা' বলে নয় কেন? 'স্ত্রী সন্তানদের বড়লোক করে দিয়ে যাবো', এই ব্রতই তো গ্রহণ করেছি।

হাসলো বটে, কিন্তু মনে হলো যেন গভীর একটা ভাব ফুটে উঠলো বাবার মুখে।

দিদি বলে উঠলো, চমৎকার। খুব মহৎ ব্রত। কিন্তু ব্রত পালনের পদ্ধতিটা কী?

সে তোকে বলতে যাবো কেন? সিক্রেট ব্যাপার। বলেছি তো 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।'

দিদি একটু চুপ করে বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাণিজ্য' কথাটার তো রং রূপ ব্যাখ্যা আর মানে মাত্র একটাই নয় বাবা! বাণিজ্যর অনেক মানে। তাই নয় কি? লক্ষ্মীঠাকুরের বাহনটি তো প্যাঁচা। অন্ধকারেই যতো আনাগোনা!

বাবা একটু অবাক হয়ে বললো, এইটুকু বয়েসে তুই এতো কথা শিখলি কী করে রে পুতুল?

দিদি বললো, ওর আর শেখাশিখির কী? জানা কথাই তো লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা! তার স্বভাবও সকলের জানা। হঠাৎ হঠাৎ কিন্তু আমার বড্ডো ভয় করে বাবা!

বাবা হেসে উঠে বললো, ভয়টা কিসের? একবার বৈ তো দু'বার মরে না মানুষ!

বড়লোক হয়ে ওঠা কী খুব দরকারি ছিলো বাবা?

বাবা হঠাৎ স্বভাব ছাড়া উত্তেজিত হয়ে উঠে বললো, ছিলো না? বলিস কী রে? খুব ছিলো! কোনো কিছু বিনা দামে পেতে চাইলে চলবে কেন? দাম দিতে হয়

না?...টিকিট না কেটে—ট্রেনে চেপে বসেছি, তার জন্যে 'এক্সেস ফেয়ার' দিতে হবে না?...

বাবাও যেন আজকাল প্রায়ই অন্য ধরনের কথা বলতে শিখেছে। আগে বাবার কথার স্টকই তো ছিলো প্রায় যাকে বলে সীমাবদ্ধ! বাবা কোন সময় কী ধরনের কথা বলবে, সে আমাদের প্রায় মুখস্থ ছিলো। বেশির ভাগই হতাশ হতাশ। 'কপাল।' 'অদৃষ্ট!' 'ভাগ্য।' এইটাই পুঁজির মধ্যে ছিলো বেশি! অথচ আজকাল আর সে কথাগুলো শুনতেই পাই না।

ওই অন্য ধরনের কথাটা বলার পরই বাবা হঠাৎ একদম সহজ গলায় বলে উঠলো, কই রে? তোদের কই দিলো?

বলতে বলতেই কাজের মেয়ে সাবিত্রীদি এক থালা ওইসব নিয়ে এসে নামালো।

বাবা আর দুটো নাও।

বাবা বেশ দুষ্টু হাসি হেসে বললো, বলছিস? না খেলে খুব দুঃখিত হবি, তাই না? তাহলে দে। তোদের মা এসে পড়বার আগেই সেরে নেওয়া ভালো। না হলে তেলে ভাজা জিনিস বেশি খাওয়াব অপকারিতা নিয়ে লেকচার দিতে বসবে।

আমি বলে উঠলাম, আহা। মা নিজে করে না? চপ ফ্রাই কাটলেট, এসব তেলে ভাজতে হয় না?

বাবা জোর গলায় হেসে উঠে বলে, এই দ্যাখো। কিসের সঙ্গে কী? ওসব হলো শৌখিন ব্যাপার। আর এ যে নেহাৎ গাইয়া। 'বেগুনি আলুর চপ!' একদম গাঁইয়া। তারপর আরো হেসে গলার স্বর নামিয়ে বলে, তবে সাঁটবে বেশ কিছু। ওরও তো খুব প্রিয় ছিলো এ দুটো জিনিস! কতদিন আগে যেন বলেছিলো, যদি যতো ইচ্ছে তেল পাই তো রোজ বেগুনি ভেজে খাওয়াই তোমাদের।...'তোমাদের' মানেই, বুঝতে পারছিস তো? মশাই, ওঁর পাতে দৈ দিন। হা হা।

বাবা কী অকারণ এতটা আলতুফালতু কথা বলে হাসলো? না কি সকারণ? বাবা কী দিদির মনের জমাট বাঁধা ভয়টাকে দেখে ফেলে সেটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

আজকাল মা প্রায় বড় মাসি ছোট মাসিকে বাড়িতে ডাকে। বলে, আসবি, দুপুরে একসঙ্গে খাবো। একদিন হঠাৎ বলে বসেছিলো, আসবি! এখানে 'লাঞ্চ' করবি। বলে ফেলেই বোধহয় নিজের কানে খচাং করে ফুটেছিলো। তাই হি হি করে বলেছিলো, মনে থাকবে তো? হুঁ বাবা! ভুলে যাবার ভয়ে 'জম্পেস' একখানা নাম দিলাম।

অবশ্য কথা ঘুরিয়ে অন্যরকমভাবে বলতে ওস্তাদ মা চিরদিনই। দিদি হেসে হেসে বলে, 'রিপু মাস্টার!'

সত্যি বাজে চাল ফলাতে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ এমন একটা কথা বলে ফেলে বাইরের লোকের সামনে, যে বলে নিশ্চয় নিজের কানেই বোকার মতো লাগে। তখন ওইরকম যাহোক ভাবে সামলায়। ছেঁড়া কাপড় রিপু করার মতোই।

সেদিন ছোট মাসি বড় মাসি এলো।

আসলে সোফাসেটটা না দেখানো পর্যন্ত সুখ হচ্ছিল না। আবার একটা স্ট্যান্ড ফ্যানও কিনেছে সেদিন!

কিন্তু ওরাও তো কম যায় না। মারই বোন তো?

ছোট মাসি বলে উঠলো, এ যেন বাবা ময়লা পোশাকের সঙ্গে সোনার মুকুট। এই ছিরির বাড়িতে কী আর এসব মানায়?

দিদি বাড়ি ছিলো না। কলেজ গিয়েছিলো, আমি ছিলাম। আমার কিন্তু সত্যি খুব খারাপ লাগলো। মনে হলো ছোট মাসির নিশ্চয় দেখে হিংসে হয়েছে। আর ভয় করলো মা রেগে উঠে কিছু বলে না বসে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি মা একটু মজা মজার ভাবে হেসে বললো, এই বাড়িতে কী আর থাকছি না কি? ফ্ল্যাট তো বুক করা হয়েছে। 'ওনারশিপ ফ্ল্যাট!'

আমি তো চমকাবোই, মাসিরাও চমকে উঠলো।

হঠাৎ পয়সা হয়ে, কিছু এটা ওটা জিনিস কিনে শখ মেটানো এক, আর জলজ্যান্ত একখানা ফ্ল্যাট কিনতে পারা এক।

দুই মাসিই হুমড়ে পড়ে বললো, তাই? খুব ভালো। খুব ভালো। কোথায় কিনছিস? সল্ট লেকে?

দূর! সল্ট লেকে আর একতিল ফাঁকা জায়গা আছে না কি?

তাহলে?

চট করে বললো না মা। চোখ নাচিয়ে বললো আন্দাজ কর।

কী করে করবো? এই পলু কোথায় রে?

আমি মাথা নাড়লাম। আমি কী করে জানবো? আমিও তো এইমাত্র শুনলাম।

তারপর শুনলাম। মাসিদের কাছে বলার সূত্রেই শুনলাম। 'কেষ্টপুর' না কি যেন, সেখানে। ভীষণ সুন্দর আর ভীষণ আধুনিক।

মা বললো, সেইজন্যেই তো আগে থেকে কিছু কিছু জিনিস কিনে রাখছি। যাতে গিয়েই অসুবিধেয় পড়তে না হয়। এ বাড়ির এ সবের তো সব কিছু নিয়ে যাওয়া যাবে না! মাত্র তো সাড়ে চোদ্দশো স্কোয়ার ফিট ফ্ল্যাট।

আমি হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকি। আমাদের জানা জগৎ থেকে বেরিয়ে পড়ে, মা নিজের একটা জগৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে না কি?

সাড়ে চোদ্দশো স্কোয়ার ফিট্!

এই কথাটা বুঝতেই তো অনেকটা সময় লাগতো মার। এখন মা নিজেই বোঝাচ্ছে। কখন 'ফুট' বলতে হয়, আর কখন 'ফিট' বলতে হয়, এটাই কী জানা ছিলো মার?

দিদিকেও মা ওইকথাই বললো। তবে আর একটু বেশি বললো। বললো, আগে থেকে মোটামুটি কিছু ভদ্রমতো ফার্নিচার কিনে না রাখলে, নতুন ফ্ল্যাটে কী এই সব আজেবাজে জিনিস নিয়ে গিয়ে উঠবো? কী মারকাটারি সুন্দর আর কী আধুনিক! আর কিছু না নিয়ে গিয়ে উঠলে, আশপাশের জনেরা যারা আগে এসেছে তারা কী ভাববে? ভাববেন এমা! কী হত-দরিদ্র গো। শূন্য হাতে এসেছে। বসবে কোথায়? মেঝেয় মাদুর পেতে?

কিন্তু ফ্ল্যাট্‌টা হচ্ছে কোথা থেকে?

মা অনায়াসে বলে দিলো, চারিদিকে তাকিয়ে দেখেছিস কখনো? হাজার হাজার

ওনারশিপ ফ্ল্যাট গজিয়ে উঠছে। সেগুলো পড়ে থাকছে? বলে পড়তে পাবে না। মানুষেই তো কিনছে। আর এমনি সাধারণ গেরস্থ-মানুষেই কিনছে। তবে একসঙ্গে সবটা কী দিতে হবে? অনেক অঙ্ক কষাকষি আছে। তোদের বুদ্ধু বাবাটির দ্বারা কী জীবনেও কখনো হতো না কি? এই তোদের মা হালটি ধরেছে বলেই এবার তোদের হাল ফিরতে চলেছে।...ওই সাহাবাবু, নিকুঞ্জ বুড়ো, কী ভাবে ওর নাকের ওপর দিয়ে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে যাবো, দেখবে পাড়াশুদ্ধু লোক।

দিদি বললো, আস্ত জ্যান্ত একখানা ফ্ল্যাট কেনা তাহলে থলি হাতে নিয়ে আলু পটল কেনার মতোই সহজ?

মা বললো, বললাম তো, অন্যের পক্ষে যাইহোক, তোর মার কাছে সহজ হয়েছে। বড় জামাইবাবুর এক ভগ্নিপতির ওই ব্যাপারে হাত আছে শুনে, কেবলই তাঁর বাড়ি গিয়ে ধর্না দিয়েছি বাবা। এমন কী দু একদিন তাঁর অফিসেও গিয়ে হানা দিয়েছি।

অফিসেও গিয়ে হানা দিয়েছ?

দিয়েছিলাম তো। বলেছিলেন, পুরো স্কীমটার কাগজপত্র, প্ল্যান ফর্ম সবকিছু তো অফিসে না গেলে হবে না। তোদের বাবা বললো, আমি কখন যাবো? আমারও তো সেটা অফিসের সময়। কাজেই একা—মানে ঠিক একা বলা চলে না, বড় জামাইবাবুর এক ভাইকে ধরে করে সঙ্গে যেতে রাজী করিয়ে—বাবাঃ। সে কি অফিস। ঢুকতে গা হিম হয়ে যাচ্ছিলো। ঢুকে দেখি—

দিদি বললো, থাক মা আর শুনতে পারছি না। ভীষণ মাথা ধরেছে। বলে উঠে গেল দিদি। আমার কিন্তু ভয়ানক ইচ্ছে করছিলো। মা একটা ভয়ানক বড় অফিসে ঢুকে পড়ে কর্তাদের সঙ্গে কথা কইছে, ভেবে আমারই তো হাত পা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগলো।...বলেই ফেললাম, তারপর?

মা মুখটা কাঠ কাঠ করে বললো, থাক! আমারও মাথা ধরেছে। ভেবেছিলাম, আগে থেকে কিছু বলবো না, দারুণ একটা 'সারপ্রাইজ' দেবো তোদের।...'যাব জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর।' এই পচা গলির পচা বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে তোমাদের 'নন্দন কাননের' দরজায় পেঁাছে নিয়ে যেতে চাইছি, সেটা এতো গর্হিত হলো? আশ্চর্য! হবেই তো, রক্তের গুণ, যাবে কোথায়?

সব কথা মাথায় ঢুকলো না। তবে সেদিন আর শোনা হলো না, মা কিভাবে সেই 'ভীষণ জায়গা' থেকে নিজের দরকারি কাগজপত্র বাগিয়ে আনলো!

তবে ক্রমশঃ জানতে পারা গেলো, খুব না কি সুবিধের ব্যবস্থা। গোড়ায় 'কতো শতাংশ' যেন দিয়ে, তারপর ইনস্টলমেণ্টে দিলেই চলবে।...

খবর একবার আউট হয়ে গেলে, ছড়াতে দেরী হয় না!

একদিন রাস্তায় ঘণ্টু বলে উঠলো, এই তোরা নাকি ফ্ল্যাট কিনে, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিস?

আজকাল ঘণ্টুকে আর বেশি দেখা যায় না। আসাটাসাও তো প্রায় বন্ধ। হায়ার সেকেণ্ডারির রেজাল্ট বিশেষ ভালো হবে না আন্দাজ করেই ও কলেজে ভর্তির চিন্তা না করে অন্য লাইন ধরবার তালে, বেশ খানিক ঘোরাঘুরি করে

এখন না কি সোদপুরে কী একটা 'টেকনোলজি স্কুলে' ভর্তি হয়েছে। সাতসকালে বেরিয়ে যেতে হয়, ফেরে সন্ধ্যার পর। দুপুরে ওই স্কুল ক্যাণ্টিনেই খায়, রাত্রে বাড়িতে। ছুটিও সপ্তাহের মাঝামাঝি একটা দিনে তাই রবিবারেও পাড়ায় অদৃশ্য।

চমকে বললাম, তোকে কে বললো?

ঘণ্টু বললো, কে বললো, সেটা কোনো কথা নয়, কথাটা তাহলে সত্যি?

বললাম, মা তো তাই বলে বেড়াচ্ছে। ও সবই মার ডিপার্টমেণ্ট।

হঠাৎ রাগের গলায় বলে উঠলো, সব মার ডিপার্টমেণ্ট! তোরা ন্যাকা।...পুতুলও হাত উল্টে বললো, 'তাই তো শুনছি।'

বিশ্বাস কর ঘণ্টু, সত্যিই আমরা কিছু জানি না। শুনে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। না কি খুব শৌখিন ফ্ল্যাটে। তিন-চার লাখ টাকার কম নয়। অতো টাকা বাবা পাবে কোথায়, ভেবেই পাচ্ছি না।

তোরা জিজ্ঞেস করিসনি?

দিদি করেছিলো। বাবা যা বলেছিলো, মনে হয়েছিলো ব্যবসা-ট্যাবসা করে—

ঘণ্টু আরো রাগের গলায় বললো, বিনা মূলধনে যে ব্যবসা হয়, তার নাম হচ্ছে 'ফোঁকট কোম্পানী' বুঝলি! আচ্ছা আমিই জিজ্ঞেস—

আমি হাসবার চেষ্টা করে বলি, তা অতো খাপ্পা হচ্ছিস কেন? কখনো কখনো কি কেউ হঠাৎ বড়লোক হয়ে যায় না?

কেউ কেন, অনেকে হয়। কখনো কখনো কেন, অনেক সময় হয়। যারা হয়, হিরণকাকাকে তাদের দল থেকে আলাদা বলে ভাবতুম। বলেই হঠাৎ হন হন করে হাঁটতে শুরু করে দেয়। স্পষ্ট দেখলাম ঘাড় ঘুরিয়ে কাঁধে চোখ ঘষছে।...

কী হলো রে বাবা!

বাড়ি এসে দেখি দিদি একটা ছবির ফ্রেমকে ঘষে ঘষে মুছছে। ভেতরে ছবিটা নেই, শুধু কাঁচ আর ফ্রেম।

কার ছবি রে দিদি?

দিদি বললো, চোখে বুঝি আজকাল কম দেখছিস? ছবিটা পেলি কোথায়?

তাড়াতাড়ি বলি, না, মানে কার ছবি ছিলো ওতে?

ঠাকুর্দার।

ও, সেইটা? সেই পুজো পুজো ভাবে বসে থাকা, খালি গা পৈতে পরা ছবিটা? কই সেটা?

জানি না। বাবা কাচটা মুছছিল ছবিটা বার করে নিয়ে, তাই বাবার ওপর দয়ামায়া করে কাজটা করছি।

ও পরিষ্কার না করলে তো নতুন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই না?

তুই একটা বুদ্ধুরাম! নতুন বাড়িতে—এই একটা সাত পুরনো লোকের ছবি? তাও গাঁইয়ার মতো খালি গা। মনে হচ্ছে ছবিটা বোধহয় বাবা, ওর সেই পিসিকে দিয়ে আসবে। তার নিজের দাদার ছবি তো! আদরে থাকবে।

চারিদিকটা তাকিয়ে দেখলাম। কতো জিনিস! আর কতোকালের জিনিস। দেখতে কোনোটাই ভালো নয়, তবু এগুলো যেন ফিরছে না! এর সবই মা ফেলে দিয়ে যাবে বলছে। ভেবে ভারি অদ্ভুত লাগছে।...কবে যেন একদিন ছাতে একটা

ভাঙা বালতির উনুন পড়ে থাকতে দেখে, বাসনমাজুনি সত্যবালা সেটা নিয়ে যেতে চেয়েছিল, মা দেয়নি। বলেছিলো, 'মাটি লাগালেই আবার কাজে লাগবে।'

ঘণ্টুর কথাটা ভেবে মনটা খারাপ লাগছিলো, বলে উঠলাম, দিদি, ঘণ্টু এসেছিলো?

হ্যাঁ, কখন যেন এসেছিলো একবার।

কই বলিসনি তো?

বলতে হবে? কি একখানা দামী খবর যে, বলে বেড়াতে হবে। এসেছিলো, আজ হঠাৎ ওদের কিসের ছুটি বলে। কেন? তাতে হলোটা কি।

না, মানে, আমাদের ফ্ল্যাট কেনা হচ্ছে শুনে একটু ইয়ে করলো।

কেন কে জানে দিদি হঠাৎ উগ্রমূর্তি হয়ে বলে উঠলো, 'কিয়ে' করলো শুনি?

ভয়ে আমার তো হাত পা ঠাণ্ডা। দিদি আমার থেকে কতোই বা বড়ো। দিদি তো আমার প্রাণের বন্ধুও, তবু দিদিকে যে আমার কি ভীষণ ভয়। ভয়ে ভয়ে বলি, না, মানে বলছিলো, আগে কিছু শুনিনি, হঠাৎ শুনলাম! মানে আমরা দূরে চলে যাবো বলে বোধহয়—

ঠিক আছে যা!

প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসার মতোই পালিয়ে এলাম।

এখন সামনে বই খুলে রেখে ভাবছি, আচ্ছা দিদিকে আমি এতো ভয় করি কেন? রাগী বলে? মাও তো কম রাগী নয়, তবে? মাকে তো ভয়ই করি না। মার রাগটা যেন মনে হয় একটা কৌতুকের ব্যাপার।

কিন্তু বাবা? বাবা রাগী না হলেও গুরুজন তো বটে, কিন্তু ভয় করে না তো। দিদি রেগে গেলে কেমন একরকম করে তাকায়! দেখে ভয় না করে উপায় নেই।

একটু পরেই মা ফিরলো।

আজকাল তো মা দিনের বেশির ভাগই বাইরে বাইরে ঘোরে। কী যে এতো কাজ মার। তবে যখনই ফেরে হাতে দু'একটা প্যাকেট থাকেই। কখনো ইচ্ছে হলে খুলে আমাদের দেখায়, না হলে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তুলে ফেলে। যেদিন দেখায়, হয়তো নিজের 'সওদা'র বাহাদুরি দেখাতে। দরাদরি করে কিভাবে বাইশ টাকার জিনিসটা বারো টাকায় কিনে নিতে পেরেছে তারই বিবরণ শোনায়।...আবার তারপরই বলে, সাধে কি আর একা মার্কেটিং করতে যাই। তোদের বাবা সঙ্গে থাকলে এক পয়সাও কমানো যায় না? 'দরাদরি' করা দেখলেই না কি ওনার মাথা ঘোরে, গায়ের মধ্যে পাক দেয়।...শুনেছিস কখনো এমন কথা? মেয়েটি তো তারো বাড়া। ওরকম বয়েসের মেয়ে-টেয়েকে নিয়ে মার্কেটিং করতে যেতে তো কতোজনকেই দেখি, আমার ভাগ্যে সবই উল্টো। মেয়ে যদি সঙ্গে গেলেন, তো দোকানীর দিক হয়ে কথা বলবেন তিনি। মায়েব দিক দিয়ে নয়।...বরং বলে বসবে হয়তো, 'চিরকালই শুনে আসছি দোকানীরা ক্রেতাদের ঠকায়, এখন দেখা যাচ্ছে ক্রেতারাও দোকানীকে দিব্যি ঠকিয়ে খায়।' এই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার মানে হয়? বরং নিশ্চিন্ত শান্তিতে একা ঘোরাই ভালো।

আজও মার হাতে ছিলো দু'একটা ছোটোখাটো প্যাকেট, খুলে দেখালো না, ঘরে গিয়ে তুলেও রাখলো না, দালানেই বেঞ্চের ওপর বসে পড়ে চড়া গলায় বলে

উঠলো, সাধে আর এই পাড়া ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে চেয়েছি? পাড়ার না আছে কোনো ভব্যতা, না আছে কোনো কালচার।

আমরা কেউ কিছু বললাম না। জানি কিছু বলা মানেই, মার সুবিধে করে দেওয়া। কথা পেড়ে গুছিয়ে বলতে যে সময়টা লাগতো, সেটা বেঁচে যাবে। হৈ চৈ করে বক্তব্যটা বলে নেবে। সাধ্যপক্ষে আমরা মার সুবিধে করে দিই না। মানে দিদি দেয় না, আর আমাকে ও বলে রেখেছে, মা যখন নিজে থেকে ডুকরে উঠে কিছু বলে উঠবে, খবরদার সে সময় কিছু জিজ্ঞেস করবি না।

দিদির বারণ। তার ওপরে তো আর কথা চলে না।

মা একটু থেমে আবার বলে উঠলো, মোড়ের মাথায়, মার্কেটিং সেরে ফিরছি, ঘণ্টু পাজীটা হঠাৎ কোনখান থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে বলে উঠলো, কাকিমা, আপনারা তো কোথায় ফ্ল্যাট কিনে পাড়া ছেলে চলে যাচ্ছেন! যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন, খবরটা এমন লুকোনোর কী দরকার ছিলো? কেউ কেড়ে নিতো? ভেবে দেখ কী অ-সভ্যতা! তবু রাগ সামলে বললাম, তা ঘরোয়া কথা রাস্তায় কেন?... বললো কী জানিস? বললো, ঘরে আর আপনাকে পাওয়া যায় কই? সব সময়ই তো বাইরে ঘুরছেন। উঃ এই বাজে একটা ছেলেকে তুই বন্ধু করেছিস।

আমাকেই বললো। দিদি তো ওদিকে বসে কী একটা বই পড়ছে।

কী যে বলবো ভেবে পাচ্ছি না। ঘণ্টু হঠাৎ এরকম হয়ে গেল কেন? সকলেবই মুখের ওপর কথা ও বলে বটে চিরকাল। কিন্তু এটা কি ধরনের? আমি কিছু বলার আগেই দিদি বই থেকে মুখ তুলে বলে উঠলো, নতুন করে আবার কে ওকে 'বন্ধু' করতে গেলো মা? 'বন্ধু' হয়েই তো জন্মেছি আমরা।

মা ছিটর্ফিটিয়ে বলে উঠলো, কী? 'বন্ধু' হয়েই জন্মানো হয়েছে? তার মানে জন্মজন্মান্তরের বন্ধুত্ব?

ওই সব জন্মজন্মান্তর মানলে, তাই।

তা 'আমরা' কেন? তোমার সঙ্গে কি?

বাঃ। চমৎকার। আমার সঙ্গে কি? ও আমারও বন্ধু নয়? বরং আমার সঙ্গেই বেশি।

ফাইন। 'বন্ধু' করবার উপযুক্ত আর লোক খুঁজে পেলে না তুমি। অন্য সব বন্ধুদের সামনে বার করতে মুখ উজ্জ্বল হবে তো? ওঃ কবে যে এই ন্যাস্টি পরিবেশটা থেকে সরে যেতে পারবো!

বলে মা রাগে গরগর করতে করতে চলে গেলো।

দেখলাম মার কাঁধের ঝোলাটায় যেন অনেক কিছু বোঝাই। নির্ঘাৎ মা একগাদা খাবার কিনে এনেছে! আজকাল আবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মা বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকছে না বলেই বোধহয় ওর ওই সাধের 'রেসিপি'র বইগুলো কাজে লাগাতে পারছে না, তাই বাইরে থেকে গাদা গাদা খাবার নিয়ে আসছে ফেরার সময়। কেক্ পেস্ট্রি, 'রোল' মুরগীর কাটলেট্ 'মশলাধোসা!' এইসব। আগে যা সব আমাদের কাছে দুর্লভ ছিলো। বলতে গেলে বাড়িতে তো এসবের নামই শুনিনি কখনো। খাওয়া তো দূরের কথা! কখনো কখনো ঘণ্টুর 'ছোট্‌কা' আমাদের কোনো সাফল্যে, বা ওর ভালোবাসার টিম জিতলে ওদের বাড়ির সব ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে

আমাদেরও ডেকে নিয়ে গিয়ে, পাড়ার সিনেমা হল্-এর কাছের 'নিউ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট'-এ বা কখনো 'দক্ষিণী ভবন'-এ নিয়ে গিয়ে খাওয়াতো! দিদি অবশ্য একটু বড়ো হয়ে ওঠার পর আর যেতে চাইতো না, যায়ওনি। আমার অতো লজ্জার ব্যাপার নেই বাবা! ঘণ্টুর 'ছোটকা' তো আমাদেরও 'ছোটকা।'

এখন আমাদের বাড়িতে ওইসব দুর্লভ জিনিস হরদম। আচ্ছা মা কী শুধুই আধুনিক হবার তালেই বরাবরের জানা ঘরোয়া দিশী জিনিসগুলো ছেড়ে ওইসব খাদ্যবস্তুর আমদানি করছে? না কি, ওগুলোর প্রতি মার বরাবরই খুব আকর্ষণ ছিলো? শুধু পয়সার অভাবে জুৎ করতে পারেনি বলেই? এখন কি জানি কি সূত্রে সেই 'অভাব'টা কিছু দূর হওয়ায় মা সেই চিরকালের দমিত ইচ্ছেকে পূরণ করছে, 'ফ্যাসানের' ছুতো করে? মিষ্টিতেও মার আকর্ষণ কিছু কম ছিলো না। তবু সেটা মাঝে-মধ্যে জুটতোই। এমনি কোনো কিছু উপলক্ষ হলেই কি বিশেষ পুজো-পার্বণের পুজোর প্রসাদ হিসেবেও মিষ্টি তো এসেই থাকে। ঘণ্টুদের বাড়ি থেকেও তো কেবলই আসতো, আজ এই পুজো কাল ওই পুজো, আজ সত্যনারায়ণ তো কাল লক্ষ্মীপুজো বলে। মা এতে বেশ খুশি হতো। আর আমরা মিষ্টির দিকে তেমন নেই বলে, মা রাগ দেখিয়ে বলতো, তোমরা কেউই খেতে চাইবে না, বাধ্য হয়ে আমাকেই সব খেতে হয়! ঠাকুরের প্রসাদ ফেলে দিতে তো পারি না। তবে খাবার সময় মোটেই 'বাধ্য হওয়ার' ভাব দেখতাম না বলে, আমি আর দিদি আরোই অনিচ্ছে ভাব দেখাতাম।...কিন্তু এখন শুনছি, মা না কি 'সাতজন্মে মিষ্টি খায় না। মিষ্টি দেখলেই ওর নাকি মাথা ধরে।'...

অথচ ঘণ্টুদের বাড়ির পুজো-টুজো তো ঠিকই চলে। আর পাড়ায় প্রসাদ বিলোনোও চলে। পাড়ার মধ্যে আমরাই তো প্রধান এবং প্রিয় প্রতিবেশী। তাই এ বাড়িতে বেশি বেশি।...কিন্তু এখন আর মা, 'প্রসাদ' বলে সম্মান রক্ষে করতে পারে না, বেশি বেশি থাকলেই সাবিত্রীদিকে কি বাসন মাজা মেয়েগুলোকে দিয়ে দেয়। বাবার তো মিষ্টি খাওয়া বারণ। তা নইলে এ সমস্যা দেখা যেতো না।

আশ্চর্য! এখন আর মার সেই প্রসাদ ভক্তি দেখি না।

দিদি বলে, আহা! 'আধুনিক' হতে মহিলার কি কৃচ্ছ্রসাধন। দেখলে মায়া হয়। ওই বড় বড় রসগোল্লাগুলো সাবিত্রীদিদের হাতে তুলে দিতে হলো!

আবার হি হি করে হেসে বলল, জানি না, আড়ালে গিয়ে মত বদলে ফেলে কি না।

এগুলো দিদিব বাড়াবাড়ি। মাকে ডাউন করতে পেলে যেন দিদি আর কিছু চায় না! যখন মা যেমন তেমন সাজে থেকে রাতদিন কারণে অকারণে গলার শির তুলে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতো, এই শ্যামপুকুর লেন-এর অন্য সব পুরনো বাসিন্দাদের ভাষাতেই কথা বলতো, আর বাবার নাকের সামনে আঙুল তুলে তুলে অনবরত ধিক্কার দিতো বাবা কতো 'অপদার্থ' বলে, তখনো যা, আর এখন এই সব সময় সুন্দরভাবে সেজে থেকে মাপা মাপা কাটা কাটা গলায় বইয়ের মতো ভাষার টুকরো জুড়ে জুড়ে কথা বলা, আর বাবার সঙ্গে 'আঁতাত'-এর ভাবে আদুরে গলায় কথা বলা আর কেমন একরকম নতুন ধরনের শব্দ করে হেসে ওঠা, মাকেও তাই!

আকাশ পাতালই তো বদলে গেছে মা। তবে দিদির কেন সেই পুরনো মনোভাব! সত্যি বলতে, আমার কিন্তু আগের থেকে, এই বদলে যাওয়া মাকেই ভালো লাগে। যদিও বদলটা দারুণ। মিনিটে মিনিটেই চমকে দেবার মতো। অবাক হতে হয়, হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়, তবু ভালই লাগে। আমার স্কুলের অন্য অন্য বন্ধু গৌতম কুশল সায়ন, এদের মায়েরা তো এইরকমই। গৌতমের তো বাবা নেই, মাকে তো বিধবাই বলতে হয়? কিন্তু মোটেই তা বোঝা যায় না। সবই সকলের মতো। সেটা—খারাপটা কি? বিচ্ছিরি মতোটাই কী সুদৃশ্য?

মা যদি এখন সুযোগ পেয়ে, 'সুদৃশ্য' হতে যায় দোষটা কি বাবা! এক এক সময় একটু হাসি পায় বটে তবু খুব খারাপ লাগে না তো তেমন।

অথচ দিদি! বোঝা শক্ত।

সেই যে ছোটবেলায় বলেছিলো, 'সাপের কামড়ের থেকে মশার কামড় ভালো', এখনো যেন সেই একই ভাব। কোন্ সাপে যে কামড়ায় ওকে, তখনো যেমন বুঝতে পারিনি, এখনা তেমনি পারছি না। পরে বুঝতে পারবো?

কিন্তু এমনিতে আমি কিছু কম বুঝি না কি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এমনিতে আমি অনেক কিছুই কেউ কিছু না বললেও বুঝে ফেলতে পারি।

যেমন আজ সকালে।

রবিবার। তবু দেখি বাবা অন্যদিনেব থেকেও আগে আগে উঠে পড়ে স্নান সেরে নিয়ে বসে আছে।

মা চোখ কপালে তুলে বললো, চায়ের আগে স্নান করে বসলে যে?

বাবা বললো, নিলাম।

নিলাম! মানে? ওতে হেলথ খারাপ হতে পারে তা জানো?

একদিনে? পাগল। এ হেলথ্ সামান্যয় খারাপ হবার নয়।

কথাটা কিন্তু সত্যি। সারা জীবনই তো অভাব, কষ্ট, মার বাক্যজ্বালা, তবু বাবার স্বাভাবিক বলিষ্ঠ গড়ন, আর নীরোগ শরীরটি মোটামুটি ঠিকই থেকেছে।

ওই কথাটা বলেই বাবা যেন ধাঁ করে বলে ফেললো, ভাবছি চা খেয়েই আজ একবার দক্ষিণেশ্বরে পিসির ওখানে চলে গেলে হয়।

পিসির ওখানে।

মা যেন প্রায় হতভম্ব।

হঠাৎ পিসির ওখানে। কোনো কারণ আছে?

নাঃ। কারণ আবার কী? এমনি অনেকদিন যাওয়া-টাওয়া হয়নি। গেলে ড্যামগ্ল্যাড্ হয়ে যাবে।

মা ঈষৎ বেজার গলায় বলে, একটা রবিবার তাহলে মাঠে মারা যাচ্ছে!

আরে রবিবার তো তেমন কিছু হয় না। দোকান-বাজার বন্ধ। রবিবারটাই তো সুবিধে।

দোকান-বাজার ছাড়াও জগতে আরো কাজ থাকে। মনে মনে প্ল্যান করছিলাম, আজ পলু পুতুলকে নিয়ে একবার সেই আমাদের 'কৃষ্ণকুঞ্জে' ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো।

অ্যাটমোসফিয়ারটা একটু দেখে আসতো।

বাবা বললো, সে কী? তুমি যে বলেছিলে একেবারে 'গৃহ প্রবেশে' ওদের চমকে দেবে!

মা আরো বেজারভাবে বললো, সে আর হলো কই? খবর তো ছড়িয়েই পড়েছে। কে যে কোথা থেকে জানলো! এই তো ঘণ্টু সেদিন আমায় রাস্তায় পাঁচ কথা শুনিয়ে গেল।

বাবা একটু থমকে গিয়ে বললো, তোমায়? রাস্তার ধারে? পাঁচ কথা?

ওই তো 'ফ্ল্যাট কিনে উঠে যাচ্ছি, এতো লুকোচুরির কী আছে? কেউ কী কেড়ে নেবে?' এই সব। ওইটুকু ছেলের এতো দুঃসাহস।

মা আজকাল আর 'আসপদ্দা' বলে না। যেটা যখন তখন কথায় কথায় বলতো। এখন বলে 'দুঃসাহস।' কালই শুনলাম বলছে, 'আমার মুখের ওপর কথা বলতে আসে, ওই সাবিত্রীটা। এতো দুঃসাহস।'

বাবা শান্ত গলায় আস্তে বললো, আসলে কী জানো? আমরা পাড়া ছেড়ে চলে যাবো ভেবে, মন খারাপ হয়ে গিয়েই খুব আপসেট হয়ে গেছে মনে হয়।

তুমি তো চিরকাল মহাপুরুষ। অন্যের কোনো দোষ দেখতে পাও না। আমি বলছি স্রেফ হিংসে। আমরা এই পচাপাড়া ছেড়ে ভালো জায়গায় চলে যাবো। সেটা সহ্য হচ্ছে না।

বাবা একটু গম্ভীরভাবে হাসলো, কী যে বলো। ওইটুকু ছেলে। মনকেমনের জন্যেই। মনকেমন তো করবেই—

হঠাৎ উঠে জানালার ধারে বসা একটা কাককে 'হুশ' করে উড়িয়ে দিতে গেলো বাবা। তারপর বললো, তা এদের নিয়ে বেড়িয়ে আসতে চাও, সামনের রবিবারে ঠিক করো। ততোদিনে বাড়ি আরো কমপ্লিট হয়ে আসবে।

আজ তাহলে দক্ষিণেশ্বরে যেতেই হবে?

বাবা একটু হাসলো, 'হবেই' এমন কিছু না, ট্রেনের 'রিজার্ভেশান' করা তো নেই। গেলে হয় এই পর্যন্ত।

মা বললো, খাওয়ার আগে ফেরা হবে তো?

বাবার সামনে অবশ্য মা 'লাঞ্চ'টা বলে না।

বাবা বললো, তা কী আর হয়?

কেন? দক্ষিণেশ্বরে যেতে আসতে আর কতো সময় লাগবে? পাঁচ মাথার মোড় থেকেই তো বাস ছাড়ে।

তা জানি। তবে গেলে পিসি কী আর না খেয়ে চলে আসতে দেবে?

মা একটু ক্ষুণ্ণভাবেই বলে, আজই তোমার এই প্রোগ্রাম করতে ইচ্ছে হলো? রবিবারটাই কিচেনে একটু বিশেষ ব্যবস্থা করি।

বাবা হেসে বললো, সেটা ওবেলা এসে সদ্ব্যবহার করা যাবে। বলেই ঝপ করে উঠে পড়লো।

তার মানে, মার ওই 'কৃষ্ণকুঞ্জর প্রোগ্রামটা স্রেফ তাৎক্ষণিক চিন্তা। বাবাকে বাবার পিসির দিক থেকে ঠেকাবার তালে!

তবে বাবারও আজকাল একটা আশ্চর্য শক্তি জন্মেছে দেখি সংঘর্ষের পথে না

গিয়েও, নিজের পথে চলতে পারে। হয়তো—মাও এখন তেমন চেঁচামেচি করে সমস্ত পরিবেশটা ক্লেদাক্ত করে তোলে না বলেই।

বদল যে শুধু মারই হয়েছে, তা তো নয়, বাবারও অনেক হয়েছে। প্রথম তো সেই 'কপালে' হাত দিয়ে কপাল দেখানো বন্ধ। সব সময় যেন একটু আত্মস্থ ভাব। দিশেহারা ভাব নেই।

কোনো কিছুর প্রয়োজনের মুখোমুখি হতে হলে—অনায়াসে বলে ওঠে, 'ঠিক আছে। কতো চাই? কবে চাই? নো প্রবলেম।'

এই রকম বলতে পাওয়ার সুখটির জন্যেই কী মানুষ 'বড়লোক' হবার জন্যে এতো প্রাণপাত করে? যা নয় তাই করে?

বাবা বেরোবার আগে মা একবার উদার গলায় বললো, যাচ্ছো সঙ্গে কিছু মিষ্টি-ফিষ্টি নিলে না?

বাবা বললো পিসির তো ওসব বিশেষ সহ্য হয় না।

তা কিছু ফলটল নিলেও পারতে।

ফলই বা কী খায় কে জানে। চিরকাল তো পেটরোগা। আমাকে যেতে দেখলেই আহ্লাদে আটখানা হবে।

বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো।

আমার কিন্তু মনে হলো, নির্ঘাৎ বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে রাস্তা থেকে কিনেটিনে নেবে অনেক কিছু। এখন তো ইচ্ছে মতো খরচ করতে পারে। অথচ এখন আর যাওয়াই হয় না। কিছুদিন ধরে তো ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরপাক খাইয়ে চলেছে মা বাবাকে। সময় বার করবে কখন? তাছাড়া দক্ষিণেশ্বরে যাবার কথা তুললেই মা সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করতো, এ জীবনে কতো তুচ্ছ জায়গাতেও যেতে চেয়ে যেতে পায় নি। আর যদি তৎসত্বেও যেতো বাবা, বলতো, প্রাণ পড়ে থাকে ওই পিসিটির ওপর।'

অথচ আমরা তো তার কিছুই দেখি না কখনো।

ওই, 'অনেকদিন যাওয়া হয়নি', বলে একবার যাওয়া। আর নেহাৎ খালি হাতে যাওয়া যায় না বলে, একটু মিষ্টির বাক্স হাতে নেওয়া।

এবারে তাও নিল না।

তবু আমি ঠিক বুঝতে পারছি এবারে বাবা তার পিসির জন্যে অনেক কিছু নিয়ে যাবে। মার সামনে সেটা দেখাতে চায় না।

কেন? সেটাই ভাবছি।

ভয়ে? আশ্চর্য। এতো কিসের ভয়? তাছাড়া এখন তো আর ততো 'কটকটে' কথা শোনবারও ভয় নেই। তাহলে?...কী জানি! এখন মনে হচ্ছে খুব ভালোবাসার জায়গায়, অন্যের তাচ্ছিল্য অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ ভাব দেখলে যে কষ্টটা হয়, সেই কষ্টটা পাবার ভয়ে।

পিসঠাকুমা সম্পর্কে তো মার বরাবরই ওই রকম ভাব।

তাচ্ছিল্য অবজ্ঞা বিদ্বেষ। না, তার ওপর আরও একটু ঈর্ষা। এটা আজকাল বুঝতে পারি। বাবার মনের মধ্যে যে আর কারো জন্যে একটু জায়গা থাকে, সেটা পছন্দ নয়।

অথচ লোকটা কে?

একটা বেচারী বিধবা বুড়ি, ছেলেমেয়ে কিছু নেই, একা একখানা গ্রাম মতো জায়গায় পড়ে থাকে।

অথচ—

বাবা যে ঠাকুর্দার সেই ছবিখানা নিয়ে গেছে তাও বুঝতে পারছি। অথচ মুখে বলে নি একবারও।

বাবা চলে যেতে মা আপন মনে বলে উঠলো, বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ গিয়ে পিসির নিরিমিষ হেঁসেলে কী যে জুটবে কে জানে! ছুটির দিনটা—

মনকে মনেব সুরেই বললো। বাবাকে ভালোবেসেই।

দিদি অমনি নিজের স্বভাবে ফট করে বলে উঠলো, বাবার কাছে—তোমার আজকের ওই বিরিয়ানি আর মুরগির আশ্চর্য এক প্রিপারেশনের থেকে অনেক ভালো জুটবে মা। ঢের বেশি আনন্দে খাবে বাবা।

তা সত্যিই বোধহয়। খুবই আনন্দ হয়েছে মনে হলো। কারণ বাবা যখন ফিরলো তখন যেন আহ্লাদে ভাসছে। সারাদিন ঘুরে এসে গলদঘর্ম হবার বদলে যেন বেশি ফর্সা হয়ে গেছে।

আর এসেই বলে উঠলো বুঝলি পুতুল, হঠাৎ আমায় দেখে, বুড়ি আহ্লাদে যেন দিশেহারা। কী করবে কী খাওয়াবে কোথায় বসাবে। যতোই হেসে হেসে বলি, অতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন? গুরুদেব এলো না কী? তা বলে কী "তুই আমার গুরু ইস্ট ভগবান সবের থেকে বেশি।" সত্যি দেখে এমন লজ্জা করছিলো। কতোটুকুই বা দূর, কী বা এতো সময় লাগে। যাওয়া হয় না। নিছক একা পড়ে থাকে। এবার তো আমায় ধরে নাছোড়বান্দা বৌ ছেলেমেয়েকে নিয়ে একবার আয়। সেই কোন্‌কালে দেখেছি—এখন কতো বড়োটি হয়েছে—

হঠাৎ দিদি বলে ওঠে, তা সপরিবারে গিয়ে তাঁকে দেখা দেওয়ার থেকে তাঁকেই একবার নিয়ে এলেই হয়। বৌ ছেলে মেয়ে ইত্যাদি প্রভৃতি সব দেখা হয়।

বাবা দিদির দিকে একবার তাকিয়ে বললো, তুই তো খুবই বুদ্ধিমতী, বলতো তাতে কী তাঁর সেই আনন্দটা হবে?

হবে না বলছো?

পাগল। তাই কখনো হয়? নিজের কেন্দ্রে, নিজেব স্বাধীনতার জায়গাতেই উপভোগের স্বাদ সুখ। এখানে নিয়ে এনে দেখবি একটা জবুথবু হতভম্ব মার্কা বুড়ি। অথচ ওখানে গেলে? ওই বুড়োহাড়ে ভেলকি খেলিয়ে তোদের যত্নআত্তি করবে, পরিপাটি করে বেঁধে বেড়ে খাইয়ে দেবে! আজই তো দেখলাম। প্রথমটায় তো মনে হলো খুব বুড়ো হয়ে গেছে, তারপর সে কী দৌড়ঝাঁপ! কী ছুটোছুটি। তক্ষুনি কাঠ জেবলে জল গরম করে চা করে দিলো। তক্ষুনি আশপাশের কাকে ডেকে কী বললো, দেখি একটু পরেই একটা ছোট ছেলে এক ঠোঙা গরম সিঙাডা আর গরম জিলিপী এনে হাজির। অতো বেলায় তখনো গরম দেখে তো অবাক আমি। তা শুনলাম এই দোকানটায় না কী এতো খদ্দের যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্তই কড়া চড়ানো থাকে। মন্দিরের ধারে কাছেই তো। যারা মন্দিব দেখতে আসে, তারা বোধহয় খুব খায়!

হেসে ওঠে বাবা।

আমরাও হাসি। দিদি বলে, সে তো খাবেই। খাওয়া ছাড়া কোনো আহ্লাদ জমে? তাই তো যেখানে যতো ঠাকুর দেবতা মন্দির, সেখানেই ততো খাবারের দোকানের জমজমাটি! তুমি অবশ্য মন্দির দেখতে যাওনি, তবে দেবী দেখতে গেছলে তো? খুব খেলে?

বাবা হেসে ওঠে, না খেলে ছাড়ান আছে? শেষে যখন বললাম, ঠিক আছে, খাচ্ছি তোমার এই—একগাদা খাবার! তাতেই আমার এবেলা চলে যাবে। আমার জন্যে আর রাঁধতে বোসো না—শোনে না—হৈ হৈ। রৈ রৈ। বলে, তা আর না? তোকে দুটো ভাত না খাইয়ে ছাড়বো আমি? বলে, কতো আরাধনার আসা।...তুই এসেছিস, দেখে তোর পিসির গায়ে সাতটা হাতির বল এসেছে।

শুনে তো আমি হেসেই অস্থির! ও বাবা! একটা দুটো নয়, একেবারে সাত সাতটা! সেই তো কাঠির মতো চেহারা।

তুই যা দেখেছিলি, তার থেকে এখন আরো কাঠি। তাহলে কি হয়, সত্যিই সেই হাড়ে ভেল্‌কি।...করলো কি, একটা বালতির উনুনকে জ্বালিয়ে দালানে নিয়ে এসে বসালো। আর আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে কুটনো কুটলো, বাটনা বাটলো, চাল বাছলো, রান্না করলো।...তারপর সেইখানেই আসন পেতে খেতে দিলো। উঃ সে কি পরিপাটি করে ভাত বাড়া।

কি খেলে?

সে বাপু শুনলে তোমরা হাসবে, তবে সত্যি বলতে, আমি চমৎকারই খেলাম: আহা মুখ যেন জুড়িয়ে গেল। মনে হলো কতোকাল এমন তৃপ্তি করে খাইনি।

দিদি 'মুখে চাবি' দেওয়ার মতো করে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলে, বাবা সাবধান। সাপের ল্যাজে পা দিয়ে বসছো মনে হচ্ছে।

বাবা একটু হেসে স্বর নামিয়ে বলে, স্বভাব যায় না মলে জানিস তো? ফস করে মুখ দিয়ে সত্যি কথাটা বেরিয়ে যায়। থাক।

আমার কিন্তু কৌতূহল জোরালো, ও বাবা। বলোই না, কি রান্না করলো তোমার পিসি সাতটা হাতির বল নিয়ে?

বাবা আঙুলে 'কর' গোনার সুরে বলে, প্রথম নম্বর হচ্ছে ভাত—

ভাত। আহা! ভাত আবার একটা রান্না না কি?

বাবা বলে ওঠে, আরে। বলিস কী রে? রান্না নয়? চিরকাল শুনে আসিসনি, 'ভাত রাঁধতে রাঁধতে জীবন গেলো! হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে হাড়মাস কালি হলো।'

দিদি ঠাট্টা গলায় বললো, বাবা! আবার মাত্রা ছাড়াচ্ছো? চটপট বলে ফেলো তারপর কি?

বাবা কিন্তু দিদির সাবধানতাতেও ততো দমে না। যেন এখনো সেই তার পিসির বাড়িতেই ঘুরছে, এইভাবে বলে, তারপর? দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে, পটল গাছের পাতার বড়া।

পটল গাছের পাতা।

কথাটা জীবনে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তাই বলে উঠি, সেটা আবার কি?

কি আবার? পটল একটা গাছে জন্মায় তো? না কি আকাশ থেকে পড়ে?

সেই গাছের পাতা? বেসনে ডুবিয়ে ভাজা। যা ফার্স্ট ক্লাশ একখানা হয়েছিলো।

আমি রেগে গিয়ে বলি, সে তো তোমার কাছে হবেই। কিন্তু সেই গাছটা কোথায় পেলো তোমার পিসি? বাড়িতে পুঁতেছে বুঝি? কোনো সময় ইচ্ছে হলেই তার ফলটি তুলে বসবে বলে? পটল গাছের পাতা! বাজে কথা।

বাবা হেসে উঠে বলে, কেন? তোরা কখনো খাসনি?

আমরা? জন্মে জীবনে না!

দিদিও আজ দেখছি বেশ মুডে আছে। বললো, ইস। কি বোকা রে তুই পলু? পলতার বড়া খাসনি কখনো? সেটা পটল গাছের পাতা নয়?

এ মা! বাবা! ইস।

দেখলি তো। কেমন ঠকালাম।

এক এক সময় বাবাকে যেন ছেলেমানুষীতে পায়। এটা বরাবরই। যখন সেই 'কপাল' বলে নিঃশ্বাস ফেলতো, তখনো হঠাৎ হঠাৎ, তুচ্ছ কিছু একটা ছেলেমানুষী খেলা নিয়ে, কী ধাঁধার উত্তর নিয়ে। এমন কি যখন ছাতে ওঠা যেতো, তখন হয়তো ছাতে একটা ঘুড়ি কেটে এসে পড়েছে দেখে, আমাদের থেকে আগে ছাতে ছুটতো, কে আগে নিতে পারে বলে।...পরে অবশ্য মা তাই নিয়ে তুলোধোনা করতো বাবাকে। বলতো, 'ধেড়ে খোকা!'

আজও যেন বাবাকে হঠাৎ ছেলেমানুষীতে পেয়েছে। তাই ওই তুচ্ছ কথা নিয়ে বলে, কি? কেমন ঠকালাম?

বেশ ঠকেছি। তারপর শুনি?

তারপর? তা-র পর শাকভাজা, পোস্ত চচ্চড়ি, লাউ ডালনা, আর আমের চাটনি! হ্যাঁ আর আলু ভাতে ঝিঙে ভাতে ঢ্যাঁড়শ ভাতে।

মা ঘরের মধ্যে ছিলো। এতোক্ষণ সাড়াশব্দ করেনি। বাবা যেই এসে বেশ উচ্ছ্বাস দেখালো, মা তখনি কতোই যেন কাজ আছে, এইভাবে ঘরের মধ্যে চলে গেলো। এখন হঠাৎ ঘরের মধ্যে থেকেই খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, এই পুতুল! 'মেনু'টা লিখে রাখ চটপট। পরে হয়তো ভুলে যাবি। ইস! সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রান্নাগুলো মনেই পড়ে না।

দিদি বললো, লিখতে হবে না, মুখস্থ করে নিয়েছি।—শুনে আমারও লোভ হচ্ছে। চলো বাবা একদিন চলে যাওয়া যাক তোমার পিসির বাড়ি, বুড়ি ওই পলতা গাছের ফল তুলে বসবার আগে।

এইভাবেই দিনরাত মার সঙ্গে দিদির এক অদ্ভুত ঠাণ্ডা লড়াই। কেন তা জানি না।

বলে মা থেমে নেই। মা আরো সিঁড়ি ভেঙে চলেছে। মা তার সেই 'কৃষ্ণকুঞ্জ'র ফ্ল্যাটে যাবার জন্যে গৃহপ্রবেশ উৎসবের আয়োজন করছে। কাকে কাকে নেমন্তন্ন করবে এখন থেকেই তার লিস্ট করছে। আবার তার মধ্যেই কতো যে বুদ্ধি খাটিয়ে চলেছে।

আজ হঠাৎ বলে উঠলো, আচ্ছা, তোমাদের এখানে একটা বুদ্ধিমান ছুতোর খুঁজে বার করতে পারবে?

বাবা দাড়ি কামাচ্ছিল, হাতের খুরটা থেমে গেলো।

বুদ্ধিমান ছুতোর।

হ্যাঁ, একটা বুদ্ধিওলা মাথার দরকার।

মার মুখে যেন বেশ একটা গর্ব গর্ব ভাব!

বাবার অবাক অবাক ভাব। ব্যাপারটা কি বলতো? জামাই খুঁজছো, না ছুতোর খুঁজছো, ঠিক বুঝছি না তো।

তুমি বুঝবে না সে তো জানা কথাই। না হলে তো তোমারই এটা মাথায় আসা উচিত ছিলো। বলছি—আমাদের এই খাটটাকে তো আর ফেলে দিয়ে যাওয়া যাবে না?

খাটটা। ওটাও ফেলে দিয়ে যাবার কথা ভাবছো?

তাই ভাবছি? এই বুঝলে? ফেলে দেওয়া যাবে না বলেই বলা হচ্ছে, ওটা তো আর আমাদের নতুন ফ্ল্যাটের ঘরে ঢুকবে না?

বাবা বললো, ঢুকবে না কেন। কি মুস্কিল। ও তো পায়া খুললেই নিয়ে যেতে হবে।

তা জানি। সেটা আর বলার কিছু নেই। বলি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে মাঝখানে বসিয়ে রাখলে কেমন দেখাবে?

বাবা বললো কেমন দেখাবে, সে এখান থেকে কি করে বলবো?

বুদ্ধি থাকলেই বলতে পারতে। অতি 'অড' দেখাবে। আমি ঠিক করেছি, ওটাকে মাঝখানে চিরে ফেলে আর চারটে পায়া করিয়ে নিয়ে আলাদা দুটো সিঙ্গল খাট বানিয়ে নেবো! বাজুর কাজটা অবশ্য সেকেলে প্যাটার্নেরই, সেও ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে। সেইজন্যেই একটা বুদ্ধিমান মিস্ত্রী চাইছি।

বাবা অবাক হয়ে মার দিকে তাকিয়ে বললো জোড়া খাটখানা মাঝখানে চিরে ফেলে দুটো করে নেবে?

কেন, প্ল্যানটা কি খারাপ কিছু হলো? দু'দেয়ালে দুটো খাট থাকাই তো নিয়ম।

বাবা আস্তে বললো, ওটা তোমার বাবার দেওয়া বিয়ের 'দান'এর খাট। ওতে আমাদের ফুলশয্যা হয়েছিলো।

সেটা আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছো? আমি জানি না? সেইজন্যেই তো একবারে বাতিল করতে চাইছি না। নাহলে বেচে দিলেই তো হতো। মাথা খাটিয়ে এই বুদ্ধিই বার করা হয়েছে। এই মাথাটি থেকেই সব। বুঝলে মশাই।

বাবা বললো, সে তো দেখছিই। তবে ভাবছি—'বিয়ের খাট আর বাবার দেওয়া' —বলে তোমার যেন খুব একটা সেণ্টিমেণ্ট ছিলো!

ছিলো। আর ওইসব যতো পচা সেণ্টিমেণ্টের দায়ে জীবন ভারাক্রান্ত করবো না ঠিক করেছি। ফেলে তো দিচ্ছি না, বেচেও দিচ্ছি না, রাখবোও, শোবোও, শুধু একটু ঠিকমতো করে নিয়ে।

বাবা বললো, অতো বুদ্ধিমান মিস্ত্রীর খবর আমার জানা নেই।

জানতাম!

মা রাগের গলায় বললো, ঠিক আছে, আমিই দেখবো। সবই তো করছি। তুমি তো জগতের কিছুই জানতে না। আমিই—

বাবা বললো, পিটিয়ে পিটিয়ে গাধাকে ঘোড়া বানিয়ে তুলেছো, এই তো?

আশা রাখছো 'রেস'এর ঘোড়া করে তুলতে পারবে, কেমন? গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া করে তুলতে পারলেও তার 'দম'টা কি দিতে পারবে? মাঝখানে না ফেল করে বসে।

বাবার এরকম কথার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। দিদি হয়তো পারে। তবে দিদি কখন কি মুডে থাকে! জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। কিন্তু বাবা যে ভীষণ আহত হয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে। বাবার মুখটা যেন অন্যরকম দেখতে লাগছে।

কিন্তু বলতেই হবে বাহাদুর।

সত্যিই মা কোথা থেকে এক বুদ্ধিমান মিস্ত্রী জোগাড় করে এনে, যা বলেছিলো তাই করলো। দেখে অবাকই লাগলো একখানা খাট থেকে বেশ সুন্দর দুটো ছিমছাম খাট তো হলোই সত্যি। ওর সারা জীবনে তো দ্বিতীয় বার পালিশ পড়েনি, এখন পালিশ করায় যেন নতুনের মতোই লাগছে।

মা বললো, কীরে? কীরকম হলো?

আমি বেশ প্রাণ খুলেই বললাম খুব ভালো। তবে দিদিও যে তাই বলবে, ভাবিনি।

দিদি বললো, বাঃ! চমৎকার। এটা যে তোমার চির মানসিকতার প্রতীক। ফাইন একখানা বুদ্ধি বার করেছো তো বাবা।

মা একটু তাকিয়ে দেখলো।

তারপর আলগাভাবে বললো, মার বুদ্ধির একটু তারিফ করলি, তাও ভালো।

ওই তারিফ ছোটোমাসিও করলো। তার ওপর আবার একথাও বললো, আমার ঘাড়ের ওপরও তো ওইরকম একখানি জগদ্দল পাহাড় বসানো আছে। কিন্তু আমার শাশুড়িটি বেঁচে থাকতে কিছুই করা যাবে না নির্ঘাৎ হৈ হৈ করে উঠবেন, 'অলক্ষণ' 'অমঙ্গল' বলে। কাঠ পাথর লোহালক্কড় সবকিছুই ওঁর কাছে, 'পয়মন্ত' কিম্বা অপয়া।

তারপর দুই বোন অনেকক্ষণ ধরে ওইসব 'কুসংস্কার' নিয়ে গল্প চালালো।

কিন্তু মজা এই, বড়মাসি তো এঁদেরই বোন? বড়মাসি কিন্তু দেখেই বলে উঠলো, বিয়ের খাটটা দুখাচর করলি? তোর সাহস আছে বাবা! আমি হলে পারতাম না।

মা বললো, আমার অতো প্রেজুডিশ নেই। বেশি সেন্টিমেন্টও নেই। দেখছি তো সারাজীবন, কিছুতে কিছু হয় না। মনের জোরটাই আসল।

তা সত্যি মনের জোরেই তো মা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলছে। কোনোদিনই কী ভেবেছি আমরা সাহাবাবুর এই বাড়িটা ছেড়ে আমরা লোকেদের মতো ছবি ছবি একটা ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকবো! যেটা নাকি একদম নতুন জায়গা, নতুন পাড়া! ছোট্ট একটু বাগান করবার মতো জায়গাও নাকি আছে।

যদিও এখনো পর্যন্ত সেই 'কৃষ্ণকুঞ্জ'য় গিয়ে দেখে আসা হয়নি আমাদের, তবে তার ফর্ম-এর কাগজপত্রের সঙ্গে ছবি দেখেছি সেই ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর।

'ছবিই।'

আমার তো দেখতে দেখতে নেশা লেগে যাচ্ছিল। বিশ্বাসই হচ্ছিল না ওই সুন্দর ছবিটার মধ্যে আমরা গিয়ে ঢুকে পড়বো। কবে যেতে পাবো রে বাবা!

মাঝে মাঝেই মনটা একটু খারাপও হচ্ছে, এই চিরকালের কেনা জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে। ভালো লাগা আর কষ্ট হওয়া এই দুটো ভাবের সহাবস্থান।

তাছাড়া স্কুল কলেজের সমস্যাও আছে। দিদির কলেজ। আমার নাহয় এবছর পর্যন্ত স্কুল, তারপর? ওখানে কি কাছে কলেজ আছে? দিদির সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু দিদি যে সবসময় কি একরকম শক্ত শক্ত ভাব হয়ে থাকে। আমার কিন্তু ক্রমশঃই মনকেমনটা কমে গিয়ে উৎসাহটাই বাড়ছে। কি আছে এতো ভাবনার? এইতো লিখেছে 'সর্ব-সুবিধাযুক্ত'। সবকিছুই নাকি কাছে। মানে যা যা দরকার। বাজার-দোকান আরো সব কি কি যেন।

তবে এতো দেরী কেন?

মা বলে, ওরে বাবা, কতোরকম যে ফ্যাচাং আছে। কবে নাকি লটারি হবে, সেই লটারির হিসেবে ঠিক হবে কে কোন্ বাড়িটা পাবে। যাতে কেউ ঝগড়া বাধাতে পারবে না, 'আমি কেন ভালোটা পেলাম না' বলে।

কিন্তু যেদিন ওই লটারির তারিখ ঘোষণা হওয়ায় মা বাবা সেজেগুজে বেরিয়ে গেছে, সেই ঝণ্টুটা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো। ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে প্রায় ঝড়ের মতো এসে আছড়ে পড়লো, পলু, পুতুল। তোরা এতো ছোটো-লোক? এতো ঘোড়েল? ইস! হিরণকাকাকে আমি চিরকাল দেবতার মতো দেখে এসেছি।

দিদি কাছে সরে এসে ওর ঝাকড়া ঝাকড়া চুলের একটা গোছা মুঠো করে ধরে জোরে নাড়া দিয়ে বলল, ব্যাপারটা কী? নেশাফেসা করে এসেছিস না কী? হয়েছে কী?

ঝণ্টু এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, ও! আমি নেশা করে এসেছি? তোরা জানিস না কিছু? ন্যাকা অবতার! ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানিস না? ছ্যা। ছ্যা!

আমি ওর হাত ধরতে চেষ্টা করে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলি, কী হয়েছে, সেটা বলবি তো?

বলার আবার কী আছে? পাড়াশুদ্ধু সবাই জানে, আর তোরা বাড়ি বসে জানিস না? ঘুঘু!

দিদি কঠিনভাবে বলল দ্যাখ ঝণ্টু বেশি নাটক করবি না বলছি। যা বলবার সোজাসুজি বল! নইলে থাপ্পড় খাবি। বাবার নামটা করছিস কেন?

এখন ঝণ্টু হঠাৎ প্রায় কেঁদে ফেলে বলে, কেন? জানিস না, এই বাড়িটা ছেড়ে দেবার বদলে, হিরণকাকা বড়জ্যাঠার কাছ থেকে চল্লিশটি হাজার টাকা বাগিয়েছে!

কী? কী বললি?

দিদি আমি দুজনেই প্রায় ছিটকে উঠি।

ঝণ্টু অবাক হয়ে বলে, সত্যিই তোরা জানিস না? আশ্চর্য!

ওর বড়জ্যাঠা মানে অবশ্য আমাদের বাড়িওলা সাহাবাবু। ঝণ্টুদের জ্ঞাতি জ্যাঠা।

ঝণ্টু এখন একটু সামলে নিয়ে বলে, ওই বড়জ্যাঠাটি অবশ্য আমার দুচোক্ষেব বিষ। ওর কাজই হলো আমাদের অনিষ্টর চেষ্টা। অন্য কেউ ওকে ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করলেও আমার কিছু এসে যেতো না। বরং দুহাত তুলে নাচতুম। কিন্তু হিবণ-কাকা। ভাবা যায় না! প্রথমটা বিশ্বাসই করিনি। ভাবলুম বৌদি তো একটু কুচুটে আছে, তাই বানিয়ে বলেছে। কিন্তু যখন দাদা কাকা সব্বাই বললো, তখন।

হঠাৎ থেমে গেলো।

তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, তোরা জানিস না, তা বুঝতে পারিনি! তোদের যা তা বললুম।

দিদি ঠাণ্ডা গলায় বললো, যতোটা বলবার তার কিছুই তো বলিসনি। আরো বলার ছিলো। ছোটলোকের ছেলে মেয়েকে 'ছোটলোক' বলবিনা তো কী ভদ্রলোক বলবি?

বাবা মা ফিরলো। মা আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে। জানিস, আমাদের ভাগ্যে একটা ফেসিং ফ্ল্যাট জুটে গেলো। লটারির ব্যাপারে তো।

দিদি মার দিকে একবার কড়া চোখে চেয়ে বললো, হ্যাঁ। খুবই ভালো ভাগ্য।

বলেই বাবার দিকে তাকিয়ে কোনো কিছু না বলে, একেবারে সোজা প্রশ্ন করলে, বাবা, তুমি এই বাড়িটা ছেড়ে দেবার বদলে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়েছো?

দিদি যে এইভাবে বাবা আসামাত্রই কথাটা তুলবে তা ভাবিনি। একবার তো বলেও ছিলাম, বাবাকে কখন জিজ্ঞেস করবি কথাটা? রাত্তিরে?. অথচ দিদি—

মনে হলো বাবাকে হঠাৎ কে যেন একটা চাবুক মারলো। কিন্তু তক্ষুণি সামলে নিয়ে সাধারণ গলায় বললো, কে বললো?

কে বললো, সেটা বড়ো কথা নয়। নিয়েছো কি না, সেটাই জানতে চাই।

বাবা স্থিরভাবে বলল, নিয়েছি।

নিয়েছো! উঃ। বাবা, বলতে তোমার একটু লজ্জা করলো না?

বাবা বললো, নিতে লজ্জা করলো না, আর বলতে লজ্জা করছে?

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি বাবার মুখের দিকে। মুখে কোনো ভাবই নেই কেন? যেন একটা পাথর কী কাঠের পুতুল কথাটা বললো।

এই সময় মা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে থেকে ঘুরে এলেই চোখে-মুখে জল দেওয়া মার বরাবরের অভ্যাস। এখন মুখের 'মেকআপ' ধুয়ে যাবার ভয় অগ্রাহ্য করেও এটা ক'ে। না করে পারে না বলেই বোধহয়।

বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠলো, তা' এতে লজ্জার প্রশ্ন উঠছে কেন? এমন কাজ ভূভারতে আর কেউ করে না। দোহাত্তাই তো করছে এরকম লোকে। তা' কে খবরটি তোমাদের কানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ঘণ্টুর বৌদিটা বুঝি?

আমি বলে ফেলি, বৌদি কেন, ঘণ্টু নিজেই।

ওঃ। নিজেই। খুব লম্বা চওড়া কথা বলে গেলো বোধহয়? ওই মুকুন্দবুড়ো ওর খুব পেয়ারের লোক বুঝি? তাই তার দুঃখে গলে গেলেন বাবু? বলি—টাকাটা

কী ওই বুড়োর পকেট থেকে বেরিয়েছে? যে কিনছে, সে তার নিজের গরজেই দিয়েছে। জানেই, ভাড়াটেশুদ্ধু বাড়ি কিনলে এরকম দিতেই হয়।

দিদি কথাগুলো শুনলো চুপ করে, তারপর বললো, মা! আমি আমার বাবার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

ওঃ! তাহলে তো আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। একটা বাইরের লোক বৈ তো নয়। তবে জেনে রাখো, ওই ঘণ্টু ছেলেটি বয়েস বেশি না হলেও সোজা ছেলে নয়। ঘোড়েল! কুচুটে।...আমরা বাড়ি কিনছি, আমরা বুঝবো। তুই কোন সাহসে তার মধ্যে নাক গলাতে এসে জিজ্ঞেস করিস, হিরণকাকা হঠাৎ এতো টাকা কোথায় পাচ্ছে?

বাবা বললো, এর মধ্যে ঘোড়েলমির কি আছে? ছেলেমানুষ, জন্মাবধিই দেখে আসছে হিরণকাকা পুঁইশাক কুচো চিংড়ির দরের লোক, হঠাৎ তার এতো লপ্‌চপানি দেখে অবাক তো হতেই পারে। কৌতূহল তো হতেই পারে।

ওঃ। ছেলেমানুষ। যাও তাকে তাহলে আদর করে 'ল্যাবণচুষ' খাওয়াও গে।. বলে মা খটখট করে চলে যায়।

আমি দুম করে বলে বসলাম, জানো বাবা। ঘণ্টু তোমার কথা বলতে গিয়ে শেষে প্রায় কেঁদে ফেললো।

বাবা আস্তে বললেন, তা ফেলতেই পারে। ছেলেটা যে বড্ডো অনেস্ট!

দিদি হঠাৎ বাবার কাছে সরে এসে বাবার কাঁধের কাছটা চেপে ধরে বলে ওঠে, তুমিও তাই ছিলে বাবা!

ছিলাম? না?

বাবা হঠাৎ যেন কৌতুকের গলায় বলে উঠলো, তোর মনে আছে এখনো সেটা? এ ব্যাটা নিজেই ভুলে গেছে।

বাবা। তোমায় বলতেই হবে, হঠাৎ এমন বড়লোক হয়ে উঠছো কী করে? তোমার ওসব বাণিজ্য-ফাণিজ্য বিশ্বাস করি না আমি।

বাবা বললো, করিস না। না? কী করেই বা করবি? দারুণ চালাক যে তুই। পলুটার মতো হলেই পারতিস। আচ্ছা বলবো। সব বলবো একদিন সময় মতো!

ওদিকে মা ঘরের মধ্যে আপনমনে বকে চলেছে, উঃ। কবে যে এই নরকপুরী থেকে উদ্ধার হয়ে গিয়ে বাঁচবো। দিন ক'টা যেন হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।...সেই যে বলে, যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর। আমার হয়েছে তাই। তোমাদের সুখে আরামে রাখবার জন্যেই এতো কাণ্ড। তবে আমিও চাই মানুষের মতো হয়ে বাঁচতে। মানুষের বার হয়েই কাটিয়ে এসেছি এতকাল। চাই! একটু মানুষের মতো বাঁচতে চাই।

'মানুষের মতো করে বাঁচতে চাই।'

এই কথাটা মার মুখে ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি। বাবার নাকের সামনে আঙুল তুলে তুলে বলতো, 'শুনে রাখো' আমি মানুষের মতো হয়ে বাঁচতে চাই।

বাবা চুপ করে থাকতো!

ক্রমশঃ কি জানি কি কৌশলে মা যেন তার সাধের সেই বাঁচার রাস্তাটা খুঁজে পেয়েছে। তাই এখন আর সেভাবে আঙুল তুলে তুলে বলতে শুনি না। শুধু সেদিনই শুনলাম, যেদিন ঘণ্টু বলে গেলো বাবা এই ভাড়া বাড়িটা ছেড়ে দেবার বদলে সাহাবাবুর কাছ থেকে অনেকগুলো টাকা নিয়েছে। চল্লিশ হাজার টাকা। ভাবা যায় না।

নেওয়ার যুক্তিটা কি? ভেবে পাচ্ছি না। তবে মা সেদিন থেকে কেবলই যেন বাতাসকে উদ্দেশ করেই বলে চলেছে—তুই বুড়ো, এই ভাঙা ইঁটের দেওয়াল ক'টা বেচে পাঁচ-সাত লাখ টাকা নিচ্ছিস না? এখানে জমির দর এখন সোনার সমান বলে অন্যের গলায় মোচড় দিচ্ছিস না? তবে? যতো দোষ আমাদের বেলাতেই? যারা 'ছিঃ' দিয়ে গেল, তারা দেখছে না, আজকাল সবাই এই করছে। কেনই বা করবে না? সুযোগ পেলে কে ছাড়ে? ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে লাভটা কী হয়? অ্যাঁ? কেউ মানুষ বলে গণ্য করে? অথচ যারা মাথায় প্যাঁচ কষে গাড়ি বাড়ি করছে, লোকে তাকে পুজ্যি করছে!.. টাকা। টাকাই সব। টাকা আছে তো তুমি আছো'। 'টাকা নেই' তো তুমিও নেই।'

বাবা বাড়ি থাকার সময় ততো বলে না, অন্য সময় বলে। মনে হয় মা তার ছেলেমেয়ের কাছে নিজের কাজের সাফাই গাইছে।

'নিজেরই' তো।

ওই বাড়িওলার কাছ থেকে টাকা আদায়ের বুদ্ধিটি যে স্রেফ মার মগজের ফসল, তা বুঝে গেছি আমরা। অবশ্য ওই 'মগজের ফসল' কথাটা দিদির। দিদিই বলেছে, তবে বাবা এখন শান্তির আশায় তার 'বিবেকটাকে' বন্ধক দিয়েছে। মার নির্দেশে অন্ধের মতো কাজ করে যাচ্ছে।

তাহলে ধরেই নিতে হয়, প্যাঁচটা মার।

তাই মা অতো সাফাই গাইছে।

না কি মা তার ছেলেটা মেয়েটাকে জ্ঞান দিতে চেষ্টা করছে? অবিরত তাই বোঝাতে চেষ্টা করছে, টাকাই জগতের সার সত্য। মানুষের মতো বাঁচতে হলে, টাকা চাই:

'টাকা না থাকলে, জীবনের সব চাকা অচল! বুঝলে বাপু? টাকা না থাকলে পৃথিবীর সব দরজা বন্ধ! টাকা হচ্ছে এ সংসারে 'সবখোল্' চাবি।'

শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাই। এতো কথা মা শিখলো কি করে? এইতো আমাদের সঙ্গেই থাকে!

'মানুষের মতো করে বাঁচার' অনেক সব পথ মার জানা। মাঝে মাঝেই মা সেই পথে এগোতে চায়। তবে তার মধ্যে একটি ছোট্ট অথচ খুব জোরালো ভাবে ছিলো বোধহয়, মার নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশের উৎসবের ছুতো করে এই চিরকালের পাড়ার সবাইকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনা!

দেখুক তারা, যারা মাকে এই গলির মধ্যেকার শ্যাওলাধরা উঠোনে বসে কয়লা ভাঙতে দেখেছে, উনুন ধরাতে দেখেছে, বাসনমাজুনি না এলে বাসন মাজতে দেখেছে, আর যেমন তেমন শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে, দেখুক, সেইটাই সত্যিকার 'চিত্রা মুখার্জী' নয়! চিত্রা মুখার্জীর যথার্থ পরিচয় হচ্ছে ছবির মতো

ফ্ল্যাটে, ছবির মতো সুন্দর করে সংসার সাজিয়ে, ছবির মতো সাজে সেজে ঘুরে বেড়ানো।

এইটি মার বোধহয় অনেকদিনের পোষা সাধ।

কিন্তু বাবা যে মার সেই সাধে বাদ সেধে বসবে, তা কি ভেবেছিলো মা? ভাবেনি। তাই গৃহপ্রবেশের তিন-চারদিন আগে পাড়ায় নেমন্তন্ন করতে বেরোবে বলে শাড়ি বাছতে বসেছিলো।

কোথাও যেতে হলেই মা তার শাড়িগুলোকে সব বার করে ছড়িয়ে বাছতে বসে। মনে মনে ঠিক করে রাখতে পারে না। যখন সেই বাছাবাছি করছে, সেই মোক্ষম সময় কি না বাবা এসে বলে বসলো, তোমার ওই যে কী একটা নেমন্তন্নর লিস্টি আছে? ওটা থেকে এই পাড়ার সব নামগুলো ছাঁটাই করে ফেলো।

কী?

মা যেন হঠাৎ ভূত দেখলো।

বললে, কী? এ পাড়ার সব নাম ছাঁটাই করতে হবে?

হ্যাঁ। ওদের টানবার দরকার নেই।

বলে বাবা চলে যাচ্ছিলো, মা ধেয়ে গিয়ে ধরলো। বললো, এমন অদ্ভুত হুকুমের কারণটা কি?

ধরে নাও কোনো কারণ নেই। এমনি আমার খেয়াল!

ওঃ। তোমার খেয়াল। ওই অদ্ভুত খেয়াল মেনে চলতে হবে আমায়?

বাবা হঠাৎ তার স্বভাব ছাড়া শক্ত গলায় বললো, হ্যাঁ হবে।

মা এমনটা আশা করেনি বোধহয়। তাই একটু থমকালো, তারপর একটু হতাশ হতাশ গলায় বললো, এদের সকলকেই যদি বাদ দেব, তাহলে আর থাকছে কারা?

সে কি? তোমার সব আসল আপনজনেরা, মানুষের মতো বন্ধুরা—

মা আরো নরম হয়ে বললো, বন্ধু আবার আমার কে কোথায় আছে এতো? আলাপ পরিচয় হয়েছে, এই মাত্র। এরাই তো চিরকালের। ঘন্টুদের বাড়িটাও বাদ দেওয়া হবে বলতে চাও?

হ্যাঁ। সেটাই বিশেষ করে বলতে চাই।

বলে বাবা চলে গেলো।

মা একটু হতভম্ব হয়ে বসে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, হ্যাঁরে পনু, ওদের সঙ্গে তোর বাবার হঠাৎ কিছু হয়েছে নাকি?

দিদি স্রেফ ঘেন্না দেওয়া গলায় বলে উঠলো—বাবার সঙ্গে কখনো কারুর কিছু হতে দেখেছো মা?

তাহলে হঠাৎ এরকম হুকুমের মানে?

মানে বোঝবার ক্ষমতা কি আছে তোমার মা? তুমি ওদের সামনে দেখাতে বসবে, তুমি চিরকালই এইরকম। চিরকালই তুমি পেটকাটা ব্লাউজ আর হাওয়া শাড়ি পরে শ্যাম্পু করা চুল উড়িয়ে উড়িয়ে মিহি গলায় কথা কয়ে এসেছো! এটা চোখে দেখা খুব শক্ত।

নাঃ। এই একটা জায়গায় মাকে বাবার বারণ মানতে দেখলাম। বাবাকে হঠাৎ এমন শক্ত হতে দেখে বোধহয় ঘাবড়ে গেছে একটু। কাজেই মার বড় সাধের ওই

লিস্টটা থেকে ছাঁটাই করতে হলো, এ পাড়ার সব নাম।

আমার কিন্তু এসময় বাবাকে খুব নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিলো। ঘণ্টু আমাদের বাড়িটা দেখবে না! আর ঘণ্টুর কাকিমা বৌদি দিদি এরাও!

একবার মনে হচ্ছে, ওই সাহাবাবুর সঙ্গে সেই টাকার ব্যাপারে বাবা লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না ওদের কাছে। তাই নেমন্তন্ন করতে চাইল না। আবার মনে হচ্ছে, সেই যে মা কনি দিদির কাছে হেসে হেসে বলছিলো, দেখিস ঘণ্টুর দিদি বৌদি কাকিমা সবাই নির্ঘাৎ ওখানেও একগাদা করে সোনা গায়ে চাপিয়ে নেমন্তন্ন যাবে! দেখেছি তো—মাথা থেকে পা পর্যন্ত সোনায় মুড়ে নেমন্তন্ন যায়। সোনাই আছে তাল তাল, টেস্ট বলে তো কিছু নেই। ইয়া মোটা মোটা ভারী ভাবী সব গহনা। ওখানে আশপাশের অন্য ফ্ল্যাটেরা আমার 'বান্ধবী'দের নমুনা দেখে হাসবে।

সেই কথাটা বাবা শুনতে পেয়েছিলো নিশ্চয়। তাই।

কিন্তু পাড়ার সকলের তো আর অতো সোনাটোনা নেই। তাহলে সবাইকেই কেন বাদ? ওঃ। ইস। ঘণ্টুদের বাদ দিয়ে অন্যদের বলা যায়?

দিদি বললো, বাঁচা গেলো।

কেন যে এমন বলে দিদি। আমার কিন্তু খুব মন খাবাপ লেগেছে।

এমনিতেই তো যখনি ভাবছি আর এখানে থাকবো না আমরা, সমস্ত চেনা দৃশ্যগুলো আর দেখতে পাবো না, তখনি মনটা যেন কীরকম হয়ে যাচ্ছে।

তবু একটা ভালো, ঘণ্টু এখন এখানে নেই। নাকি কি একটা ট্রেনিং-এর জন্যে স্কুল থেকে দল বেঁধে কোথায় ক্যাম্প করতে গেছে।

দুটো দিন হুড়মুড়িয়ে কেটে গেল।

আমরা এ পাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

অতো দূরে থেকেও মা যে কি করে এতো ব্যবস্থা করেছে ভগবান জানেন। অবশ্য মার দুই দিদি আর দুই জামাইবাবু মার সব কাজে সহায় হয়েছে।

লোকজন খাওয়ানোর জন্যে ক্যাটারার ব্যবস্থা করা থেকে আলোফালো সব।

এই ফ্ল্যাটগুলোর জন্যে খুব চমৎকার একটা ব্যবস্থা, প্রতিটি 'ব্লক'এ একটা করে 'কমন প্লেস' রেখেছে যে কোনো ব্যাপারে লোকজন খাওয়ানোর জন্যে। তাছাড়া অন্য ফাংশানেও নিতে পার যাবে! সকলেরই অধিকার। তবে আগে থেকে বুক করতে হবে।

সুন্দর করে সাজানো একটা গোল মতো ঘেরা জায়গা। মাথায় শেড্। তার মানে—বাড়িতে যজ্ঞি লাগলেই গাদা গাদা বাঁশ আর দড়ি এনে ফেলতে হবে না বাড়ির ছাদে প্যাণ্ডেল করতে। ছাদে না কুলোলে, ক্লাবের মাঠে। বাঁশ দড়ি তো চাই-ই চাই।

অথচ এখানে?

নাঃ মাকে বাহাদুরি না দিয়ে পারা যাবে না!

সত্যিই মা আমাদের নন্দন কাননে এনে হাজির করে দিয়েছে!

কি সুন্দর জায়গা।

চারিদিকে শুধুই এইরকম সুন্দর সুন্দর বাড়ি।

কোনোখানে একটা অরুচিকর দৃশ্য নেই!

আমাদের ফ্ল্যাটটা তিনতলায়।

তিনতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালে সত্যিই হঠাৎ মনে হয় যেন স্বর্গের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। জগতে এত খোলা বাতাস, এমন নীল আকাশ, এমন অবাধ আলো ছিলো কে জানতো?

ক'দিন হয়ে গেলো, তবু যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না আমরা সত্যিই এখানের লোক হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে যেন কোনো বিদেশে বেড়াতে এসেছি।

অবশ্য 'বিদেশের' অভিজ্ঞতা আর আমাদের কতটুকু? একবার ছোটোমাসির সঙ্গে হাজারিবাগ আর একবার বড়মাসির সঙ্গে দেওঘর, এই তো স্মৃতি। বাবা বাড়িতে থেকেছে, মা আমি আর দিদি গেছি। তাও সে ছোটবেলায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়াটাকে যেন সত্যিই 'খাচ্ছি' এমন সময় মা এসে দাঁড়ালো।

বললো, কী রে? কেমন?

বিগলিত না হয়ে পারলাম না।

মা বললো, শেষ পর্যন্ত স্বপ্নটা একটু সফল হলো।

আমি বলে উঠলাম, 'একটু' কেন? সবটাই তো?

মা একটু রহস্য মতো হাসি হেসে বললো, এতেই সবটা? দূর পাগল! এই বাড়িকে উপযুক্ত ভাবে সাজাতে হবে না? এখনো কত বাকি। তাছাড়া—

থেমে গিয়ে আবার হাসল।

প্রথম আসার দিনও মা এই ভাবে হেসেছিল।

সব জিনিসপত্র নামানোর পর ফ্ল্যাটের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাবা বিছানার বাণ্ডিলটার ওপর বসে পড়ে মার দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিল, কী? হয়েছে তো? এইবার তাহলে আমার ছুটি?

মা আহ্লাদে গলায় বলে উঠেছিল, কী ছুটি? তা আর নয়? এক্ষুনি ছুটি? দিচ্ছে কে? দেখ না তোমায় কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলি!

বলেছিলো, আর এমনি রহস্য রহস্য হেসেছিলো।

কিন্তু 'সমস্যা' জিনিসটা সবসময় থাকবেই।

এ বাড়িতে এসে যখন আহ্লাদে হাসা হচ্ছে, মনে পড়ে গেলো, দিদির পার্ট টু পরীক্ষা এসে গেল বলে।

এতোদূর থেকে দুটো বাস বদল করে করে তো আর পরীক্ষা দেওয়া যায় না?

মা তাই বলতে শুরু করেছে একটা টেলিফোন থাকা খুব জরুরি। টেলিফোন থাকলে, এক্ষুনি ফোন করে বড়দি কি ছোড়দির সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে ফেলতে পারতাম, ওদের কারো কাছে পরীক্ষার সময়টা থাকতে।

দিদি অবশ্য কথাটা নস্যাৎ করে দিলো। বললো, ধ্যাৎ। সাতজন্মে থাকিনি।

মা বললো, দরকার হয়নি, তাই থাকিসনি। থাকতে অসুবিধেটা কী?

যথেষ্ট অসুবিধে। মাসিমেসো ছাড়াও ওদের বাড়িতে অন্য সব লোক আছে অচেনা অচেনা।

অচেনা আবার কী? থাকলেই চেনা হয়ে যাবে। একটা নাহয়—চিঠিই লিখি—

দিদি বললো, আমার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি আমার কোনো বন্ধুর বাড়িতে থাকা যায় কিনা দেখছি।

বন্ধুর বাড়িতে।

মা আকাশ থেকে পড়ে, এমন কে বন্ধু আছে তোর, যার বাড়িতে এতোদিন থাকা যায়?

দিদি বললো, চিরদিন থাকা যায়, এমন বন্ধুও আছে!

ব্যস। ওইখানেই শেষ।

আর মুখ খুলবে দিদি, এমন মনে হয় না।

বাবা বোধহয় মার ঠ্যালায় পড়ে বললো, হ্যাঁরে পুতুল, কোথায় যেন গিয়ে থাকবি বলছিস?

থাকবো বলিনি এখনো বাবা। বলেছি থাকা যায়। দেখা যাক।

কিন্তু পরীক্ষা বলে রাতদিন পড়ছে কই দিদি?

এই বারান্দাটায় বসেই তো পড়তে পারে। এতো আলো এতো হাওয়া।.. এসে দাড়ায় বটে, কিন্তু বইপত্র নিয়ে নয়।

আমি তাই করি।

মনে হয় সত্যি এতো আলো এত হাওয়া ছিল আমাদের জন্যে?

কিন্তু আশ্চর্য। বাবা কিনা হঠাৎ হঠাৎ বলে ওঠে, আচ্ছা বাড়িটা তোদের একটু খাঁচা খাঁচা মতো মনে হয় না?

আমি তো হাঁ। বলো কী বাবা? এতো আলো হাওয়া চারিদিকে কতো খোলা-মেলা! সামনে খোলা আকাশ!

বাবা একটু অপ্রতিভ হয়ে বলে, তা ঠিক। বাইরেটা তো সত্যিই খুবই চমৎকার। মানে ভেতরটার কথা বলছি, বাইরে থেকে এসে যেই ভেতরে ঢুকে পড়লাম, মনে হয় না যেন একটা বাক্সর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। একটা ভিন্ন দুটো দরজা নেই। আর দ্যাখ শোবার ঘর থেকেই রান্না বাসনমাজা সবই দেখা যায়। আবার শোবার ঘরের মধ্যে থেকেই স্নানের ঘরে ঢুকে পড়লাম। বেরিয়ে এলাম সেই শোবার ঘরেই। কেমন যেন হাঁফ ধরা ভাব লাগে না?

শুনে দিদি হেসে গড়ায়, ও বাবা! মা ঠিকই বলে, তুমি একদম একটা জংলী গাঁইয়া। সভ্যতার প্রথম পাঠই যে হচ্ছে 'অ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুম' এও জানো না?

বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে, কখনো হঠাৎ হঠাৎ দিদি এরকম হাসে। তবে বেশি সময় তো কেমন ঠাণ্ডা বরফ বরফ। তবে মার সঙ্গে কথা কইতেও হেসে গড়ায় কখনো কখনো। এই যেমন সেদিন মা কী কথায় বলে উঠলো, 'টেলিফোন জিনিসটা একেবারে' অবশ্য প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে শহর থেকে এতো দূরে থাকতে হলে চটপট একটা দরখাস্ত দিয়ে দাও বাপু।

বাবা বলে উঠলো, ও আশা ছাড়ো এখন। এ তোমার 'ভি. সি. আর' নয় যে টাকা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই নিয়ে আসা যায়।

· মা মুচকি হেসে বললো, টাকার মতো টাকা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারলে

সবই মেলে।

তাই শুনে দিদি হেসে গড়াতে শুরু করলো। ওঃ মা। তুমি জগতের এতো সব গোপন তথ্য কোথা থেকে জেনে ফেললে মা? দৈববলে না কী? এখনো যে তোমার গায়ে শ্যামপুকুর লেনের গন্ধ লেগে রয়েছে গো।

আচ্ছা এতে মা রেগে যাবে না?

শ্যামপুকুর লেনের গন্ধটাকে একেবারে মুছে ফেলবার জন্যেই কী একটা মস্ত জিনিস বিসর্জন দিয়ে বসলে মা? নাকি এইখানে আশেপাশের ফ্ল্যাটে যেসব মহিলারা রয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে এক দুদিন শৌখিন আলাপ হয়েছে মার তাদের মতো হয়ে ওঠবার জন্যেই?

জানি না কিসের জন্যে।

তবে হঠাৎ একদিন মা একটা কাণ্ড করে এলো।

কাণ্ডই বলবো।

মার সেই সাধের 'বিউটি পার্লার' থেকে, চুলগুলোকে বিসর্জন দিয়ে 'নব' ছাঁট করে এলো। না কী বয় ছাঁট? জানি না। ঘাড়ের নীচে গিয়েই তো থেমে গেছে।

এ কী! একে কি বলে? পিঠ ঢেকে দেওয়া অতো চুল মা'র। যার জন্যে ছাতে উঠে চুল শুকোতে হতো! চুল নিয়ে মা'র তো বেশ গর্বও ছিলো। সেইগুলো এমন সাফ্ করে এলো।

আমি তো চীৎকার করেই উঠলাম, মা! এ কী বিচ্ছিরি করে এলে? দিদি। দেখে যা! মা কি কাণ্ড করেছে।

দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এক সেকেণ্ডে দেখে বলে উঠলো, বিচ্ছিরি কীরে মুখ্যু? গাঁইয়া। এতো মার্ভেলাস। ফাইন! যাক, এতোদিনে পুরোপুরি জাতে উঠলো তাহলে মা।

মা জানতো অবশ্যই কিছু সমালোচনার মুখে পড়তে হবে, তাই শক্ত হয়েই ছিলো। বললো, একগাদা চুল নিয়ে কী স্বর্গলাভ? শুকোতে দেরী, শ্যাম্পু করতে অসুবিধে! গরমে কষ্ট! এখন যা আরাম লাগছে। মাথাটা কী হাল্কা ঠেকছে। কেন বাবা, এতো অবাক হবার কী আছে? সর্বদাই তো দেখছো। তোমাদের সেই সাহাবাবুর বাড়ির পাড়ার বাইরেও যে একটা জগৎ আছে—তা তো জানতে পেরেছ? কেন? খুব খারাপ লাগছে দেখতে?

আমি বললাম, খুব! যাচ্ছেতাই।

দিদি বললো, কি যে বলিস! কি দারুণ আধুনিক লাগছে দেখতে পাচ্ছিস না? এরপর হয়ত 'মা' বলে ডাকতে সমীহ আসবে। মিসেস মুখার্জি বলতে হবে!

তা তুমি পারো।

মা চড়া গলায় বলে, মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি সত্যিই আমার পেটের মেয়ে, না সতীন ঝি।

'রাগের চোটে এমন সেকেলে কথাটা বলে ফেললে মা? ছি ছি।' বলে দিদি গালে হাত দিলো।

আমি না বলে পারি না, তোমার মায়া হলো না মা?

মা রেগে বললো, আমার মধ্যে মায়ার অতো বাজে খরচ নেই।

কিন্তু বাবা?

বাবা যে এতে এতোটা আপসেট হয়ে যাবে, তা কে ভেবেছিল? বাবা তো মার সবকিছুই উদাসীন ভাবে দেখে। অথচ আজ? বাবা যেন হঠাৎ একটা সাপটাপ কিছু দেখলো।

বাবা মার দিকে তাকিয়ে সেইভাবে আর্তনাদের মতো বলে উঠলো, বুলু!

'বুলু' মার ডাকনাম। মাসিরা তো সবসময় ডাকে। বাবার মুখে কোনোদিন শুনিনি এই ডাক, মনে হলো ডাকটা কী মার মধ্যে ছুরি দিয়ে চিরে ঢুকে গেলো?

মা একটু হতভম্ব হলো!

বাবার সম্পর্কে তেমন কোনো চিন্তা থাকে না মার। যতো থাকে দিদির সম্পর্কে।

না আর কোনো কথা বলেনি বাবা। জামাটামা ছেড়ে স্নানের ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। আর পরেও ওই চুল নিয়ে কোনো কথা বলেনি।

মা দু'একদিন একটু যেন আড়ষ্ট আড়ষ্ট হয়ে থাকলো। কিন্তু কী করবে? ইচ্ছে করলেই মাথার চুলকে কেটে মাথা থেকে নামানো যায়। কিন্তু প্রাণপণ ইচ্ছে করলেও তো কাটা চুলগুলোকে আবার মাথায় ফিরিয়ে আনা যায় না।

তবে বাবা যখন আর কিছু বললো না, মা বোধহয় নিশ্চিন্ত হলো। আবার যথারীতি 'টেলিফোন' নিয়ে মাথা খাটাতে, আর ঘামাতে লাগলো। আর যখন তখন শোনাতে লাগলো, এখানে আমার দলেরা, কে কে কীরকম তাড়াতাড়ি 'টেলিফোন' পেয়ে গেছে।

মনে হচ্ছে ওটা না করে ছাড়বে না মা! দেওয়ালকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'ঘুষ' বলে অবাক হবার কী আছে? এ যুগে ঘুষ ছাড়া কোন কাজটা উদ্ধার হয়? সামান্য একটা ট্রেনের টিকিটের জন্যেও তো হয়। ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্তি করতে গেলে হয়।

আমিই একদিন বলে ফেললাম, তা হোকগে। কিন্তু টেলিফোন টেলিফোন করে তুমি এমন করছো, খেতে না পেয়ে খাবার জন্যেও বোধহয় কেউ এতো অস্থির হয় না।

মা বোধহয় আশা করেনি আমি এমন কথা বলতে পারি। আমি তো এই সুন্দর অবস্থায় এসে পৌঁছনোয় মার ওপর বেশ কৃতজ্ঞই।

তাই মা একটু অবাক হয়ে তাকালো, তারপর শক্ত গলায় বললো, অন্যভাবে বাঁচতে হলে মানুষের মতো হয়ে বাঁচতে হলে, এসবও 'ভাতের' মতোই দরকারি পলু।

তারপর বললো, আমি তোদের মানুষের কোঠায় তুলতে চাই। চারদিকে তাকিয়ে দেখছিস? কীভাবে আছে সবাই।

একদিন এরকম একটা কথা শুনতে পেয়ে বাবা বললো, এমন এলাকাও আছে, যেখানে পৌঁছলে তোমার এদেরকে ভিখিরি বলে মনে হবে।

তেমন এলাকায় যেতে চেয়েছি?

চাইতে কতোক্ষণ?

মা বললো, কুয়োর ব্যাঙরা ওই রকমই ভাবে। টেলিফোন কেন, গাড়ি না করেই কি ছাড়বো ভেবেছ? উচ্চাভিলাষই হচ্ছে, মানুষের ধর্ম!

বাবা একটু হেসে বললো, বেশি ধার্মিক হতে গিয়ে দমটা না ফেল করে।

মা বললো, আমার দমটা অতো ঠুনকো নয়।

বাবা বললো, তোমার কথা তো বলিনি।

দিদির পরীক্ষা এগিয়ে আসছে।

ভেবে পাচ্ছি না দিদি কোন্ বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকবে পরীক্ষার সময়। দিদির সব বন্ধুদেরই তো চিনি আমি। শুভ্রা, অপালা, শ্রেয়া, অরূপা, দিয়া। কার সঙ্গে এমন বেশি ভাব দিদির? কার সঙ্গেই বা দেখা হয়?

বন্ধুদের সঙ্গে দেখা আমারও আর হয় না।

হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, এটা যেন আমাদের অন্য আর একটা জন্ম। পুরনো পরিচিতরা কেউ কোথাও নেই। এইরকম একটা মন খারাপ খারাপ দিনে হঠাৎ এক ঘটনা।

মা বাড়ি নেই। দিদিও না! বাড়িতে বাবা আর আমি। দরজায় বেল বাজতেই, ওরা এসেছে ভেবে ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই হাঁ।

ঘণ্টু!

ঘণ্টু। তুই!

তবু ভালো নামটা মনে রেখেছিস!

বলে ঢুকে এসে বাবাকে প্রণাম করে বলে ওঠে, খুব যাহোক হিরণকা। চলে এলেন! একটা ঠিকানাও রেখে এলেন না। উঃ। বাড়ি খুঁজে বার করতে একেবারে হাড়ে হলুদ! আপনারা আসার আগে দেখা হল না।

বাবা ওর কাঁধে একটা হাত রেখে আস্তে বললো, কেউ যে আমাদের দেখতে এতোদূর আসবে, এমন আশা করিনি ঘণ্টু!

উঃ। ঘণ্টুটা দেখছি আরো লম্বা হয়ে উঠেছে। বাবার মাথা ছাড়িয়ে গেছে। কথা তো জোরালো ছিলোই। বলে উঠলো, চমৎকার। কেউ আপনাদের দেখতে আসবে এমন আশা করেননি? কী আশ্চর্য! বাঃ। বেশ সুন্দর ফ্ল্যাট। কই কাকিমা? পুতুল?

বাড়ি নেই! এসে যাবে। তুমি বোসো! কী রে পলু, অমন বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছিস যে? বন্ধুকে বসা। নয়তো ঘরে নিয়ে যা!

ঘরে কেন? বারান্দায় যাই।

বাবা বললো বাড়ির সব ভালো?

হ্যাঁ। তবে আপনারা পাড়ায় না থাকায় সকলেরই খুব মন খারাপ। দাদা বলছিলো, আমাদেরই খুব অন্যায় হয়ে গেছে। ঠিকানাটা চাওয়া হয়নি। চাওয়া উচিত ছিলো। আসলে আমি তো ছিলাম না। কাকা ভেবেছিলো দাদা বোধহয় জানে, আর দাদা ভেবেছে হয়তো আমি জানি।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি!

ওরা ভাবছে ওদেরই অন্যায় হয়ে গেছে!

আর আমরা?

কিন্তু ওরা কি জানতে পেরেছিলো, বাবা ওদের নেমন্তন্ন বাতিল করে দিয়ে-

ছিলো! মা দায়সারা গোছের শুধু একটু দেখা করে এসেছিলো।

বারান্দায় যাচ্ছি, আবার বেল্।

ঘণ্টু বললো, দাঁড়া আমি খুলছি। নিশ্চয় কাকিমারা।

তারপরই শুনলাম বলে উঠলো, কি রে? ভূত দেখলি না কি?

দিদি ঢুকে আসতে আসতে বললো, ভূতও বলতে পারিস্ ভগবানও বলতে পারিস।

দরজা তো খুব একটা দূরের ব্যাপার নয়, এগিয়ে গেছি। ঘণ্টু বলছে, কই কাকিমা এলেন না?

কাকিমা? আমি কি তোর কাকিমার ল্যাংবোট হয়ে বেরোই না কি?

দিদিকে দেখে বাবা যেন বাঁচলো। বললো, পুতুল, তোদের মা বাড়ি নেই, তুই দ্যাখ। ঘণ্টুকে একটু কিছু খাওয়া-টাওয়া।

দিদি বলে উঠলো, হচ্ছে বাবা! ঘণ্টু কি তিনদিন উপোসী হয়ে হত্যে হয়ে এসে পড়েছে?

বাঃ। কতোটা দূর হয়ে গেছে তা ভাব!

দিদি বললো, কতোটা 'দূব', সেটাই আগে দেখে নিই বাবা।

তা দিয়েছিলো চা বানিয়ে খাবার গুছিয়ে।

ফ্রীজের মধ্যে থেকে কি সব বারটার করে। সেই অবসরে আমি বলেছিলাম, ঘণ্টু আমি ভেবেছিলাম, তুই হয়তো আর আমাদের মুখ দেখবি না।

কেন? কি ব্যাপার? মুখের কি অপরাধ হলো?

ভেবে দ্যাখ।

ঘণ্টু একটু থেমে বলে উঠলো, ওহো হো। সেই বড় জ্যাঠার কথা? শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছিলো, বেশ করেছে হিরণকাকা। আরা বেশি নিলেও ভালো হতো। কী করেছে জানিস বুড়ো? ওই ভাঙা বাড়ি বলতে গেলে বাড়ি নয়, তাব তিন, না কি সাড়ে তিন কাঠা জমি কি না চার লাখ টাকায় বেচেছে একটা প্রোমোটারের কাছে। ভাব? সব্বাই লোভী আর জোচ্চোর হয়ে যাচ্ছে।

বাবা শুনতে পেয়ে—শুনতে তো পাবেই, এ বাড়িতে তো কেউ একটা হাই তুললেও সবাই শুনতে পায়। শুনতে পেয়ে বলে উঠলো, ঠিক বলেছো ঘণ্টু। কারেক্ট। লোভী আর জোচ্চোর। আমবা সবাই। হঠাৎ যদি দেখো তোমার এই হিরণকাকাকেও পুলিশে হাতে হাতকড়া পরিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, অবাক হবাব কিছু নেই।

হিরণকাকা এই কদিনের মধ্যেই খুব বুড়ো বুড়ো দেখতে হয়ে গেছে।

বলে দুঃখ করেছিলো ঘণ্টু।

তারপর দুঃখ করেছিলো, 'কাকিমার সঙ্গে দেখা হলো না' বলে।

দিদি বললো, দেখা হলো না, ভালোই হলো। দেখলে আরো দুঃখিত হতিস।

ঘণ্টু চমকে উঠলো, কেন? খুব রোগা-টোগা হয়ে গেছে বুঝি?

বালাই ষাট। রোগা তার শত্তুররা হোক। ফ্যাটে ফাটছে।

ঘণ্টু বলল, তাহলে? কি ব্যাপার?

সে বলে বোঝানো যাবে না। বললাম যে দেখা হলো না, ভালোই হলো। তাছাড়া

দেখা হলে তোকে নির্ঘাৎ 'কিশলয়' বলে ডাকতো।

কিশলয়। মানে আমার পোশাকী নামটা ধরে? কেন রে?

কেন? মা নিজেই এখন পোশাকী হয়ে যাচ্ছে বলে। জানিস এ বাড়িতে এসে মা পলুকে 'পল্লব' আর আমাকে 'মালবিকা' ডাক চালাবার চেষ্টা করেছিলো। পেরে উঠলো না। জোর—প্রতিরোধের সামনে হেরে গেলো।

ঘণ্টু দিদির মুখের দিকে একটু হাঁ করে তাকিয়ে দেখে বললো, পলুটা তবু চেহারায় একটু বদলেছে। তুই কিন্তু একটুও বদলাসনি।

দিদি বললো, বোকারাই ঘনঘন বদলায়।

যাবার সময় ঘণ্টু আবার বাবাকে প্রণাম করলো।

আর বাবা সেই সময় খুব শান্ত গলায় বললো, বাড়িটা তুমি চিনে গেলে, খুব ভালো হলো।

খুবই সাধারণ কথাই তো।

তবু বাবার বলার ধরনে কেমন যেন ভয় করে উঠলো।

যেন কথাটার মধ্যে কোনো গভীর ভাব রয়েছে।

ঘণ্টু বললো, আজ চিনে গেলাম, আবার আসবো।

বাবা সেইভাবেই বললে, সে তো আসতেই হবে।

এ কথাটা শুনেই বা আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো কেন?

বললাম, বাবা, আমি ঘণ্টুকে বাস রাস্তা পর্যন্ত পেঁছে দিতে যাচ্ছি।

বাবা কিছু বলার আগে ঘণ্টুই হৈ হৈ করে উঠলো, না না। কেন মিছিমিছি। এতো আর আমাদের সে পাড়া নয় যে, বেরোলেই বাস। এখান থেকে অনেকটাই তো দূর। পাড়াটা সুন্দর, তবে এই একটা অসুবিধে। তাহোক। রাস্তাটা চমৎকার। ফাঁকা। চারদিক দেখতে দেখতে চলে যাবো। সঙ্গে গেলে তোকে একা ফিরতে হবে, খুব খারাপ লাগবে তোর।

বাবা বললো, ঠিক। ঠিক বলছো। একা রাস্তা চলা খুব কষ্টের।

কীরে বাবা। বাবা আজ এমন গম্ভীরভাবে কথা বলছে কেন। আমি অবশ্য চিরকালই খুব বোকা। দিদির বুদ্ধির একশো ভাগের এক ভাগও নেই আমার, তবু আমারও যেন কেমন অস্বস্তি লাগছে বাবার কথা শুনে। কথাগুলো যেন সহজ হয়েও সহজ নয়।

বাবার তো আস্তে কথা বলা স্বভাব, তাই বলেছে। যার সব সময় জোরে কথা বলা স্বভাব, সে তাই করে।

মা বাড়ি ঢুকতে ঢুকতেই হৈ চৈ করতে লেগে যায়, উঃ। 'বাস' জিনিসটা হচ্ছে একটা নরক! বুঝলে স্রেফ নরক। কী অমানুষিক ভীড়। আমি তো একে বলবো শুধু অসহ্যই নয়, অশ্লীল। ভদ্রলোকে চড়বার মতো গাড়ি তোমাদের এই 'বাস' নয়।

ফুলস্পীডে পাখা ঘুরছে, তবু মা টেবিল থেকে কী একখানা পাতলা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে নেড়ে নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে বলে চলেছে—গাড়ি নয় ডাস্টবিন! যেমন গরম তেমনি নোংরা, উঃ। দুবার বাস বদল করে আসা। ভাবতে পারো কী ভাবে আসতে হয়েছে। ভাবছো দেরী হলো কেন? প্রাণটা নিয়ে ফিরতে পেরেছি

এই ঢের। গলা শুকিয়ে গেছে। ভদ্রলোকে চড়ে ওতে?

যেন যাদের এসব শোনাচ্ছে মা, তারা রোজ দুবেলা হাড়ে হাড়ে টের পায় না বাসে কতোটা ভীড় হয়।

আসলে এটি 'দেরী'র কৈফিয়ৎ।

দিদি নীরবে ফ্রীজ থেকে ঠাণ্ডা জল বার করে একগ্লাস 'রসনা' বানিয়ে মার সামনে ধরে।

মা সেটা এক চুমুকে খেয়ে 'আঃ' বলে গেলাসটা দিদির হাতে ফিরিয়ে দেওয়া মাত্র দিদি বলে ওঠে, তাহলে মিসেস মুখার্জীর এবার 'ভদ্রলোকে' চড়বার যোগ্য একখানা গাড়ি হলো বলে।

না বলতে শরবৎ পেয়ে মার যেটুকু ভালো লেগেছিলো, ওই 'মিসেস মুখার্জী' ডাকে সেটুকু উবে গেলো। যাবার কথাও অবশ্য।

মা জ্বলে উঠলো।

আর সেই রাগের আগুনেই বোধহয়, যে খবরটা পরে ধীরেসুস্থে গুছিয়ে বলতো, সেটাই ফস করে বলে বসলো।

বললো, হবেই তো। হচ্ছেই তো। না হইয়ে ছাড়বো না কী আমি? এই তো, তাই দেখতেই তো গিয়েছিলাম।...ছোটো জামাইবাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখে এলাম। ওরই এক ক্লায়েণ্টের গাড়ি। শুনতেই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। 'কনডিশান' খুবই ভালো। দেখতে প্রায় নতুন। ভদ্রলোক এই মারুতিটা বেচে দিয়ে একখানা বড় অ্যামবাসাডার কিনতে চান, তাই বেচে দেওয়া। জিনিসটার পক্ষে দামও খুবই সস্তা। আসলে ছোটজামাইবাবু মাঝখানে থাকছে বলেই কমে দিচ্ছে।

আমি ফট করে জিজ্ঞেস করে বসি, কতো দাম মা?

মা অবহেলার গলায় বললো, মাত্র পঞ্চান্ন হাজার।

পঞ্চান্ন হাজার। অথচ মা বলছে সস্তা। বলছে মাত্র। হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকি। মা কোন্ জগতের হয়ে গেছে?

কিন্তু দিদি হাঁ হলো না। বলে উঠলো, বলো কী মা? এ যে জলের দর। বাবা শুনলে?

বাবা বললো, শুনলাম!

বাস, চটপট পার্সটা 'খুলে ফেলো।' যতো তাড়াতাড়ি নরক দর্শন বন্ধ করা যায়।

বাবা বললো, দেখি কোনটা আগে বন্ধ হয়। দমটা বন্ধ হয়ে বসলেই তো মুস্কিল।

মা বললো, হ্যাঁ, এখন এইসব দার্শনিক বাক্যি চলতে থাকবে। যেন গেরস্ত লোকে গাড়ি কেউ কেনে না। যেন এখানে যারা বাস করছে, তারা সবাই রাজারাজড়া। সবাই চাকরীবাকরী করা ভদ্রলোক বুঝলে? আমি ছোট জামাইবাবুকে বলেছি কথা দিয়ে আসতে। ওটা আমিই নিচ্ছি।

তুমিই নিচ্ছো?

বাবা হঠাৎ যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তাহলে আর আমার টেনশনের কি আছে?

মা তীক্ষ্নভাবে বললো, যতো বয়েস হচ্ছে ততো ঢং বাড়ছে। বলে রাখছি—

দামটা পুরো সবটা একসঙ্গে না দিলেও হবে। বলেছে দুটো ইনস্টলমেণ্টে দিলেও চলবে।

গাড়ি একখানা না করে ছাড়ছি না বাবা।

মার জোরে উচ্চারণ! দেখছিস এখানের অবস্থা? গাড়ি না হলে চলে কখনো? সক্কলেরই প্রায় গাড়ি আছে।

বাবা বললো, অনেকেরই অফিসের গাড়ি।

তার মানে তারা তেমনি কাজ করে। 'কর্পোরেশনের' পারমিট' বাবু তো নয় সকলে। কিন্তু সেইটাই শেষ পরিচয় হবে না কী? ফার্স্ট ইনস্টলমেণ্টের টাকাটা বাপু তাড়াতাড়ি চাই। দেরী করলে হাতছাড়া হয়ে যাবে। সুযোগ বার বার আসে না।

বাবা বললো, আমায় একবার না জানিয়েই একেবারে কথা দিয়ে এলে?

তোমায়? তোমায় জানিয়ে অনুমতি পেতে আমার মাথার চুলগুলো বিলকুল সাদা হয়ে যেতো হে মশাই। বলে মা কেমন একরকম গা মোচড় দিয়ে হেসে ঘর থেকে চলে গেলো।

চা খেতে খেতে দিদি বললো, আমি তাহলে কলেজ থেকেই ওখানে চলে যাচ্ছি মা। ঘণ্টু আসায় সুবিধে হলো। বলে রেখে দিলাম।

মা আকাশ থেকে পড়লো।

কলেজ থেকে কোথায় যাচ্ছিস?

কেন, ঘণ্টুদের বাড়িতে?

ঘণ্টুদের বাড়িতে কি জন্যে? কি ব্যাপার ওদের বাড়ি?

দিদি বললো, ওদের আবার কি? ব্যাপার তো আমারই। ও মা, বলে রাখিনি পরীক্ষার সময় বন্ধুর বাড়ি গিয়ে থাকলে সুবিধে!

মা ভুরু কুঁচকে বললো, ঘণ্টু তোর সেই বন্ধুকে চেনে?

তার মানে?

মানে, বলিল যে ঘণ্টুকে দিয়ে বলে রেখেছি!

শুনে দিদি হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসি আর থামতে চায় না। তারপর বলে, ঘণ্টুই যে আমার সবচেয়ে বন্ধু, 'তো' তোমার মনে পড়লো না? ওদের বাড়িতেই তো থাকবো!

ঘণ্টুই তোর সবচেয়ে বন্ধু?

তা নয়? প্রাণের বন্ধুই তো! কই আর কোনো বন্ধু হাড়ে হলুদ করে ঠিকানা খুঁজে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে?

মার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেছে।

রাগে মার মুখটা আগুনের মতো হয়ে উঠেছে।

কি বললি? ঘণ্টু তোর প্রাণের বন্ধু? তাই ওদের বাড়িতেই থাকতে যাবি? বলতে লজ্জা করলো না তোর? মুখে আটকালো না?

দিদি অবাকের গলায় বলে, এ মা। মুখে আটকাবে কেন? ঘণ্টুদের বাড়িতে থাকাই তো সবচেয়ে সুবিধে। চিরকালের চেনা বাড়ি, চিরকালের চেনা পাড়া।

রাগে মার কাটা ছাঁটা চুলগুলোও যেন ফুলে উঠে সাঁইবাবার মতো দেখতে

লাগছে। চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে।

মা সেই আগেকার মতো, মানে 'সভ্য' হবার আগের দিনের মতো দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলো, 'চিরকালের চেনা!' যা তাহলে ওই ঘণ্টু মুখপোড়াটাকে বিয়ে করে, সেই চিরকালের চেনার ঘরে গিয়ে থাকগে যা লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে।

দিদি হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেলো। বললো 'বিয়ে' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারো না তোমরা মা, তাই না? জগতে একটা কথাই জানো—বিয়ের ফাঁস গলায় পরিয়ে দিয়ে একটা লোককে 'ক্রীতদাস' বানিয়ে ছেড়ে সর্বদা তার নাকের ওপর আঙুল তুলে তুলে শাসিয়ে শাসিয়ে, আর তার নাকে দড়ি পরিয়ে ছপটি মেরে মেরে 'হ্যাট্ হ্যাট্' করতে করতে ছুটিয়ে নিজের ইচ্ছে পূরণ করা। কেমন? 'বন্ধু' শব্দটার মানেই জানো না!...জেনো ঘণ্টু আমার জন্যে প্রাণ দিতে পারবে, কিন্তু কখনো 'বিয়ে' করবার কথা ভাবতে বসবে না।...সাজে-সজ্জায় আধুনিক হলেই হয় না মা, মনটাকে আধুনিক করবার চেষ্টা করতে হয়।...যাক এসব কথা তোমায় বোঝাতে বসতে চাইলে আমার মাথার চুলগুলো বিলকুল সাদা হয়ে যাবে। আমি যাচ্ছি।

মার বলা কথাটাই মাকে ছুঁড়ে মেরে দিয়ে দিদি ঘরে চলে যায়। বইটইয়ের সঙ্গে একটা সাইডব্যাগে নিজের দু'চারটে জামা-কাপড় নিয়ে, আমার কাছে এসে বলে, দিন কুড়ি মতো থাকতে যাচ্ছি রে পলু, বাবাকে দেখিস! বাবাকে একা সাপের ছোবলের মুখে বাঘের খাঁচার মধ্যে রেখে যেতে হচ্ছে। দেখবি, বুঝলি? বলে আমার মাথায় একটা চাঁটি বসিয়ে বাবার কাছে চলে এসে বলে, বাবা তাহলে যাচ্ছি! দিন কুড়ি পরে আসছি।

নমস্কার-টমস্কার আসে না দিদির। বলে বাড়ির লোককে একেবারে আপনজনকে প্রণাম করাটা যেন নাটুকেপনা লাগে।

বাবা দিদির দিকে তাকিয়ে বললো, দিন কুড়ি?

হ্যাঁ। পরীক্ষাটা একেবারে মিটিয়েই—

বাবা বললো, হয়তো তার মধ্যেই চলে আসতে হতে পারে।

কেন?

না, এমনি বললাম!

কেন বললে বাবা?

কী জানি। এমনিই মনে হলো। বলে বাবা দিদির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলো। বললো, চল তোকে বাসের রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

আবার অতোখানিটা হাঁটবে বাবা? এক্ষুণিই তো আবার নিজের অফিসে যেতে হবে—

বাবা বললো, তা হোক।

বাবার চাকরি তো কলকাতা 'পুরপ্রতিষ্ঠানে।' বাবা এখন 'বিল্ডিং দপ্তরে' আছে। মা তাই বাবাকে বলে 'পারমিট বাবু!' ওনাদের দপ্তরের অফিসের দরজাই তো বেলা বারোটার আগে খোলে না। বাবার 'নটার' অফিসের বাবুদের মতো তাড়া থাকে না।

বাবা দিদিকে তুলে দিয়ে এসে ফিরতেই মা ফেটে পড়ে বললো, তোমার আস্কারাতেই মেয়ের এতো আসপদ্দা! আমায় একটা জিজ্ঞেস পর্যন্ত না করে কি

না ঘণ্টুদের বাড়িতে থাকতে যাবার ব্যবস্থা করে নেওয়া হলো। গুরু লঘু জ্ঞান থাকবে না?

বাবা খুব গম্ভীরভাবে বললো, তা ঠিক। জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো। তবে 'গুরু লঘু' কথাটার মানেই তো শেখেনি কখনো। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করে কোনো ডিসিশান নিতে হয়, এটা দেখা অভ্যাস তো নেই!

মা যেন একটু হকচকিয়ে গেল। তারপরই 'ওঃ। তাই।' বলে একটা মোচড় খেয়ে ঠিকরে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো!

তারপর?

তারপর আবার সেই ছেলেবেলার মতো, মা অর্ধেক রাত পর্যন্ত আগুনের বন্যা বওয়াতে লাগলো। বাবাকে যে কি বললো, আর কি না বললো!

এখন যদিও সেই ছেলেবেলার মতো একই ঘরে শুয়ে নেই, কিন্তু পাশের ঘর বলতে তো প্রায় একই ঘর। মাঝখানের একখানা পাতলা ফাঁপা কাঠের দরজা ভেদ করে সবই কানে আসতে থাকে। বালিশে কান চেপে শুয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করি, তবু কানে ঢুকে আসে, এতে তোমার কী ধর্মহানি হয়েছে? কাউকে ঠকিয়ে খেয়েছো? কারুর সর্বনাশ করে পথে বসিয়েছো? কারুর কোনো অনিষ্ট করেছো? তবে? তুমি যদি কারো কোনো সুবিধে সুযোগ করে দাও, আর সে তার বদলে নিজে থেকে তোমায় টাকার তোড়া এগিয়ে দেয়, সেটা নিলে তোমার পাপটা কোথায় বোঝাও আমায়।..একখানা গাড়ি, তাও নতুন নয়, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড, এটুকু আমি পেতে পাবি না? ছোট জামাইবাবু হেসে হেসে বলে, তোর বর যে ডিপার্টমেণ্টে আছে, তাতে মাসে একখানা করে গাড়ি কেনা যায়। চিরকাল যুধিষ্ঠির সেজে থেকে, হাঁড়ির হালেই থেকে এসেছে। এখনি একটু মগজ খুলেছে দেখছি—মগজ কী আর তোমার খুলেছে? আমারই খুলেছে, তাই এখন তবু একটু 'মানুষের দরে' এসে পেঁৗছনো গেছে। তবে এখানেই থেমে যেতে রাজী নই আমি। বুঝলে?

বাবার গলা একবারও শুনতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আজই দিদি নেই। দিদি থাকলে নিশ্চয় উঠে গিয়ে বলতো, 'মা এইবার ক্ষ্যামা দাও। জীবে দয়া হিসেবে একটু থামো। একেবারে ঘুমোতে পাচ্ছি না।'

আমার অতো সাহস নেই।

মার গলা আবারও চড়ছে, 'ক্রীতদাস'। আমি তোমায় ক্রীতদাস বানিয়ে ছাপটি মেরে মেরে চালিয়ে চলেছি। এতো বড়ো দুঃসাহস মেয়ের তাই মাকে এই কথা বলে। কৃতজ্ঞতার বালাই নেই। মা যদি ওই ছাপটি না ধরতো, তো সেই হাঁড়ির হালেই তো থেকে যেতিস!

এইবার বাবার গলার স্বর শুনতে পেলাম একটু, ও হয়তো সেটাকে দুঃখ মনে করে না। হয়তো সততাকেই জীবনের বড় সম্পদ বলে মনে করে।

ওঃ। তাই। তা ওর প্রাণের বন্ধুর বাড়ির গার্জেনরা? তেলকলুরা? তারা ব্যবসা করে না? তাতে খুব সততা বজায় থাকে?

বাবা খুব ক্লান্তভাবে বলে, কার কিসে কী থাকে জানি না। বিজনেস করলেই যে সততা হারাতে হবে, তার কোনো মানে নেই। 'লাভ' করা 'মুনাফা' লোটা, এটা বিজনেসের অঙ্গ, তার সঙ্গে ঘুষ খাওয়ার তুলনা চলে না। যাক ও তোমায় বোঝানো

যাবে না। তবে মনে হচ্ছে তুমি যে সিঁড়িটায় চেপে আরো উঁচুতলায় উঠে যেতে চাইছো, সেই সিঁড়িটায় বোধহয় ঘুন ধরে এসেছে। একদিন হুড়মুড়িয়ে পড়ে যেতে পারে।

বাবার কথাগুলো শুনতে পেলাম, তখন জল খেতে উঠে দরজার কাছে এসেছি বলে, আর বাবার স্বরটাও একটু উত্তেজিত মতো বলে। তারপরই বাবা বললো এবার আমায় একটু ঘুমতে দাও।

ব্যস হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেল। হয়তো মার প্রবল রাগেই।

আমিও ঘুমিয়ে বাঁচলাম।

কিন্তু তারপর?

তারপরের কথা বলবার অবস্থা আর নেই আমার।

তারপর বোধহয় আমি দিদিকে জড়িয়ে ধরে বলেছি তুই কেন চলে গেলি দিদি? তুই থাকলে কক্ষনো এমন হতো না।

ঘণ্টু বললো, পলু! স্থির হও। দেখছো পুতুলকে? কী রকম স্থির হয়ে আছে।

কিন্তু দিদি কেন একদিন পরে এলো? দিদি তো বলে গিয়েছিল কুড়িদিন পরে আসবে। তবু এলো। দিদি ওর খুব দরকারি একটা বই ফেলে গিয়েছিলো বলে, আজই আবার চলে এসেছিলো। তারপর এসে স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু ওকে কী 'স্থির' বলে? দিদি যেন পাথরের পুতুল হয়ে গেছে।

এসে শুধু একবারই বলে উঠেছিলো, ওঃ। এইজন্যেই তুমি বলেছিলে বাবা, 'আগেও আসতে হতে পারে।'

তারপর পাথর।

দিদি যে এমন পাথর হয়ে গেছে, সে কী বাবার ওপর অভিমানে? দিদির আর তিনদিন পরে পরীক্ষা সেটা বাবার মনে পড়লো না বলে?

কিন্তু মনে পড়েছিলো বাবার।

বাবা তাই তার সুইসাইড নোট-এর প্রথমেই একটা লাইন লিখেছে, পুতুল পারিস তো আমায় ক্ষমা করিস।

তারপর?

তারপর লিখেছে, আর পারা গেলো না। উঁচুতে উঠতে যে কতোটা নীচে নামতে হয়।...ক্লেদাক্ত গহ্বরে।

পরের লাইনটা, পৃথিবীর প্রতি আর কোনো মোহ নেই, তাই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাইছি।

কিন্তু কখন পেয়েছিল মা ওই নোটটা?

না না মা তো পায়নি। পেয়েছিলো তো দিদিই। না কী দুজনেই একসঙ্গে?

মনে পড়ছে না।

ঠিকঠাক কিছু মনে পড়ছে না।

ওঃ। হ্যাঁ, মা কখন যেন আমার কাছে এসে খুব উত্তেজিত হয়ে বলেছিলো, পলু! দেখছিস তোর বাবার অসভ্যতা। সেই গাড়ির দালালটা এসেছে, তাই ডাকছি, তো বাবু ঘুমের ভান করে পড়ে আছেন। এতো ডাকছি, সাড়া দিচ্ছে না। তুই দেখ না একবার।

আমি কী বলেছিলাম তখন।

হ্যাঁ বলেছিলাম, বাবা তো কাল সারারাত ঘুমোতে পায়নি। শেষ রাত্তিরে ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমোচ্ছে, ডিসটার্ব করছো কেন?

চমৎকার? ডিসটার্ব করছি কেন? লোকটাকে কতোক্ষণ বসিয়ে রাখবো?

বসিয়ে রাখবে কেন? ভাগাও।

ভাগাবো?

হ্যাঁ এখন মনে পড়ছে, মা রেগে বলেছিলো, ভাগাবো? তুইও যে তোর দিদির মতো কথা বলছিস। ভাগালে, যদি আর না আসে?

আমি বোধহয় তখন বলেছিলাম, দালাল তো। নিজের গরজেই আসবে।

আর ঠিক এই সময় দিদি এসে ঢুকেছিলো।

সঙ্গে ঘণ্টুও।

বলতে বলতে এসেছিলো, দরজাটা খোলা। কী ব্যাপার? তারপর বলেছিলো ওখানে কে একটা বুড়ো বসে রয়েছে?

তারপর বলেছিলো, পলু তো ঠিকই বলেছে। ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমোচ্ছে, ডিসটার্ব করা ঠিক নয়!

আর তারপরই ঘণ্টু আর দিদি বাবার ঘরে চেঁচিয়ে উঠেছিলো, মা, কতোগুলো ঘুমের বড়ি খেয়েছিলো বাবা?

আর তারপর, ওই সুইসাইড নোটটা পেয়েছিলো ওরা। বাবার মাথার কাছে একটা বইয়ের মধ্যে। আধখানা বার করা ছিলো। বাবা সময়টা লিখে রেখেছিলো, রাত্রি চারটে আটত্রিশ!

মা যখন রেগে আগুন হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের হল-এ সোফাকাম বেডটায় শুয়ে পড়েছিলো, তখন রাত কটা?

বাবা বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে দেখেও আমার ভাবনা হয়নি। আশ্চর্য। মনে হয়নি এটা একটা আশ্চর্যতম ঘটনা। আমার মায়া হয়েছিলো। আমার মনে হয়েছিলো আহা। বাবা একটু শান্তিতে ঘুমোক।

বাবা এখন খুব শান্তিতে ঘুমোচ্ছে।

আর কেউ কোনো মতেই বাবাকে ডিসটার্ব করে ঘুম ভাঙাতে পারবে না। দিদি, মনে মনে বলে চলেছিলাম দিদি! দিদি! ভাবতে পারছিস। বাবা তোর কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে, পরীক্ষার মুখে তোকে ডিসটার্ব করতে হলো বলে। বলে গেছে আর পারা গেল না। বলে গেছে উঁচুতে উঠতে হলে কতো নীচুতে নামতে হয়। কিন্তু সেটা সত্যি উঁচু নয় বলেই তো। অথচ এই পৃথিবী ওইটাকেই সত্যি উঁচু ভেবে অবিরত নীচে নেমে চলেছে।

জীবন পাওয়ার মানে

এ বাড়িতে যে আবার কোনোদিন এমন আলোর ঝরনা বইবে, সুরের ঝঙ্কার উঠবে, ওই ছোট্ট উঠোনটায় আকাশের চাঁদ নেমে আসবে, এমন কথা কী ক্ষণমুহূর্তের কোনো রঙিন কল্পনাতেও ভাবতে পেরেছিলেন সুরঞ্জন আর অনামিকা?

না, তেমন কল্পনা করবার আশ্বাসটুকুও আর অবশিষ্ট ছিল না ওঁদের মধ্যে! এঁরা মেনে নিয়েছিলেন, এঁদের অনেক স্বপ্ন আর আশা দিয়ে গড়া এই বাড়িখানা, একটা খাঁ খাঁ শূন্যতা নিয়ে—দিনে দিনে মলিন বিবর্ণ আর বয়েসের ধুলোয় ধূসরিত হতে হতে ক্রমশঃই জীর্ণ হতে থাকবে, যেমন হতে থাকবেন সুরঞ্জন আর অনামিকা!

সুরঞ্জনের আর অনামিকার দিকের আত্মীয়স্বজনরাও তাই ভেবে এসেছে এযাবত। হঠাৎ যে ছবিটা পালটে যাবে, আলোয় ঝলসে উঠবে তা ভাবেনি। যেন ইলেকট্রিক কানেকশান কেটে যাওয়া জীবনকক্ষে আবার হাজার বাতির আলো জ্বলে ওঠা! এই জ্বলে ওঠায় কেউ কেউ হয়তো একটু সুখী হয়েছেন, আবার কারুর কারুর মধ্যে অবচেতনের গভীরে, অন্য এক ধরনের জ্বলে ওঠার স্বাদ চিড়বিড়িয়ে উঠেছে। 'হলো হলো। তা বলে এতো?'

যারা এতোদিন এই মানুষ দুটোর দুর্ভাগ্যে—'আহা' জানিয়ে একটু সমবেদনার নিঃশ্বাস ফেলেছে, তারা এখন অন্য ধরনের নিঃশ্বাস ফেলে বলছে, 'কী লাক বাবা!'

পাড়া প্রতিবেশীও তো ধরে নিয়েছিলো, চির অন্ধকারে নিমজ্জিত ওই নিষ্প্রাণ নিরুদ্যম মানুষ দুটো ক্রমশঃই আরো স্তিমিত হতে থাকবে, এবং কোনো এক সময় দুজনের মধ্যে একজন গাছের ডাল থেকে শুকনো পাতার মতো খসে পড়ে, বাকি জনকে পড়শীর 'দায়' করে রেখে যাবে!

তাছাড়া আর কী? চোখের সামনে দেখতে হলেই 'দায়।'

তাই পড়শীমহলে মাঝে মাঝেই বলাবলি হয়, 'আগে আগে যেসব আত্মীয়-স্বজনকে আসতে দেখা যেতো, এখন তো আর তাদের কাউকেই দেখা যায় না। ছায়া মাড়াতেও আসে না কেউ।'

'ওদেরও তো কোথাও যেতে দেখি না। ওই চার দেওয়ালের আড়ালেই পড়ে আছে দুই বুড়োবুড়ি।'

'তবু ওরই মধ্যে বুড়ো বরং একটু শক্ত আছে। ঢ্যাঙা লম্বা শরীরটা নিয়ে খটখটিয়ে রাস্তা হাঁটে, বাজার দোকান করে আনে, ওই দু'মিটার স্কোয়ার বাগানটির তদারকি করে।'

'বাগানই বটে। প্রথম দিকে তো গোলাপ ফুটিয়েছে, ইয়া ডালিয়া বানিয়েছে। এখন মরা বাগানে লাউ কুমড়ো লাগায়, উচ্ছে করলা ফলায়।'

'তার মানে বাজারের সাশ্রয় করে।'

'বাজার তো ভারী। আমার কর্তা তো বলেন, সুরঞ্জনবাবুর বাজার করা দেখলে হাসি পায়। হলেও মাত্র দুটো লোক, তবু দু'বেলায় চারটে পাত তো?'

'গোলাপের জায়গায় উচ্ছে করলা! ক্রমশঃই তো নিজেরও সাজের বাহার ঘুচে

গেছে। প্রথম প্রথম তো—দেখেছি, কী টিপটপ! গিন্নীটিও ছিমছাম টাইট ফিট! এখন দেখোগে যেন ন্যাতাজোবড়া!'

'তখনো কর্তা কোথায় যেন কী কাজ করতো! ছেলে বাপের সংগে সংগে ঘুরে ঘুরে মিস্ত্রীর কাজ দেখেছে।'

'ছেলের তো তখনো বিয়ে হয়নি। সেই ছেলে নিয়ে কী গৌরব! যেন অমন কৃতী ছেলে আর কারুর হয় না! আর হঠাৎ বিদেশে মোটা মাইনের চাকরিও কারুর জোটে না। যেই চাকরি, সেই বিয়ে, সেই বৌ নিয়ে আকাশে উড়ে যাওয়া! ব্যস! সেই অবধিই হাওয়া। দ্যাখো এখন কী গুণের গুণবান ছেলে।'

'ক্রমশঃ তা মিইয়ে যেতে যেতে এখন যেন ফুটো বেলুন। আর এখন সেই কথায় কথায় ছেলের নাম তোলা নেই। লোকের সংগে কথাই কইতে চায় না! সর্বদা একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে ওই বাড়ির সামনের বারান্দাতেই একখানা ক্যাম্প-চেয়ারে পড়ে আছে।'

'গিন্নীটিও তো তাই। ওই বাড়ির মধ্যেই যা তা ভাবে সারাক্ষণ কাজ করে চলেছেন। হঠাৎ কেউ বেড়াতে গিয়ে পড়লে, কী অস্বস্তি! গায়ে এক এক সময় ব্লাউজও থাকে না! শুধু একখানা শাড়ি জড়িয়েই কাজ করে বেড়াচ্ছেন।' এখন তো আর কোনো কাজের লোকও দেখি না।'

তাইতো দেখি...জিজ্ঞেস করলে শুনবেন, 'কাজের মেয়েটা দেশে গিয়ে আর ফিরলো না। তেমন ভালো মতো আর পাচ্ছিও না। যতোসব কুড়ের মহারানী, নোংরার রাজা!'

অমনি সব্বাই খারাপ! আমরা যেন আর লোক চরাচ্ছি না। বেশি জিজ্ঞেস করাও যেন পছন্দ করেন না মহিলা! কথাতেই নারাজ!'

'তা লক্ষ্য করেছি। একা বাড়িতে দুটো বুড়োবুড়ি, একটু পাড়া বেড়াতেও তো পারিস বাবা! তা তো নয়ই কেউ বেড়াতে গেলেও যেন অস্বস্তি ভাব।'

'তার মানে অপরের চোখে দারিদ্র্য দশাটি তো ধরা পড়ে যাবে।'

'ছেলে কী কিছুই পাঠায় না?'

'ভগবান জানেন।'

'চলে কী করে?'

'তাই বা কে জানে।'

নিঃসংগ নির্বিরোধী দুটো মানুষের নিস্তরংগ জীবনযাত্রাটুকু নিয়েও নানা-ভাবে নানা সমালোচনা। কারণ হয়তো ওই যে, কারুর বাড়িতে আসে না, মিশতে চায় না, বিদেশবাসী ছেলে বৌয়ের আক্কেলহীনতা নিয়ে দার্শনিক আক্ষেপ করে না, অথবা এমন কথাও বলে না, "ছেলে তো আমার এমন ছিল না, মা-বাপ অন্তপ্রাণ ছিলো, বৌই এমনভাবে সর্বগ্রাস করে বসেছে!" এরকম লোক নিয়ে অসুবিধে বৈকি!

এরা যখন জিজ্ঞেস করেন, 'ছেলের চিঠিপত্র এসেছে?' তখন যেরকম আলগা ভাবে উত্তর দেয় বুড়ো, 'হ্যাঁ এইতো—কদিন আগে যেন এসেছিলো একটা। ভালোই আছে।' তাতেই বোঝা যায় চিঠিফিঠি আসেনি। সেই কতোদিন আগে যেন 'নাতনী হয়েছে'—ছেলে বৌ তার ছবি পাঠিয়েছে বলে আহ্লাদ করে দেখিয়েছিলো।

'তারপর তো একটা নাতিও হয়েছে শুনেছিলাম। মা বাপকে দেখতে আসতে ইচ্ছে করে না? শুধু মাঝে মাঝে একখানা রঙিন ফোটো পাঠিয়েই কর্তব্য সারা! ধন্যি বাবা! বুড়ো মা বাপ!'

লোকে এঁদের 'বুড়ো বুড়ি'ই বলে। অথচ এযুগে অতোটা বলার সংগত কোনো কারণ নেই। কতই বা বয়েস সুরঞ্জন আর অনামিকার? তবু 'বুড়ো বুড়ি' বলার সুবিধে আছে। তাতে সম্মানসূচক ভাষার দায় থাকে না! তাছাড়া—যে জীবনের মধ্যে ভবিষ্যতের আশা-প্রত্যাশার কোনো প্রতিফলন নেই, সে জীবনের চেহারা স্বভাবতঃই বার্ধক্যের।

শুধুই কী প্রতিবেশী?

এই বাড়ির সামনে দিয়ে নিত্য যাতায়াতকারীরাও হঠাৎ হঠাৎ বলে ওঠে, 'এই এক ভূতুড়ে বাড়ি বাবা! কোনো সময় দেখা যাবে না দোতলার জানালা খোলা! সর্বদা বন্ধ! মানুষ থাকে তার চিহ্নই নেই। ছাতে কাপড় শুকোতেও দেখা যায় না। অথচ দোতলাটা ভাড়াও দেবে না। অনেকে সময় কতো ধরাধরি করেছে, ভাড়া দেবার জন্যে, জেদি বুড়োর এক গোঁ, বসতবাড়িতে ভাড়াটে বসাব না!'

একটা ছোকরা বলে, 'একদিন বলেছিলাম, দাদু, সব সময় জানালা বন্ধ থাকলে বাড়ি খারাপ হয়ে যেতে পারে—' বুড়ো কী জবাব দিয়েছিলো জানো? 'মাথা খারাপ লোকের বাড়ি খারাপ হয়ে যাবে এ আর আশ্চর্য কী?'

তার মানে রীতিমতো ডাঁটুস! অথচ আজকের বাজারে সামান্য একটা সেণ্টিমেণ্টে ওভাবে একটা বাড়ি ফেলে রাখা, শুধু নীরেট বোকামিই নয়, অন্যায়ও! লোকে একটু মাথা গোঁজার জায়গার জন্যে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে—আর ওঁরা দুই বুড়ো-বুড়ি পেল্লায় একখানা দোতলা বাড়ি দখল করে বসে আছেন।

এমনভাবে বলে, যেন অন্যের বাড়ি জবরদখল করে বসে আছেন।

বাড়িটাকে পেল্লায় বলাটা এযুগে খুব একটা বাড়াবাড়ি নয়। এযুগে বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ির খোপে খোপে গুঁজে থাকা মানুষদের দেখে দেখে অভ্যস্ত চোখে, তিনখানা তিনখানা ছখানা ঘর, এবং আনুষঙ্গিক যা কিছু থাকবার, তা নিয়ে এই একক বাড়িটি একটি দম্পতির পক্ষে পেল্লায় বৈকি।

বছর বারো-তেরো আগে, পূর্বশহরতলীর একেবারে শেষপ্রান্তে বাড়িখানা যখন বানিয়েছিলেন সুরঞ্জন, তখন তাঁর কল্পনার জগতে এমন একটা সংসারের ছবি আঁকা ছিলো কী? তাছাড়াও—জমিটুকুতো কেনা ছিলো আরো অনেক আগে, প্রায় জলের দরে। জলাভূমির কানঘেঁষাই তো ছিলো তখন আজকের এই 'দিগন্তদ্বার' আবাসন কলোনি! এখন তো তার প্রায় শেষ প্রান্ত এগোতে এগোতে নতুন দিগন্তের দরজা খুলতে খুলতে চলেছে। ক্রমশঃই আকাশছোঁয়া জমির দামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটরা। এখন আর বাড়ি শব্দটাই তো তেমন ব্যবহারই হয় না! থাকবার জায়গা, সংসার পেতে বসবার একটু ভূমি মানেই 'ফ্ল্যাট'।

সুরঞ্জনের আগের আমলে এখানে আরো কিছু কিছু যারা সস্তায় কিনে রাখা জমিতে এক একটি 'বাড়ি' বানিয়ে বসবাস করছেন, তাঁরাই সুরঞ্জন অনামিকার নিকটতম প্রতিবেশী! কারো-কারোর বাড়ি তো একতলা। তবে কেউ কেউ শখ করে সামনে যে বাগানটুকু রেখেছিলেন, 'দাঁও' পেয়ে সেটুকু বেচে দিয়ে রাস্তার সামনে

থেকে পিছনে পড়ে গিয়ে আড়ালে পড়ে গেছেন। সুরঞ্জনের বাড়ি রাস্তার ওপরেই। জমিটার দু'মিটার স্কোয়ার যে বাগানটুকু সেটা বাড়ির পাশে দক্ষিণ ধারে। এই প্ল্যানটি ছিলো সদ্য ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে আসা শুভরঞ্জনের। সে বলেছিলো, দেখো বাবা, আজকের এই খোলামেলা ভাবটা থাকবে না, ক্রমেই ঘিঞ্জি হয়ে উঠবে। তবু যেটুকু সাউথ বাঁচানো যায়।'

বলতে গেলে শুভরঞ্জনের উৎসাহে আর মদতেই তো বাড়িটায় বেশকিছু আধুনিকতার আয়োজন। হারাধন মিত্র লেন থেকে চলে আসা সুরঞ্জন সেন কী রান্নাঘরকে 'কিচেন' বানাবার কথা চিন্তা করতেন? অথবা ভাঁড়ার ঘরকে 'স্টোররুম?' টিউবওয়েলের সঙ্গেই ইলেকট্রিক পাম্প বসানোর কথা পাড়ায় অন্যরা তেমন কেউই করেনি। পরে অবশ্য হয়েছে আস্তে আস্তে সকলেরই। তবে সুরঞ্জনের বাড়িটা যে একটু 'বিশেষ' তার মূল হচ্ছে শুভরঞ্জনের শখ। সে তখন সবে একটা ভালো মাইনের চাকরী পেয়েছে পলতায়। তার জীবনের নিয়ন্ত্রক গ্রহ নক্ষত্র তাকে যে এখান থেকে হিঁচড়ে টেনে সুদূরে নিক্ষেপ করবে, তা কী জানা ছিলো তার?

পাড়ার লোকেরা নতুন কারো সঙ্গে আলাপ হলেই এই জানালা বন্ধ বাড়িটার প্রসঙ্গ তুলে বলাবলি করে, 'ছেলে থাকে কোথায়? মর্তভূমিতে স্বর্গ আমেরিকায়?'

'আরে না না। শুনিতো মিডল ইস্টে কোথায়। সদ্য বিয়ের পর বৌ নিয়ে প্রথম যখন গেলো, শুনেছিলাম, লিবিয়ায় যাচ্ছে, তারপর ক্রমশঃই অন্যত্র। তা সে কী আজকের কথা? বছর দশেক তো বটেই।'

তাই বলে ওরা। বছর দশেক।

তবে অনামিকার হিসেবে এখন আরো বেশি। সেই বেশির হিসেবটা হচ্ছে দশ-বছর সাড়ে আটমাস!

এ হিসেবটা অনামিকার কাছে যতোটা, সুরঞ্জনের কাছে ততোটা নয়। সুরঞ্জনের কাছে ক্যালেন্ডার কেবল বছরে একবারই কথা কয়ে ওঠে। তারপর যেন বোবা হয়ে যায়।

তবু দশ বছরে দশ দশা!

এখন সুরঞ্জন আর অনামিকার যে 'দশা' চলছে তার চেহারাটা 'ধরতে' হলে, পুরো একটা দিন রাত্রি তাঁদের জীবনযাত্রার অভ্যস্ত ছন্দের অনুসরণ করে চলতে পারলে ধরা যায়!

* * *

যদিও কোনো তাড়া নেই, তবু সুরঞ্জন কাকভোরেই উঠে পড়লেন। গত সন্ধ্যায় দোতলা থেকে একতলা বাড়িটার আষ্টেপৃষ্ঠে যে তালাচাবিগুলো লাগিয়েছিলেন, একে একে সেগুলো সব খুলে খুলে যথাস্থানে রাখলেন, তারপর সিঁড়ির তলায় গাঁথা পাম্পের ঘরটার দরজাটা খুলে পাম্পটা চালিয়ে দিলেন। পাম্প চালাতে ওই দরজাটা যে খুলতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, তবু নিয়মনিষ্ঠ সুরঞ্জন, ওটাই ন্যায্য নিয়ম বলে সেটি পালন করে চলেন।

পাম্পটা চালিয়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন না, কারণ বেশিক্ষণ চালিয়ে বসলে রিজার্ভারটা ভর্তি হয়ে উঠলে মুস্কিল আছে। বাড়ির মাপে রিজার্ভারটা, এখনকার প্রয়োজনের অনুপাতে তো নয়। অনেকটা বড়।

তাই পাম্পটা চালিয়ে দিয়েই মুখ ধোয়া পর্বটি সেরে নিলেন বাথরুমের বাইরের দেওয়ালে লাগানো বেসিনটায়। এসময় অনামিকার স্নানের জন্য বাথরুমটা দখলিকৃত!

মুখে ধুয়েই পাম্পটা বন্ধ করে একখানা গামছা ভিজিয়ে নিয়ে চলে এলেন ভিতর দালানে।

না এখন আর আগের মত এই ভোরবেলাই চায়ের সরঞ্জাম নামে না! অনামিকা আজকাল আর স্নান না সেরে রান্নাঘরে ঢোকেন না। ব্যস্ততাহীন জীবনে ক্রমশঃই যেন একটা শুচিবাই ধরে যাচ্ছে অনামিকার। কাজের মেয়ে ছাড়িয়ে দেওয়ার এটাও বোধকরি একটা কারণ! তাছাড়া আবার ওই ছাড়িয়ে দেওয়া বাবদ সকালে 'বাসিপাট' নামক কিছু একটা ব্যাপার অছে।

এর ওপর আবার একটু পুজোপাঠও ধরে বসেছেন অনামিকা! আগে বরাবর শুধু দৈনিক 'লক্ষ্মীর ঘটে জল' দেওয়াই ছিলো 'পুজো', এখন ঘটের সঙ্গে কিছু পটও জুটিয়ে পুজোর সময়টার খানিকটা—সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন।

অতএব আইন নিজের হাতেই নিতে হয়েছে সুরঞ্জনকে। সকালের ১টা ধানাবার দায়িত্ব ভার নিজেই গ্রহণ করে ফেলেছেন আস্তে আস্তে। কাজেই বাধ্যতা-মূলক ভাবে সুরঞ্জনকেও সকালে 'কাচা' লুঙ্গি গেঞ্জি পরতে হয়। এবং সেটি বাসি কাপড়ের স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে। ওই ভিজিয়ে আনা গামছাটা তারই পরিপ্রেক্ষিতে।

সুরঞ্জনের পূর্ব দশায় এমন কথা সুরঞ্জন ভাবতেও পারতেন না, কিন্তু এখন যে অনেকগুলো দশা পার করে এনে দশের দশা চলছে।

নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা কাচা গেঞ্জি লুঙ্গি পরে সুরঞ্জন চলে আসেন 'কিচেনে'। যে কথাটা অনামিকা এখনো রপ্ত করতে পেরে উঠলেন না 'রান্নাঘর'ই বলেন। রপ্ত করার চেষ্টাই বা করলেন কখন?

সেই রান্নাঘরে গাঁথানো বেদির ওপর জোড়া গ্যাস স্টোভ বসানো, নীচে সিলিন্ডারও রয়েছে দৃশ্য শোভা হয়ে, তবে বেশ কিছুদিন থেকেই শূন্যগর্ভ হয়ে। হয়তো গ্যাসের দোকানে খবর দিতে যাবার আলস্যে, হয়তো বা নেহাৎ মানসিক আলস্যে। দরকারই বা কী? দু'কাপ চায়ের মতো জলটা ফুটিয়ে নেওয়া বৈ তো নয়। জনতা স্টোভটা একবার একটু জ্বাললেই তো কাজ মিটে যায়।

সুরঞ্জন রান্নাঘরে এসে মাটিতে উবু হয়ে বসে, সেই কাজটুকু মিটিয়ে নেন। কাপ মেপে জল দিয়ে কেটলিটা চাপিয়ে দিয়ে চলে আসেন ডাইনিং রুম বা অনামিকার ভাষায় 'খাবার ঘরে'। যেখানে বড় টেবিল পাতা, পালিশ চটে যাবার ভয়ে একখানা প্লাস্টিক সিট পাতা। দেওয়াল আলমারি থেকে চায়ের সরঞ্জামগুলো নামান, টেবিলের একধারে রাখেন। সবটা নোংরা করে দরকার কী?

বোতলে কৌটোয় দু'তিন রকম বিস্কুট, নামান সব কটাই। চায়ের সঙ্গে টোস্ট খাওয়ার অভ্যাসটা নানান ঝঞ্ঝাটের কারণেই উঠে গেছে ইদানীং। নিত্য সন্ধ্যায় পাউরুটি এনে রাখো, মাখন মজুত রাখো, কে অতো করে? সর্বদিন তো সব পাওয়াও অনিশ্চিতের কোঠায়। তাছাড়া কেরোসিন স্টোভে টোস্ট ভালো হয় না। শুভরঞ্জন শখ করে মাকে যে ইলেকট্রিক টোস্টারটা কিনে দিয়েছিলো, সেটা তো কবে থেকেই খারাপ হয়ে পড়ে আছে। বিস্কুটের কোনো জ্বালা নেই বাবা। এনে রেখে দাও দশদিন ধরে খাও। মুখরুচি হিসেবে নোন্তা বিস্কুটটা থাকে। তাছাড়া

হয়তো কখনো বোতলে ভরা থাকে কিছুটা ডালমুট কী চানাচুর। তাও—খেলে অনামিকার অম্বল হয়, সুরঞ্জনের দাঁত অসহযোগিতা করে। তবু শিশিটা নামালেন সুরঞ্জন, চায়ের জল ফুটে গেছে সাড়া পেয়েছেন, কেটলি নামিয়ে নিয়ে জনতা স্টোভকে নিভিয়ে দিয়ে চলে আসেন। চা ভিজিয়ে আধ কাপ গরম জলে আন্দাজ মতো 'আমুল' গুলে নেন। নিত্য টাটকা দুধের জোগান রাখা সোজা না কী? তাও বলতে গেলে অকারণই। ওই আমুল দিয়েই সুরঞ্জনের রাতের রুটির সঙ্গে খাবার জন্যে একটু ছানাও কাটিয়ে রাখেন অনামিকা।

চা-দানীতে জল ঢালতে ঢালতে সুরঞ্জন একবার একটু গলা ঝাড়া দেন। কারণ দেখা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে অনামিকা স্নান সেরে জল শপশপে ভিজে কাপড় পরে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছেন। সেখানেই আলনায় তাঁর শাড়িটা রাখা থাকে। জড়িয়ে নিয়ে পুজোয় বসেছেন বোঝা হয়ে গেছে।

গলা ঝাড়ায় কাজ হয় না।

কিঞ্চিৎ পরে অনুচ্চ স্বরে উচ্চারণ করেন সুরঞ্জন, দেরী আছে না কী?

ঈষৎ বেজার গলায় উত্তর আসে, "দেরীর 'জো' আছে না কী? আসছি—" অতঃপর তসর ছেড়ে সাদা সুতি শাড়ি জড়িয়ে রঙ্গ-মঞ্চে দেখা দেন অনামিকা।

বলেন, একটু তর সয় না! সেই নিজে রোজ চা-টি করা চাই? এতো ধড়ফড় করে মরি তবু—

সুরঞ্জন একটু হেসে বলেন, ধড়ফড় করে মরার দরকারটা কী? আমার তৈরি চা কী অখাদ্য হয়?

সেই কথাই বলছি বুঝি? আমিই এসে চা করতাম! রোজ রোজ তুমি পুরুষ মানুষ—

চা তৈরি এমন কিছু মেয়েলি কাজ নয়। গলাটা ভিজোও তো!

অনামিকাও একটু হাসেন। হয়তো পূর্বকালের স্মৃতিবাহী একটু কটাক্ষ হেনে বলেন, তোমায় বলেছি বুঝি গলা শুকিয়ে মরে যাচ্ছিলাম?

আহা বলতে হবে কেন? বোধবুদ্ধি কী একেবারেই নেই?

বলে দুটো প্লেটে দুচারখানা করে বিস্কুট রাখেন। তারপর বলেন, কী? চা খারাপ হয়েছে?

এটি প্রায় নিত্য প্রশ্ন। অথচ বাহুল্য প্রশ্নই।

অনামিকা আর একটু ভ্রূভঙ্গী করে বলেন, রোজ সুখ্যাতিটি শোনা চাই, কেমন?

তাতেই একটু এনার্জি আসে।

তোমার চায়ের তাড়ায় আমার ভালো করে পুজোই হয় না। রোজ বলি—তুমি আগে খেয়ে নিও।

বললেই শুনতে হবে?

বলে চা-দানীর অবশিষ্ট চা-টা ঢেলে অনামিকার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, আজ বোধহয় বিস্কুট আনতে হবে। কোন্‌টা আনবো?

ও আবার আমি কী বলবো? এই নোন্‌তাগুলো তো ভালোই। এক্ষুণি বাজারে বেরোচ্ছো?

এই বেরোই আর কী! বেরোতে বেরোতেই রোদ চড়ে উঠবে! কী রাঁধবে আজ?

যা আনবে!

তবু মহারানীর ইচ্ছেটা একটু জেনে নেওয়া ভালো।

কী আর বলবো? যেটি ভালোবাসি, সেটিই তো সয় না। আজ না হয় এনো একটু পুঁই ডাঁটা। আর অল্প কুচো চিংড়ি।

পুঁই আর আনতে হবে কেন? বাড়িতেই তো গজিয়েছে—

না না, ও ডাঁটা আর একটু বাড়ুক। অতো কচির স্বাদ হয় না! বেশি দেরী কোরো না!

দেরী আর কী জন্যে? তবে বাজারে দেখা হলেই শচীনবাবু কী সুধাময়বাবু দাঁড় করিয়ে দুটো কথা না কইয়ে ছাড়বেন না তো!

লুঙ্গি গেঞ্জি ছেড়ে একটা পায়জামা পাঞ্জাবী পরে, বাজারের থলিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সুরঞ্জন। রাস্তায় বেরোতে—এটি করেন সুরঞ্জন। যদিও ওই শচীনবাবু সুধাময়বাবু লুঙ্গি শার্টেই রপ্ত।

সুরঞ্জন বেরিয়ে যেতেই অনামিকা তৎপর হয়ে কাজে হাত লাগান। ভিজে কাপড় জামা আবার ভালো করে নিংড়ে মেলে দেওয়া, চায়ের বাসনপত্র ধুয়ে ফেলা, এবং পুজোর জায়গাটুকুরও আশপাশ মুছে ফেলা, এসব কাজের শেষে একটা ছোট বালতির উনুনে আঁচ দিয়ে খোলা উঠোনটুকুর ওপর এনে বসিয়ে দেন। ধোঁয়াটা মরলে ঘরে তুলবেন।

উনুনে আঁচ দিয়ে, আলাদা দু'ভাগে একটু একটু আটা ময়দা মেখে নেন, উনুন ধরতেই ময়দাটা দিয়ে হয়তো চারটি কু'চো নিমকি, নয়তো দুখানা পরোটা করে ফেলেন। আর একবার চায়ের জল চাপান।

এ সময় সুরঞ্জন বাজার থেকে এসে পড়েন।

দিন দিন বাজারে যে কী পরিমাণ গলাকাটা দাম করছে, সে আক্ষেপ জানিয়ে তাকিয়ে দেখে হেসে বলেন, বাঃ। সব রেডি?

সব তো কতো?

বলে একটু অগ্রাহ্যের ভঙ্গী করেন অনামিকা। তারপর রান্নাঘরেই অবস্থিত বেতের মোড়াটা কর্তার দিকে ঠেলে দিয়ে তার সামনে একটা রেকাবিতে জলখাবারটা গুছিয়ে দেন।

সুরঞ্জন সেদিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, দুটো ডিশ একসঙ্গে সাজালে কী এতো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

নিচ্ছিই তো—না সাজালে চলবে না? ডালটা বসিয়ে দিয়ে নিচ্ছি।

এই একটি অভ্যাস সুরঞ্জনের, ডাল না হলে খেতে পারেন না। দুটো মানুষের সংসার, একটু ঝোল কী ঝাল করলেই হয়ে যায়, কিন্তু তেমন ঘটনা ঘটলেই খেতে বসে সুরঞ্জনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় 'ডাল নেই?' অথবা 'ডাল হয়নি?'

কাজেই এই ছোট্ট সংসারটুকুতেও নিত্য ডাল চড়াতে হয় অনামিকাকে। তবে তিনি চালাক মেয়ে, ওই একঘেয়ে খাটুনিটি থেকে একটু বাড়তি ফায়দা তোলেন! ওই ডালের অর্ধাংশটিকে আলু আর এটা ওটা সব্জির টুকরো মিশিয়ে ফুটিয়ে ঘন করে নিয়ে রাতের রুটির তরকারি বানিয়ে ফেলেন। কাজেই তার সঙ্গে দুখানা বেগুন ভাজা কী আলু পটল ভাজা হলেই ওবেলার রান্নার কাজ মিটে যায়।

পাতা মুড়িবেন না।

ডাল চড়িয়ে নিজের খাবারটা নিয়ে একটু সরে বসে, চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নেন অনামিকা। বলেন, বাজারে কারো সঙ্গে দেখা হলো?

সুরঞ্জন জানেন, এটা অন্য একটি প্রসঙ্গ উত্থাপনের প্রস্তুতি। 'কারো'টা হচ্ছে অন্তর্নিহিত প্রত্যাশার মূর্তি 'ডাকপিয়ন!'

সুরঞ্জন বলেন, সুধাময়বাবুর সঙ্গে। দাঁড়ালেন না, আজ খুব ব্যস্ত!

এবার অনামিকা আসল প্রসঙ্গে আসেন, ডাকঘরে একবার খোঁজ নিয়ে এলে নাকি?

রোজ রোজ আর কী খোঁজ নেবো? খারাপ লাগে। সেদিন তো সেই ছোকরা পিয়নটা দাঁত বার করে বলে উঠলো কী না 'আপনার নামে চিঠি এলে, আপনার ঘরেই পৌঁছে দিয়ে আসা হবে স্যার। কেউ নিজের ঘরে তুলবে না!'

অনামিকা একটু কোনঠাসা গলায় বলেন, 'নিজের ঘরে না তুলুক, ওই ডাকঘরেই দু'পাঁচদিন ফেলে রাখাও নজির আছে।'

সুরঞ্জন বলেন, ডাকের গোলমাল এখন সর্বত্র!

ওই বলে বলে তুমি তো মনকে দিব্যি প্রবোধ দিয়ে রাখো। আমি তোমার মতন —বলেই মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চা-টা গলায় ঢেলে নেন।

সুরঞ্জন অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখেন। এবং একটা বক্তব্য পেয়ে বেঁচে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, এই এই, ইস! তোমার ডাল উথলে উঠে উনুনে পড়ছে।

অনামিকা বাঁহাতে হাত বাড়িয়ে ডালের ফেনার ওপর এক চামচ তেল ঢেলে দিয়ে খাবারের পাত্রটা কাছে টেনে নিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, শেষ চিঠিটা কতোদিন আগে এসেছিলো—মনে আছে সে কথা?

ওইতো—অনেকদিন হয়ে গেলো তো!

দু'মাসের ওপর। তাও তো সেই দু'লাইনের চিঠি। এখানে টেলিফোন না থাকায় খুব অসুবিধে সেটাই ছিলো বক্তব্য! কেন আমরা টেলিফোন নিচ্ছি না এই প্রশ্ন। টেলিফোন! ভারী সোজা।

বিদেশে গিয়ে এখানের অবস্থা ভুলেই গেছে। মনে করে টেলিফোন থাকলে, সহজে খবর নিতে পারতো! খরচের কথা তো গণ্য করে না ওরা!

তা কেন? কষ্ট করে আর ছ'মাসেও একটা চিঠি লিখতে হবে না, সে দায়টুকু থেকে রেহাই পেতেই—

খাওয়া কাপ প্লেট রেকাবি ইত্যাদিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যান অনামিকা, কাঁধের কাপড়ে নাক ঘষতে ঘষতে!

সুরঞ্জন খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে বাড়ির সামনের সেই গ্রীলঘেরা এলশেপ বারান্দাটায় এসে বসেন। একটা ক্যাম্পচেয়ার পাতাই থাকে, সেটিই তাঁর পীঠস্থান।

অনামিকা আবার কাজে মন দেন, হাত লাগান।

যা রান্না করবার কুটে নিয়ে রান্নাটা সেরে ফেলেন, উনুনে ভাত চড়াবার আগে রাতে খাবার রুটি কখানাও করে ফেলেন. তারপর ভাত চড়িয়ে এসে বাইরের দিকে উঁকি মারেন। কী গো ঘুমিয়ে পড়লে না কী? চানটান করতে হবে না?

সুরঞ্জন চমকে ওঠেন, তা সত্যি, কাগজটা পড়ে শেষ করার পর একটু ঘুমই এসে গেছে! মাছির উৎপাতে কাগজখানাই মুখে ঢাকা দিয়েছেন।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে হেসে বলেন, ঘুমোবো কী আবার? এই যাচ্ছিলাম।

ভিতরে ঢুকে আসেন, দরজাটা বন্ধ করে দেন।

ঘরেরই দরজা, এটাই বসবার ঘর! পাশে বড় গেট আছে—তার সামনাসামনি একটা গ্যারেজও আছে, বুকে শাটার চাপিয়ে চির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে। বাড়ির প্ল্যানমাফিক দোয়াত আছে কালি নেই।

এই গ্যারেজটা ভাড়া নেবার জন্যেই কী কম ঝুলোঝুলি করেছে লোকে। সুরঞ্জনকে টলাতে পারেনি।

অনামিকা বরং বলেছেন, অতোগুলো টাকা দিতে চাইছে, দিয়েই দাও না। তোমার ওই গ্যারেজে কী আর নিজের গাড়ি ঢোকবার আশা আছে।

সুরঞ্জন বলেন, সেজন্যে নয়। ওই ভাড়া দেওয়াদিয়ি করতে হলেই নানান উটকো ঝামেলা এসে পড়ে। তাছাড়া—একবার ভাড়া দেওয়া মানেই তো জন্মের শোধ বিকিয়ে দেওয়া!

স্নান করে এসে খেতে বসেন সুরঞ্জন।

কাজের মেয়েটাকে ছেড়ে দেওয়া অবধি আর টেবিলে খেতে বসেন না সুরঞ্জন, সেই সাবেকি হারাধন মিত্তির লেনের বাড়ির স্টাইলে মাটিতে আসন পেতে খেতে বসেন অনামিকার কাজ কমাতে। শুচিবাই হয়ে ওঠা অনামিকার 'ভাতের সকড়ি, টেবিল সাফ-এর পর্বটি বৃহৎ!'

কাজের মেয়েটা না থাকায় অসুবিধে, আবার সুবিধেও। কোনো ডিস্টার্ব নেই। দরজা খোলো, দরজা বন্ধ করো, যখন তখন কামাই, তার থেকে এ একেবারে মূলে হাভাত, নিশ্চিন্দি।

তবু এ অভিমত অনামিকারই। বলেন সুখের থেকে স্বস্তি ভালো!

সুরঞ্জন যতোক্ষণ খান, অনামিকা রান্নাঘর সাফ করে ফেলেন। রান্না করতে করতে ঘরের সিংকেই অর্ধেক বাসন ধোয়ামাজা সেরে রাখেন।

নিজের ভাতটা যেমন তেমন করে নিয়ে এসে বসে পড়ে বলেন, কাল বাজার করতে গিয়ে কয়লা দিয়ে যাবার কথা বোলো।

সুরঞ্জন বলেন, তোমার কয়লায় কাঠে যা দাম পড়ছে, গ্যাস সিলিণ্ডারের বাবা!

তা হোক, এ তবু জানছি 'নেই।' আর হঠাৎ হঠাৎ দশদিন উধাও থাকবে, সে বেশি বিরক্তিকর! ঘুঁটে কয়লার হাত থেকে কী বরাবরের জন্যে রেহাই আছে?

এ কথার আর উত্তর কোথায়?

খেয়ে উঠে এককুচি সুপুরি মুখে দিয়ে সুরঞ্জন একটু দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, এখন সারা দুপুর খাটবে তো?

সারা দুপুর আবার কী খাটবো? তুমি শোওগে যাও তো! নীচেই বা পড়ে থাকো কেন? ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই তো পারো!

মন চায় না! তুমি একা নীচে পড়ে থাকবে!

আহা! বুড়ো বয়েসে এখনো কবিত্ব।

এভাবে একটাও লোক না রেখে এতো খাটা কী ঠিক হচ্ছে অনু?

খুব ঠিক হচ্ছে। কাজেই মন ভালো থাকে! সারাদিন সারাক্ষণ ঘাড়ের কাছে একটা ফাল্‌তু লোক, ভাল লাগে না। কোনো প্রাইভেসি থাকে না।

আহা অন্ততঃ বাসনমাজা ঘরবাড়ি মোছার জন্যে ঠিকে লোকটাকেও তো—

তাতেই বা কী বিশ্রাম? যেই একটু শোবো, ঘুমটি আসবে, অমনি বেল বেজে উঠবে। তারপর যতোক্ষণ থাকবে, নিশ্চিন্দি হয়ে শুয়ে পড়া যাবে? বিদেয় হতে হতেই তো দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

পাড়ার লোক ভাবে, কিপটেমি করে তোমায় কষ্ট দিচ্ছি।

ভাবলে তো বয়েই গেলো।

আক্ষেপ অস্বস্তি যাই থাকুক, ঘুমিয়ে পড়তেও দেরী হয় না সুরঞ্জনের। আর অনামিকা তখন কোমর বেঁধে কাজে লেগে পড়েন—ঝাঁটা বালতি ন্যাতা নিয়ে। ছাতের সিঁড়ি থেকে নীচের সিঁড়িতলা পর্যন্ত তকতকে ঝকঝকে করে তোলেন। দোতলার যেখানে মানুষের পা পড়ে না, সেসব জায়গাতেও নিত্য পরিমার্জনা।

পুরো দোতলাটাই তো ছেলে বৌয়ের জন্যে তৈরি করানো হয়েছিলো। এবং ছেলের বিয়ের সময় যৌতুকে পাওয়া খাট বিছানা আয়না আলমারি আলনা টেবিল সোফা চেয়ার দিয়ে সাজিয়েও ফেলেছিলেন, সেই সাজানো ঘরে কদিনই বা থাকলো ছেলে বৌ?

তবু নিত্য বৃথা খাটুনি খেটে চলেন অনামিকা!

যতো করে ততই যেন শুচিবাইটা বেড়ে চলে। মোছা জায়গা আবার মোছেন। সব কাজ সারতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। কাজেই বিশ্রাম করতে আসাটা একেবারে বৈকালিক গা ধোওয়া এবং সাজসজ্জায় ঈষৎ পরিপাট্য সাধন সেরে।

ততক্ষণে সুরঞ্জনের ওঠার সময় হয়ে যায়।

তবু সেই সোফার শয্যাতেই একপাশে একটু শুয়ে পড়েন অনামিকা! সুরঞ্জন গায়ে একটু হাত রেখে ঈষৎ আক্ষেপের স্বরে বলেন, যুদ্ধ শেষ হলো?

যুদ্ধ কী শেষ হবার? এটা মাঝখানের বিরতি।

বলে চোখটা একটু বোজেন অনামিকা!

সুরঞ্জন উঠে পড়েন।

গাছপালাগুলো দেখেন, বাড়িটার কোথায় কী মালিন্য ধরছে দেখেন এদিক ওদিক তাকিয়ে। আর একবার পাম্পটা একটু চালিয়ে দেন, নিজেও কিঞ্চিৎ ফ্রেশ হয়ে নেন।

* * *

বাইরের সেই ইজিচেয়ারে এসে বসেন।

দোতলাটা ছেলে বৌয়ের, নীচের তলাটা নিজেদের এইভাবেই সাজানো হয়েছিল বাড়ি। তবে নীচের তলাব আসবাবপত্র সবই পুরনো বাড়ি থেকে আনা। জৌলুসের অভাব। বসবার ঘরের সোফা সেটটাই যা নতুন। শুভরঞ্জনের জবরদস্তিতে কেনা! ক্যাম্বিসের এই ইজিচেয়ারখানাকেও আনতে চায়নি শুভরঞ্জন। সুরঞ্জন বলেছিলেন, নারে, ওটা আমার বাবা শখ করে কিনেছিলেন।

হারাধন মিত্তির লেনের সেই সার্বোক বাড়ির কর্তার শখের দৌড় ওইটুকু পর্যন্তই ছিলো! তবু সেই বাড়িরই নিজের অংশটুকু খুড়তুতো ভাইকে বেচে দিয়ে যা পেয়েছিলেন, সুরঞ্জন, তাতেই এই নতুন বাড়ির ভিত গাঁথার খরচাটা উঠে গিয়েছিলো।

নতুন পাড়ায় নতুন বাড়িতে আসার পর ছেলের বিয়ে। অনামিকার জীবনে সে যেন এক দেওয়ালির রোশনাই। কিন্তু বড় ক্ষণিকের।

খানিক পরেই উঠে পড়েন অনামিকা।

জনতা স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চাপান। সেটা জ্বলন্ত থাকতেই, আমূল পাউডার দিয়ে ছানাটা তৈরি করে নেন। বাস্ তারপরই কাজের চাকা স্তব্ধ।

চা খাওয়ার পর এটা ওটা সেরেই অতএব পুজো করতে বসে যান অনামিকা! ইদানীং আবার ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি ধরেছেন। স্তোত্রপাঠ, লক্ষ্মীর পাঁচালি ইত্যাদি দিয়ে দিয়ে গোধূলি বেলাটাকে সন্ধ্যার গভীরে ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা। তবে বেশিরভাগ দিন লোডশেডিঙে উৎখাত করে। প্রদীপের আলোয় ঠাকুর শয়ন দিয়ে, চলে আসেন বাইরে যেখানে সুরঞ্জন ইজিচেয়ারে পড়ে আছেন।

সুরঞ্জন বলেন, বসবে কী! যা মশা! তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না!

অনামিকা একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'আমাদের এই জীবনের কোনো মানে আছে?'

সুরঞ্জন একটু হাসেন, অন্ধকারেও বোঝা যায়। বলেন, সুধাময়বাবুরা তো 'মানে' খুঁজে দেবাব জন্যে ওঁদের 'তাস ক্লাবের মেম্বার হতে বলেন!'

তাহলে তো আমার আরো চমৎকার! তা বেশ হওগে মেম্বার। তুমি তো তবু মানে খুঁজে পাবে। বলে ঝেঁজে ওঠেন অনামিকা!

সুরঞ্জন এখনো হাসেন, আরে মশাই, তাসের রংই চিনি না তা মেম্বার। 'সাহেব বিবি গোলাম' নাম কটা শুধু জানা!

খানিকক্ষণ স্তব্ধতা।

মাঝে মাঝে মশায় থাবড়া দেবার চটাচট শব্দ।

একসময় উঠে পড়েন সুরঞ্জন, বলেন, নাঃ বসতে দেবে না! চলো ভেতবে চলে যাই।

অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই অন্ধকারেই টর্চ জ্বেলে জ্বেলে যতোগুলো পারেন তালাচাবি লাগিয়ে নেন। তারপর বলেন, তুমিতো এখন খাবার নিয়ে ওপরে উঠবে, টর্চটা ধরি?

ধরো। এই এক জ্বালা হয়েছে। ঠিক এই সময়ই আলোটি ঘুচে যাবে।

রোজই যে তাই হয় তা নয়। তবে যখনই লোডশেডিং হয়, অনামিকা উষ্মা প্রকাশ করেন, 'ঠিক এই সময়টিই আলো ঘুচলো।'

দোতলাতেই দামী জিনিস-টিনিস, তাই, রাতে খালি ফেলে রাখতে সাহস হয় না। তাই রাতে শুতে আসেন দোতলায়।

ছেলে বৌয়ের নামে তুলে রাখা সাজানো বেডরুম বা ড্রইংরুমে নয়, তৃতীয় ঘরখানা, যেটাকে অনামিকা বলেন, 'জিনিসের ঘর,' সেটাই ব্যবহার করেন। না খাটটা উড়িয়ে আনেননি, অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবেই একখানা চৌকীতেই বিছানার ব্যবস্থা!

নীচের তলা থেকে খেয়ে গেলেই অনেক কাজ বাঁচে। তবু 'এক্ষুণি কে খাবে বাবা' বলে অনামিকা দুজনের রুটি তরকারি খাবার জল সব বয়ে বয়ে দোতলায় উঠিয়ে নিয়ে যান।

সুরঞ্জন হয়তো বলেন, 'আমি কিছু নিয়ে যাবো?'

তোমাকে আর নিয়ে যেতে হবে না, ও আমি দুবারেই ম্যানেজ করে ফেলবো।

তবে আর কী! মনে রেখো সাহায্য করতে অফার করেছিলাম—

আচ্ছা মনে রাখা হবে।

বলে খাবারটা এনে ঘরের সামনের গ্রীলঘেরা বারান্দায় একটা ছোট টেবিলের ওপর রাখেন। পাশে জলও।

এ টেবিলটা শুভরঞ্জনের ছাত্রজীবনের সাক্ষী, পড়ার টেবিল। নেহাৎই মোটা-মুটি। যেমন হওয়া উচিত হারাধন মিত্তির লেনের বাড়িতে।

টগবগে শুভরঞ্জন, ওবাড়ি থেকে আসার সময় বলেছে, সব ফেলে দিয়ে যাও। এই পচাদের কিছু নিয়ে যেতে হবে না।

অনামিকাই ছেলের অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু নিয়ে এসেছিলেন। দীর্ঘদিন ব্যবহার করা জিনিস বড় মায়ার বস্তু। এই প্রজন্ম যতো সহজে সেই বস্তুদের প্রতি বহিস্করণের নির্মম আদেশ দিক, পুরনোরা সেটা পেরে ওঠে না। সেই পেরে না ওঠার কিছু কিছু চিহ্ন এ বাড়িতে বিরাজমান।

তবে হয়তো এখনো পর্যন্ত বিরাজিত থাকতে পেতো না যদি তাদের বহিষ্কারের আদেশ দাতা এখানে থেকে যেতো! শুভরঞ্জন নামের সেই ছেলেটা! 'অসুন্দর' বস্তুগুলোর বিরুদ্ধে ছিলো জেহাদ তার।

অতএব অনামিকার এই সংসারে সৌন্দর্যসাধক সব উপকরণের সঙ্গে কিছু কিছু 'অসুন্দর'এরও সহাবস্থান। যেমন এই কোমর ভাঙা, ছিলতে ওঠা বেতের চেয়ার দুটো। যে দুটোর ওপর বসেই সারা সন্ধ্যাটি কাটিয়ে দেন সুরঞ্জন আর অনামিকা।...প্রথম প্রথম ভেবেছেন, এ দুটোকে বিদেয় করে, নতুন দুটো কিছু কিনলেই হয়, এখন আর তা মনেও আসে না। চলে তো যাচ্ছে! এক আধবার উঠে পড়া পেরেকের খোঁচায় হয়তো একটু লেগে গেছে, কিম্বা জামাকাপড় ছিঁড়ে যায়, কীই বা এসে যায় তাতে? প্রতিনিয়তই তো অদৃশ্য এক পেরেকের খোঁচা খেয়ে চলেছেন।

"শুভো তাহলে আর দেশে ফিরবে না!"

মনের অগোচর পাপ নেই, কখনো কখনো অনামিকার মনের অতলে, তার খোকার হঠাৎ ফিরে আসার সম্ভাব্য কিছু কিছু কাল্পনিক ঘটনা ভেসে ওঠে... "এমনও তো হতে পারে- "

সেই হতে পারাটা অবশ্যই পরের মেয়ে কেন্দ্রিক।

এখন তো আকছার ডিভোর্স! এ যুগের উদ্ধত মেয়েরা তো আপস করতে জানে না। তেমন ক্ষেত্রে তাঁর 'খোকা' হয়তো মনের ঘেন্নায় সব ছেড়েছুড়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলো।...অথবা আরো নির্বিকার চিন্তা...হয়তো খোকা হঠাৎ একদিন দুটো সদ্য মাতৃহারা শিশুকে নিয়ে মায়ের কাছে এসে হাজির হলো, "মা, এদের আর কে দেখাশোনা করবে তুমি ছাড়া?"

পরক্ষণেই অবশ্য 'দুর্গা দুর্গা' করে ওঠেন, তবু তেমন একখানি ছবি তো চোখের সামনে ভেসে ওঠেও হঠাৎ হঠাৎ। আর কী বা কারণ জুটবে?

চাকরী যাওয়া?

খোকারই শারীরিক অক্ষমতা?

ও বাবা! সে তো লক্ষগুণ "দুর্গা দুর্গা!"

তবে সৃষ্টিকর্তার মহৎ বিধান নিতান্ত কাছে বসা বা পাশে শোওয়া মানুষটাও এসব চিন্তার রেশ টের পান না।

তাই দুটো মানুষ যখন নির্বাক বসে থাকে কাছাকাছি, উভয়েই টের পায় না অপর চিত্তে কোন্ ছবি ভেসে উঠছে, কতো বাক্যধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বাইরের চেহারা তো শুদ্ধতার!

* * *

অনামিকা যতোক্ষণ খাবার-টাবার গুছিয়ে এনে সাব্যস্ত করতে থাকেন, সুরঞ্জন ততোক্ষণ বাড়িটার সেই আষ্টেপৃষ্ঠে তালা লাগানোর কাজটা সমাধা করতে থাকেন। অতঃপর ওই গ্রীলঘেরা বারান্দার ধারে অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকা দেখে মনে হয় বারুদ ফুরিয়ে যাওয়া তুবড়ির মতো কথা ফুরিয়ে যাওয়া এই মানুষ দুটো।

তবে হয়তো কখনো কখনো অনামিকার কণ্ঠ থেকে—স্বগতোক্তির ধাঁচে দু'একটা কথা উচ্চারিত হয়। যেমন "পুরনো বাড়ি" থেকে আসার সময় টি. ভি.টি দাতব্য করে আসা হলো। থাকলে সন্ধ্যেটা তবু এমন বেঁধে মারতো না! অন্য রকম কাটতো!"

অনামিকা অবশ্য 'দাতব্যই' বলেন, তবে তাঁর 'খোকা' ওটাকে ফেলে দিয়েই এসেছিলো। বলেছিলো "দোহাই তোমার মা! ওই পচাটাকে আর নিয়ে যাবার চিন্তা কোরো না। ওখানে গিয়ে আমি তোমায় রঙিন টি. ভি. কিনে দেবো।"

একটা ভালো মাইনের চাকরী পেয়ে গেছে তখন শুভরঞ্জন তাছাড়া অবিবাহিত জীবন। তার টগবগে উদারতাই আলাদা!

কিন্তু অনামিকার ভাগ্যে যে অনামিকার ছেলের আরো বেশি 'ভালো' জুটে গেলো। তা অতিরিক্ত ভালো হলে যা হয়, তখন আর সেই ভালোটিকে হাতের মুঠোয় ভরে রাখা যায় না।

কখনো এমনও অনামিকার স্বগতোক্তি শোনা যায়, এই বাড়িই হয়েছে এখন পায়ের বেড়ি! পুরনো বাড়িতে পাঁচজনের সংসারে থাকলে, ইচ্ছে হলেই বেরিয়ে পড়া যেতো। তীর্থ ধর্ম করে বেড়াতে পারতাম। এ আর নড়ার উপায় নেই।

স্বগতোক্তির আর উত্তর কী? উত্তর দিতে চেষ্টা করলে আক্ষেপ বেড়ে যাবে।

সুরঞ্জন সে দিক দিয়ে যান না!

* * *

ক্রমশঃ রাত বেড়ে আসে, বাতাসও বুঝি ভারী হয়ে আসে, এক সময় সুরঞ্জন আস্তে বলেন, "আর রাত করে লাভ কী? সেরে নেওয়া যাক।"

'খেয়ে নেওয়া যাক' না বলে বলেন 'সেরে নেওয়া যাক।'

দুপুরবেলায় খাওয়ার মধ্যে যে আহ্লাদ ভাব থাকে, রান্নার ভালো মন্দ নিয়ে কিছুটা সরস কথাবার্তা হয়, রাতে সেটি অনুপস্থিত।

খোকার সেই পড়ার টেবিলটাকেই খাবার টেবিল করে দুজনেই একসঙ্গে খেয়ে নেন, নেহাৎ কাজ সারার মতোই। উপচার তো সেই দুপুরে তৈরি করে রাখা দু'খানা রুটি, আর সেই দুপুরেরই উদ্‌বৃত্ত ডাল এবং যৎসামান্য কিছু ভাজা! কদাচ একটু

আচার। সুরঞ্জনের জন্যে বানানো সেই আমুল পাউডারের ছানাটুকু নিয়ে প্রায় রোজই বলেন সুরঞ্জন 'এটা আর কেন করো রোজ রোজ! কাল থেকে আর কোরো না।' এবং রোজই অর্ধেকটা অনামিকার পাতে তুলে না দিয়ে ছাড়েন না।

অনামিকা জোর আপত্তি করেন, বলেন, আমায় আবার কী জন্যে? অম্বলের রুগী!

সুরঞ্জন বলেন, ছানা খেলে অম্বল হয় না, বরং কমে!

খাওয়া সেরে সুরঞ্জন হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় চলে আসেন, মশারিটি টাঙান, পরিপাটি করে তার চারপাশ গুঁজে মশাদের ঠেকাবার চেষ্টাটি করে, জানালা খুলে খোলা জানালার ধারে এসে দাঁড়ান। এদিকটায় রাস্তা। যেখান থেকে দেখে পাড়ার ছোকরারা রায় দেয়, 'সব সময় জানালা বন্ধ থাকলে বাড়ি খারাপ হয়ে যাবে দাদু!'

এ সময় অবশ্য তারা দেখে না! এখন পথে লোক চলাচল নেই।

অনামিকা এখনই খাওয়া বাসন ক'টা বেসিনেই ধুয়ে মেজে নিয়ে দেওয়ালের ধারে রাখেন, সকালে নীচে নামার সময় নিয়ে যাবেন। টেবিলটা মোছামুছি করে ঠেলে সরিয়ে রাখেন।

ভিজে হাত মুছতে মুছতে ঘরে এসে ঢোকেন। প্রথমেই পাখার স্পীডটা শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। তাতে সযত্নে গুঁজেরাখা মশারিও দুলতে থাকে, ওড়বার চেষ্টা করতে থাকে। জানালার ধারে এসে আস্তে হয়তো সুরঞ্জনের পিঠে একটু হাত ঠেকিয়ে, অথবা না ঠেকিয়েও বলেন, কী গো দাঁড়িয়ে যে? শোওনি?

এই যে শুই।

বলে সাবধানে মশারির ধার তুলে ঢুকে আসেন সুরঞ্জন।

অনামিকাও সে সাবধানতা বজায় রেখে ঢুকে পড়েন।

অতঃপর? অতঃপর জোর পাখা ঘোরার শনশন শব্দের সঙ্গে ঘুমের নিঃশ্বাসের শব্দ এক হয়ে যায়।

আর কোনো কথা হয় না!

* * *

অনামিকা সুরঞ্জনের দশ বছরের এই 'একক' জীবনের দশ-দশার মধ্যে আপাততঃ বর্তমানে এই 'দশা' চলছে। দিনরাত্রির আবর্তনে ক্যালেন্ডারে তারিখটা বদলাচ্ছে মাত্র, আর বিশেষ কোনো বদলের ছাপ নেই।

বদলের মধ্যে বড়জোর বাজারের থলিতে পুঁই ডাঁটার বদলে সজনে ডাঁটা কী কচুর ডাঁটা! কোনোদিন জলখাবারের পাতে পরোটা কী নিমকির বদলে দু'খানা বেগুনী কী আলুর চপ। অথবা কোনোদিন হয়তো বাজার ফেরত থলি থেকে একটা ঠোঙা নামিয়ে রেখে একটু যেন আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন সুরঞ্জন। বলেন, মোড়ের দোকানে গরম সিঙাড়া ভাজছিলো, নিয়ে এলাম ক'খানা। তোমার বোধহয় খাবার তৈরি হয়ে গেছে?

অনামিকার মুখে একটু প্রীত হাসি ফুটে ওঠে। বলেন, তা হোকগে, দু'খানা পরোটা বৈ তো নয়, রাতের রুটি দু'খানা কম করবো। এবং আর একটু মধুরমোহন হাসি হেসে বলেন, অম্বুলে রুগী গিন্নিটিকে তো ভালো জিনিসই জোগান দিচ্ছো! আমার তো লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, এই আর কী?

খাবে না?

খাবো না আর বলি কী করে? গরম সিঙাড়া বলে কথা! বলে সে কটা প্লেটে ভাগ করে নেন ঈষৎ কম-বেশি করে।

সুরঞ্জন একটু হেসে বলেন, আমার বয়েসটা তোমার থেকে বেশি না কম? বলেই ভাগটা সমান করে নেন, হয়তো একখানা ভেঙে দু'টুকরো করেও!

বদলের মধ্যে এইটুকু।

বৈচিত্র্যের মধ্যে এইটুকু!

জীবনযাত্রার গতি ঢেউবিহীন জলাশয়ের স্থির জলের অলক্ষ্য গতির মতো!

হঠাৎ আজ একটা অভাবিত আলোড়ন উঠলো! যাতে এই স্তিমিত ছন্দ জীবনযাত্রায় কলধ্বনির নূপুরধ্বনি উঠলো!

সন্ধ্যায় অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে যখন সুরঞ্জন বলে উঠতে যাচ্ছেন, আর বসে থেকে লাভ কী? সেরে নিলেই হয়, সেই সময় বাইরের দরজার বেলটা বেজে উঠলো, জোর বিক্রমে!

ধ্বক্ করে উঠলো দুখানা বুকই। শব্দটা যেন বড় আতঙ্কবাহী।

ঘড়ির হিসেবে হয়তো এমন কিছুই রাত নয় পৌনে ন'টাকে আবার কে রাত বলে? এই সময়ই তো টি. ভি.-তে জোরকদমে চলে প্রোগ্রাম!

কিন্তু এই 'ভূতুড়ে বাড়িটার' লোক দুটোর কাছে মনে হলো অনেক রাত! এদের তো টি. ভি. নেই! কোনো প্রসঙ্গও নেই। এতো রাতে বেল বাজালো কে?

পাড়ার কোনো বাড়িতে কিছু দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? কিন্তু...ঘটলেই বা সুরঞ্জনদের কাছে কে জানাতে আসবে? উনি কার কিসের মধ্যে থাকেন?

তবে কী সেই পুরনো বাড়ির কারুর কিছু?

সেই বা এমন কে আছে সেখানে সুরঞ্জনদের? যারা তড়িঘড়ি রাতদুপুরে তাদের দুর্ঘটনার খবরটা জানাতে আসবে সুরঞ্জনকে? খুড়তুতো ভাইদের সংসার বৈ তো নয়। তাও পচা পাড়ার পুরনো বাড়িটি ত্যাগ করে নতুন পাড়ায়—নতুন বাড়িতে উঠে আসার অপরাধে কে আর সুরঞ্জনের ওপর সন্তুষ্ট?

ইদানীং যা মনটা একটু সদয় হয়ে আসছে, 'বড়দার' ছেলের মতিগতিতে! ছেলেটি হাতছাড়া হয়ে গেছে বড়দার।

আর দেশে আসছে না ছেলে!

টাকার দেশ! অনেক মধু! ছেড়ে আসতে পারে কখনো? বেচারী বড়দা বড় বৌদি! ভাবলে দুঃখ হয়। দ্বিতীয় আর কোনো সন্তান নেই। একটা মেয়েও যদি থাকতো! তবুতো দেখতো!

'আহা বেচারী' বলতে পেয়ে ইদানীং ভিতরে ভিতরে একটু ভালো লাগা ভাব এলেও—কারো কোনো সুখ দুঃখের খবর দেবার জন্যে রাতদুপুরে—এত্তো দূরে?

আর একবার বেজে উঠলো সেই ঘণ্টা।

আরো প্রবল ধ্বনিতে—'টেলিগ্রাম আছে!'

টেলিগ্রাম!

অনামিকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, মাটিতে বসে পড়ে ডুকরে ওঠেন, কী বলল গো? টেলিগ্রাম? অ্যাঁ। কী হবে?

রাতের নিঃস্তব্ধতায় আচমকা 'টেলিগ্রাম' শব্দটি ধ্বনিত হলেই, বুক কেঁপে ওঠে না, সাধারণ সংসারী মানুষদের মধ্যে, এমন শক্ত বুক ক'জনের আছে?

তাছাড়া—এই টেলিগ্রাম পিয়নদের বেল বাজানো বা দরজায় কড়ানাড়া দেওয়ার মধ্যে যেন একটা দুর্দ্দাম ভঙ্গী থাকে। যেন প্রাণপণ শক্তিতে নিজের আবির্ভাব সংবাদ ব্যক্ত করে ছাড়ার চেষ্টা। ওতেও আরো বুক কেঁপে ওঠে।

আর এখানে রাত ন'টাতেই তো গভীর রাতের নিস্তব্ধতা। এ অনামিকাদের সেই পুরনো পাড়া নয় যে, রাত বারোটা পর্যন্ত গলির রাস্তাও সরগরম।

সুরঞ্জনের অবশ্য বসে পড়ে আর্তনাদ করা চলে না! তাঁকে দ্রুত পর পর ডজন খানেক তালা খুলে নীচে গিয়ে বাইরের দরজা খুলতে হয়। সারাআট গ্রীলে মোড়া এই বাড়ি থেকে মাথা বাড়িয়ে তো সাড়া দেবার জো নেই—'যাচ্ছি' বলতে! তবু গলা তুলে বলেন সিঁড়ি থেকে—'যাচ্ছি।'

সই করে নেবার সময়ও নিরাপত্তার ঘাটতি ঘটে না। 'কোলাপ্সিবলের' গেট-এর মধ্য দিয়েই হাত বাড়িয়ে লেনদেন করে নিয়ে, আবার সব দরজা বন্ধ করে ফিরে আসেন সুরঞ্জন। তবে ততক্ষণে অনামিকা নীচের তলায় নেমে এসে, বাইরের ওই বারান্দাটার সামনের বসার ঘরে এসে বসেছেন। এখন অবশ্য আর মাটিতে নয় সোফাটাতেই।

সুরঞ্জন যতক্ষণে টেলিগ্রাম নিয়ে ফের তালা চাবি বন্ধ করে দোতলায় উঠে আসবেন, ততক্ষণ কী ধৈর্য ধরে বসে থাকা সম্ভব? অন্ততঃ অনামিকার পক্ষে অসম্ভব সেটা!

ছেলের হঠাৎ ফিরে আসার সম্ভাব্য কারণ আবিষ্কার করতে অনামিকার মনের মধ্যে গভীর গোপনে যে চিন্তাগুলো ঘোরাফেরা করে সেই চিন্তাগুলোই এই আকস্মিক 'টেলিগ্রামে'র আবির্ভাবে 'পাত্র' বদল করে বসে আছড়া আছড়ি করতে চাইছে।

সুরঞ্জন অনামিকাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, এই দ্যাখো, ইত্যবসরে নেমে এসে বসে আছো? আমি তো যাচ্ছিলামই।

সুরঞ্জনের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক মতো, অতএব কিছুটা ভয় নিবারক! তবু অনামিকা অস্ফুটে বলেন, কার টেলিগ্রাম?

আর বোলো না! কাণ্ড দ্যাখো! টেলিগ্রাম তো দেখছি খোকার! কিন্তু লিখেছে কী জানো? 'আশার্কারি আমার চিঠিতে সব খবর জেনে গেছো—এখন সঠিক জানাচ্ছি' —চিঠি আবার পেলাম কখন বলোতো? ডাকের যা ব্যবস্থা! ওপরে গিয়ে ভালো করে পড়িগে। তাড়াতাড়ি নেমে এসেছি, পড়ার চশমাটা নিয়ে আসিনি! অনেক কথা লিখেছে দেখছি। ছেলের তো আমার, পয়সার মা বাপ নেই, তাই—টেলিগ্রাম করেছে না চিঠি লিখেছে!

অনামিকা তথাপি ক্ষীণ স্বরে বলেন, তা খবরটা কী?

আসছে গো—

একা?

না না, লিখেছে চারজনেই আসছে! আবার লিখেছে চিঠিতে তো সবই জেনেছো—তবে এয়ারে বুকিং পাওয়া যে কী ঝামেলা—। আর—'কতদিন পরে দেশের মাটিতে পা দেবো' বলে আহ্লাদ জানাতেই ইয়া লম্বা টেলিগ্রাম। ধরোতো এটা একটু, আমি তালাগুলো লাগাতে লাগাতে যাই। চিঠিটা আগে এলো না—কী কাণ্ড দ্যাখো—

তা কাণ্ডই বৈকি! ভয়ঙ্কর কাণ্ড! এদের কাছে যে সেটি কত 'ভয়ঙ্কর', এঁদের খোকা সে কথা ভাবতেও পারবে না! ভাবতে পারবে না—সুরঞ্জন পড়ার চশমা পরে ছেলের বার্তাটি ভালো করে পড়ামাত্রই অনামিকা আর একবার বসে পড়ে প্রায় সেইরকম আর্তনাদের মতই বলে উঠবেন, 'কালই আসছে?'

তাইতো দেখছি। জানিয়েছে সাত তারিখে সন্ধ্যা ছটায় দমদমে গিয়ে নামছি!

দমদম।

দমদম তো অনামিকাদের বাড়ির দোরগোড়ায়। তার মানে সেই সাড়ে ছ'টাই।

এ খবর আনন্দের, না আতঙ্কের?

অনামিকা তো আতঙ্কের মতই বলে ওঠেন, হ্যাঁগো—কী হবে?

* * *

তা সত্যিই তো ভাবনার মতোই 'কী হবে?' যে বৌকে বিয়ের অষ্টমঙ্গলার পরদিন শেষ দেখেছেন, আর যে নাতি নাতনী দুটোকে দেখেনইনি, তাদের এসে পড়ার জন্য একটা প্রস্তুতি পর্ব নেই? আর—দশ দশটা বছর ভারতছাড়া হয়ে থাকা সেই শুভরঞ্জনই বা কোন মূর্তি নিয়ে এসে দেখা দেবে কে জানে? দু'মাস ছ'মাস বাদে বাদে এক একটা চিঠিতে কতটুকু বোঝা যায়, কতটা বদলে যেতে পারে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য সচ্ছলতা আর অভাবিত বিলাসিতার উপকরণসমূহ হাতে পেলে!

মধ্য প্রাচ্যের সেরা সেরা শহরগুলো কী এখনো—মধ্যযুগে পড়ে আছে? আচারে আচরণে ফ্যাসানে প্রসাধনে পশ্চিমী দুনিয়াকে অন্ধ অনুকরণ করে চলেছে না? সাধনা করে চলছে না, ভবিষ্যতে টেক্কা দেবার?

টাকার দেশ!

তার মানেই 'সব পেয়েছির দেশ!'

তবে এখনি স্থির হয়ে অতটা ভাবতে পারছেন কী অনামিকা?

তা পারছেন না। তাঁর ভাবনার স্রোত এখন শতধারে প্রবাহিত হয়ে চলেছে! রাত্রে ঘুমের কোনো প্রশ্ন থাকেনি, সুরঞ্জনকেও প্রায় সারারাত ঘুমোতে দেননি। অবিরতই কথা বলে চলেছেন, 'হ্যাঁগো কাল ভোরবেলাই একবার মালতীর মাকে আর মলিনাকে ডেকে আনতে পারবে?'

দুজনের মধ্যে একজন রাঁধুনী একজন বাসনমাজুনী কাপড়কাচুনি। দুজনেই একদা এবাড়িতে কাজ করে গেছে। এখন তো অপ্রয়োজনীয়বোধে, (এবং ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টাতেও কতকটা তাদের বিদায় দেওয়া হয়েছে।

সুরঞ্জন ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে অবাক হয়ে বলেছেন, মালতীর মা? মলিনা? কে তারা?

চমৎকার? কে তারা? কেন, আগে এখানে কাজ করে যায়নি?

তা সক্কালবেলাই তাদের কোথায় পাবো?

পেলে সক্কালবেলাই পাবে। বেলা হলেই তো কাজে বেরিয়ে যাবে।

তা তারা থাকে কোথায়, আমি জানি?

জানবে না কেন? মালতীর মা তো ওই চায়ের দোকানের ছেলেটার মাসি না পিসি কী যেন হয়। আর মলিনা তার চেনা।

কী আশ্চর্য! এইভাবে কাউকে খুঁজে আনা যায়?

না গেলে চলবে? ছেলে এসে দেখবে, মা তার বৌয়ের সামনে রাঁধছে বাসন মাজছে, ঘর মুছছে!

এহেন ধিক্কারেও সুরঞ্জন আলগা গলায় বলেন, বিদেশে এতে কেউ আশ্চর্য হয় না! সে সব জায়গায় ঘরসংসারে 'কাজ করার' লোক অত থাকে না! নিজেরাই সব করে নেয়।

হ্যাঁ হ্যাঁ জানি সে কথা। ঢের শুনেছি। শুনে শুনে কান পচে গেছে। সেখানের সঙ্গে এখানের তুলনা? সেখানে তো সব কাজই কলকব্জায়। কার্পেট পাতা মেঝে, এঁটো সকড়ির বালাই নেই, বাসি কাপড় কাচা কাপড়ের বিচার নেই। আমায় তুমি ওদেশ দেখাতে এলে?

কথাটা শেষ করেই আবার নতুন উদ্যমে বলে ওঠেন অনামিকা, তুমি না পারলে আমাকেই পারতে হবে।

আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আমিই দেখবো। এক্ষুনি তো নয়? রাতটা কাটলে তবে তো? তবে ডাকলেই আসবে? থাকবে?

যাতে থাকে তা করতে হবে। ডবল মাইনের লোভ দেখাতে হবে।

সুরঞ্জন বলেছেন রাতটা কাটুক। কিন্তু অনামিকাকে যে এই রাতটা করাত দিয়ে কাটছে। হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দেবার হলে দিতেন।

তন্দ্রা লাগা মাত্রই সে তন্দ্রা ছুটে যাচ্ছে সুরঞ্জনের। ওগো সক্কালবেলাই তো একবার গ্যাসের দোকানে যেতে হবে!

গ্যাসের দোকানে!

আকাশ থেকে পড়ছো যে? খোকা খোকার বৌ এসে দেখবে মা ঘুঁটে কয়লার উনুন ধরাচ্ছে? বাড়ি বানানোর সময় বলেনি খোকা—'নো কয়লা, নো ঘুঁটে, নো ধোঁয়া।' মনে নেই? তাছাড়া—কেরোসিনে চা? অসম্ভব। যে করে হোক কাল সকালের মধ্যেই একটা সিলিন্ডার এনে হাজির করতে হবে তা বলে রাখছি। দশ কুড়ি টাকা বেশি দিলে ঠিকই পাওয়া যায়।

তার মানে ঘুষ দিলে?

থামতো! ওকে আর ঘুষ বলে না। বাজারের কোন জিনিসটাই বা বেশি দাম ধরে দিতে হচ্ছে না? তাহলে—সেও ঘুষ '

যুক্তি অকাট্য!

কী গো ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? সত্যি তুমিই সুখী! ঘুম আসছেও তো!

ঘুমোইনি। বলে যাও।

বলছি—ভোর হলেই ওই ভাঙা বেতের চেয়ার দুটো আর আমাদের খাওয়ার, মানে খোকার ওই পড়ার টেবিলটা, দুজনে ধরাধরি করে ছাতের এককোণে ফেলে রেখে আসতে হবে। ওটা যেন খোকা এসে না দেখে।

আচ্ছা হবে।

নীচের খাবার টেবিলের প্লাস্টিকটা তুলে সরিয়ে রাখতে হবে কী বলো? প্লাস্টিকটা দেখতে ভালো দেখায় না।

রেখো!

শুনছো—কাল পাম্প চালিয়েই নিভিয়ে দিও না! রিজার্ভারটা পুরো ভর্তি করে রেখো!

রাখবো!

আচ্ছা অমন এলিয়ে এলিয়ে উত্তর দিচ্ছো কেন বলতো?

শরীরটা ঘুমে এলিয়ে আসছে বলে।

সাধে বলছি, তোমার মতো মানুষই সুখী!

সুখী হওয়া কী দোষের?

দোষের কী আর? তবে হতে পারাটাই বাহাদুরী।

আচ্ছা আচ্ছা। একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা করো তো! কাল তো অনেক খাটতে হবে।

তা তো হবেই। কিন্তু ঘুম এলে তো? মাথার মধ্যে ইঞ্জিন চলছে!

ওগো শুনছো—কাল সক্কালেই আমাদের এই বিছানা বালিশ মশারি চাদর সব গুটিয়ে নিয়ে নীচে রাখতে হবে কী বলো?

কেন? প্রমাণ লোপ? অনধিকার প্রবেশের?

আঃ। কী যে বলো! বলছি, ওরা তো অনেক জিনিস আনবে। এই 'জিনিসের ঘরটা' খালি রাখা উচিত না?

তাছাড়া—কাল থেকে খোকারা থাকবে শোবে। আমরা তো তাদের ঘাড়ের কাছে শুতে আসবো না?

সে তো ঠিক!

এতো তো আহ্লাদ করছি, দ্যাখো এখন ক'দিনের জন্যে থাকে। ক'দিনের ছুটি, তা কিছু লিখেছে?

তা তো দেখলাম না। হয়তো চিঠিটায় লিখেছিলো।

আশ্চর্য! এই চিঠিটাই মারা গেলো!

মারা হয়তো যায়নি। আসবে পরে। দেরী হচ্ছে।

পরে আসায় তো ভারী লাভ হবে আমার।

সুরঞ্জন হেসে ফেলেন। বলেন, তোমার লাভ লোকসান ভেবেই জগতের সব কাজ হয় বুঝি?

তারপর আস্তে অনামিকার মাথায় একটু হাতের চাপড় দিয়ে বলেন, এবার একটু খুকু ঘুমলো পাড়া জুড়লো হোক না!

বহুকাল পরে এ ধরনের কথা শোনা গেলো সুরঞ্জনের মুখে।

অনামিকাও একটু হেসে ফেলে বলেন, নাতি নাতনী আসছে তা মনে রেখো!

আসছে তো কী?

তাদের সামনে যেন এরকম কথা·বলে বোসো না।

তারা বাংলা কথা বুঝলে তো?

বাংলা কথা বুঝবে না?

উত্তেজিত শোনায় অনামিকার স্বর।

তা আশ্চর্য হচ্ছো কেন? আজকাল তো দিল্লী বোম্বাইতে থাকা বাপ মায়ের ছেলেমেয়েরাও বাংলা কথা বলতে শেখে না। বাংলা অক্ষর লিখতে জানে না!

কি জানি। কী রকম হয়ে আসছে সবাই।

বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে এতক্ষণে একটু চোখ বোজেন অনামিকা। আকাশে তখন অন্ধকার ফিকে হয়ে আসতে শুরু করেছে। এ নিশ্বাস কী শান্তির?

কিন্তু উৎকণ্ঠা কী সুরঞ্জনেরই নেই?

মনের মধ্যে চাপা উত্তেজনা!

বাড়িটার চেহারাটা বেশ মলিন হয়ে গেছে। খোকা দেখে গিয়েছিলো সদ্য নতুন ঝকঝকে! হয়তো বলবে, 'এই দশ বছরের মধ্যে একবারও বাড়িটায় মিস্ত্রীর হাত পড়েনি বাপী?'

সেটা লজ্জাযোগ্য!

কিন্তু সুরঞ্জন তো ছেলেকে বলে উঠতে পারবেন না, আমাদের যে কীভাবে চলে, তা কী আর তুই জানিস?

* * *

অথচ দোষারোপও করা চলে না সুরঞ্জনের ছেলেকে। সে তো লিখেছিলো, সরাসরি মনিঅর্ডারে তোমাদের মাসে মাসে কিছু পাঠাবো এমন সহজ ব্যবস্থা তো নেই! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে হবে। সেও হয়তো ডলারের মাধ্যমে—তোমায় সেটি উদ্ধার করতে হবে একটু হ্যাঙ্গামা সয়ে।

তার উত্তরে সুরঞ্জন জানিয়েছিলেন, ওসব হ্যাঙ্গামে দরকার নেই। শুভরঞ্জন যখন ছুটিছাটায় আসবে, নিয়ে এসে—যা ব্যবস্থা হয় করে দেবে।

কে আর ভেবেছিলো, সেই ছুটি মিলতে দশ বছর লাগবে?

* * *

দীর্ঘদিন ধরে এই দুটো মানুষের নিত্যদিনের চিন্তাধারা একই মুখে প্রবাহিত হয়ে চলে এসেছে। দুজনের মধ্যে কথাবার্তাও তাই ক্রমশঃই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছিলো। ঘাত-প্রতিঘাত না থাকলে, কথার ফুল্‌কি ছুটবে কিসে?

তাছাড়া দুজনের চিন্তাতেই ছিলো ব্যয় সংক্ষেপের প্রতিফলন।

গতরাত্রের টেলিগ্রাম অন্তত অনামিকার চিন্তাধারায় মস্ত একটা মোচড় দিয়ে মোড় ঘুরিয়ে বসেছে।

তাই 'কাজের মেয়ে' মালতীর মা আর মলিনাকে ডাকিয়ে আনিয়ে সুরঞ্জনকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিয়েছেন অনামিকা, খোকারা যে কদিন থাকবে ওরা যত যা চায় তাই প্রমিস করেই রাখতে হবে তা বলে দিচ্ছি।

তাছাড়াও অবশ্য অনামিকা, তাদের ডাকিয়ে এনে হাতে পায়ে ধরতেও বাকি রাখেননি!

অতঃপর অনামিকার ঘোষণা, বাজারে গিয়ে যেন কিপটেমি কোরো না! বাজার সেরা ভালো ভালো মাছ তরকারি আনতে হবে তা মনে রেখো!

আজই বেশি আনবো? ওরা এসে কী খাবে না খাবে, কতটুকু খাবে না বুঝেই? তোমার তো আর ফ্রীজ নেই যে তুলে রাখা যাবে।

ফ্রীজ নেই, সে খোঁটা আর আমায় দিচ্ছো কেন? কোনোদিন কী আমার সুবিধে অসুবিধে নিয়ে ভেবেছ?

সুরঞ্জন অভিযোগের প্রতিবাদ করাটা কখনোই শ্রেয় বিবেচনা করেন না, তাই জন্যেই বলে ওঠেন না, 'ফ্রীজের অভাবে তোমার যে খুব অসুবিধে হচ্ছে, একথাও তো বলনি কোনোদিন!'

অসুবিধে কী সত্যিই বোধ করেছেন অনামিকা? সব সময়ই তো বলেছেন, 'ভারী তো সংসার! মাত্র তো দুটো বুড়োবুড়ি!'

এরকম ক্ষেত্রে অনামিকাও 'বুড়োবুড়ি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু এখন মনের মধ্যে চলছে অন্য প্রতিক্রিয়ার ব্যঞ্জনা।

বৌ এসে শাশুড়ীর জীবনযাত্রার দৃশ্যটি দেখে কী ভাববে?

হেনস্থার চোখে দেখবে না তো?

অনেক চাকচিক্য দেখে আসা চোখে হয়তো অনামিকার এই প্রাণতুল্য সংসারটিকেই 'ভিখিরির সংসার' ভেবে বসবে বৌ।

তাই এ যাবৎ যে ঘরসংসার অনামিকার নিজের কাছে, দিব্যি তকতকে ঝকঝকে পরিষ্কার, ছিমছাম ফিটফাট মনে হয়েছে, তার মধ্যেই এখন নানান অসৌন্দর্য অভাব, আর গলতি দেখতে পাচ্ছেন তিনি। বারে বারেই বলছেন বটে 'খোকা এসে কী বলবে?' কিন্তু মনের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে বৌ এসে কী বলবে? বৌ কী ভাববে?

তাই কেবলই মনে হচ্ছে, 'ওরা যে ক'টা দিন থাকবে—কোনো ভাবে যাতে মানরক্ষা মুখরক্ষা করে চালানো যায়।

* * *

আজকের সকালটা পর্যন্ত ছাড়পত্র! আজ দুজনে ভাতেভাত খেয়ে কাটিয়ে দিয়েও, অন্য কাজের জন্য সময় বার করা হয়েছে। এখন চলছে প্রহর গোনা! ঘণ্টা গোনা! মিনিট গোনা!

কিন্তু কে জানতো, বিকেলের দিকে চিন্তাধারা আবার অভাবিত এক মোড় নেবে?

* * *

বিকেলে, যখন শরীর মন টান টান, সুরঞ্জন এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, এ হেন সময় খোকার 'সেই' চিঠিটি এসে হাজির হলো! যাকে অনামিকা 'মারা যাওয়ার' দলে ফেলেছিলেন।

বিকেলের ডাকে এলো?

না এখানে সকাল বিকেল দু'বেলা 'ডাক' আসার শৌখিনতা নেই। শুধু বিকেল-বেলাই ডাকপিয়ন ডিউটি সারতে বেরোয় হয়তো বা তিন চার বেলার জমানো চিঠি নিয়ে।

কিন্তু কে ভেবেছিলো সেই চিঠিটি এমন একটা অভাবিত বার্তা বহন করে

আসছিলো!

চিঠিটা লেটারবক্স থেকে বার করে নিয়ে খামের মুখ ছিঁড়তে ছিঁড়তে ভিতরে চলে এসে অনামিকার কাছাকাছি এসে বলে ওঠেন সুরঞ্জন, এই দেখো! খোকার সেই চিঠিটা এলো! বলিনি তোমায়, আসবে ঠিকই। 'লেট্-লতিফ' হয়ে। লম্বা চিঠি!

বলতে বলতেই চিঠিতে চোখ বোলাচ্ছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, একী? এসব কী লিখেছে খোকা!

কী আবার লিখেছে গো? দু'চারদিনের মাত্র ছুটি?

নাঃ। তার উল্টো। ছুটিতে আসছে না খোকা!

ছুটিতে আসছে না!

নাঃ। একেবারে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তলপিতলপা গুটিয়ে দেশে চলে আসছে।

অনামিকা ভয়ার্ত গলায় বলেন, চাকরি ছেড়ে দিয়ে! কেন? শরীর-টরীরে কিছু হয়নি তো?

না না! শরীর খুব ভালোই আছে। সে কথাও লিখেছে, এমনিতে দারুণ ভালোই আছি, তবু—আরে এইতো নিজেই পড়ো না। লিখেছে তো দুজনকেই।

* * *

তাই লেখে অবশ্য শুভরঞ্জন!

লেখে—'শ্রীচরণেষু মা ও বাপী।'

এবারেও তাই লিখে জানিয়েছে, 'সত্যি বলতে, এমনিতে এখানে থাকাটা দারুণ ভালো। আছিও তাই। স্বাস্থ্যটাস্থ্যও খুবই ভালো থাকে। তোমাদের সেই টিংটিঙে 'খোকাকে' দেখে চিনতে পারবে না। একখানা তাগড়া চেহারা বানিয়ে ফেলেছে। তবুও—'

হ্যাঁ লম্বা চিঠিখানায় গুছিয়ে-গাছিয়ে যা লিখেছে তার সারমর্ম এই—চাকরিতে তার দ্বিতীয়বারের কণ্ট্রাক্টের মেয়াদও চুকে গেছে। একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করছে। যদিও কোম্পানী আরো পাঁচ বছরের জন্যে কণ্ট্রাক্ট করাবার জন্যে খুবই প্ররোচিত করছে, তবে সে তার সংকল্পে অটল! আর ফাঁদে পা দেবে না! টাকা দেয় অবশ্য অনেকই, বাড়ি গাড়ি, সংসার মেইনটেন্সের সবই প্রায় ফ্রী! তবু শুধু আরামে আয়েসে থাকা, আর টাকা রোজগার করা এটাই তো জীবনের একমাত্র কথা হতে পারে না। ছেলেমেয়েরা নিজেদের দেশ চিনবে না, ভারতীয় জীবনে অভ্যস্ত হবে না এটা ঠিক নয়। এখনো ওরা নেহাৎ ছোট আছে, তাই এইবেলাই ওদের নিয়ে সরে পড়া ভালো!

...এ ইঙ্গিতও জানিয়েছে, টাকা যা জমে গেছে, তাই দিয়ে দেশে গিয়ে একটা ইন্ডাস্ট্রী গোছের করতে পারলে বাকি জীবন বেশ চলে যাবে। নচেৎ, কিছু কী আর চাকরী-বাকরী জুটবে না দেশে?

তাছাড়া চিরদিন শুধু নিজেকে নিয়ে থাকাকে শুভরঞ্জন শুভকারী ভাবে না। মা বাপের ওপর কর্তব্য থাকবে না? মা বাপ, অন্য আত্মীয়স্বজন, দেশের সামাজিক জীবন সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, শুধু সুখে থাকাকে সুখ মনে করে না শুভরঞ্জন। তাই ঠিক করেছে—

হ্যাঁ তাই ঠিক করেছে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে আসা।

আবার এও লিখেছে "এ ব্যাপারে তোমার বৌমাটি আবার ভীষণভাবে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে। সেই বলছে এভাবে শুধু নিজেরা আরামে থাকলাম আর ছেলেমেয়ে-দুটোকে তাদের শিকড় চিনতে না দিয়ে বিজাতীয় ভাবে গড়ে তুললাম, এ জীবনের কোনো মানে নেই! বলে কী জানো, তোমাদের বৌমা? শুনে তোমরা অস্থির হবে। বলে যা টাকা জমেছে, আর যা সোনাদানা করা হয়েছে, সেগুলো সব বেচে দিয়ে শুধু ব্যাংকে জমা রাখলেও বাকি জীবন তার সুদেই সংসার চলে যেতে পারবে। তার ওপর একটা কিছু কাজকর্ম করতে পারলেই—তো—হয়ে গেল।

আসলে ওর ওই "ভারতীয় জীবন ভারতীয় জীবন" একটা বাতিক। এখানে বাংলা বর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না বলে নিজে হাতে বড় বড় করে অক্ষর লিখে বাংলা শিখিয়েছে মেয়েকে। ছেলেকেও শেখাতে ধরেছে।

কিন্তু বৌয়ের মহিমা নিয়ে এত ধানাইপানাই আর পড়তে ভালো লাগে না অনামিকার। বৌয়ের বাতিকেই তাহলে হাজার হাজার টাকার মাইনের চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসে বসে যাচ্ছে খোকা? এ আবার কী উৎকট চিন্তা? শুনে লোকেই বা বলবে কী? তাছাড়া বিশ্বাসই কী করবে? বলবে 'চাকরী ঘুচে গেছে তাই এসব বড় বড় কথা বলছে।'

অথচ এই অনামিকাই প্রায় প্রতি চিঠিতেই ছেলেকে লিখে এসেছেন, 'টাকা টাকা' করে চিরকালই কী সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে পড়ে থাকবি বাবা? দেশে কী আর কোনো চাকরীই জুটবে না? নাহয় এতো হাজার হাজার টাকার নাই হতো! গেরস্থালীভাবে থাকা যায় না কী? মা বাপের কথা মনে পড়ে না?

এটা লিখতেন, আরো বিশেষ ভাবে বৌয়ের চৈতন্য উদ্রেক করাতে। মনে ধারণা ছিলো, বৌই আরাম আয়েস, যথেচ্ছ স্বাধীনতা ছেড়ে আসতে নারাজ।

এ আবার উল্টো ব্যাপার।

অথচ নিজের মধ্যেও যে কতো উল্টোপাল্টা ব্যাপার তা খেয়াল হয় না। যে 'খোকাকে' তিনি প্রায় খরচের খাতায় লিখে ফেলে রেখে, হতাশ হয়ে দিনে দিনে শুধু ফুরিয়ে যাওয়ার নিয়তিটি মেনে নিয়ে দিন, কাটাচ্ছিলেন অনামিকা, সেই খোকাই যেই পুরো অঙ্কে ভরাট হয়ে জমার খাতায় এসে বসবার আশ্বাস দিয়ে বসলো, সেই মন আর্তনাদ করে উঠতে চাইছে, এ কী? এ তো ঠিক নয়। এ কী অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করে বসলো খোকা!

এখন খোকার এই ভুল সিদ্ধান্তর খবরটা জেনে ফেলে, 'খোকা আসার' সমস্ত উৎসাহটাই যেন উবে যেতে বসলো। হাত পা এগিয়ে এলো।

ভেবেছিলেন, সাময়িক কটা দিনের জন্যে মুখরক্ষা মানরক্ষা করে কাটিয়ে দিতে পারলেই হলো। কিন্তু এখন সেই ভাবনাটা তো আর কার্যকরী থাকছে না। এখন মনে হচ্ছে ভয়ানক একটা ভারী জিনিসের ভার চেপে বসছে মাথার মধ্যে।

সুরঞ্জন বললেন, কী হলো? তোমার যে দেখছি চিঠিটা শেষই হচ্ছে না! ক'বার করে পড়ছো?

তুমি সবটা পড়েছো? কী লিখেছে দেখেছো?

পড়লাম তো। অতো ভাবনায় পড়ে যাচ্ছো কেন? খোকা কী আর না বুঝে-সুঝেই একটা ডিসিশান নিয়েছে? হয়তো এখানে চলে আসার চেষ্টা করতে করতে একটা চাকরীবাকরীর আশ্বাস পেয়েছে। নাহলে কী আর—আচ্ছা আমি বেরোচ্ছি। তোমার সব ঠিকঠাক আছে তো?

অনামিকা বললেন, আমার হিসেবে তো আছে।

সুরঞ্জন যেতে উদ্যত হয়েও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, খোকা আসছে। এতে যেন তোমার আহ্লাদের থেকে চিন্তাই বেশি হচ্ছে মনে হচ্ছে!

হঠাৎ অনামিকা এক কাণ্ড করে বসলেন। প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, তুমিও এই কথা বলছো? আমার ভেতরটা বুঝতে পারছো না?

সুরঞ্জন আর একটু দাঁড়িয়ে বললেন, বুঝতে পারছি বলেই তো বললাম! দ্যাখো, এসে দাঁড়ালেই দেখবে সব ভাবনা চলে যাবে। যেই সে 'মা এসে গেলাম' বলে দাঁড়াবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সব ঠিক হয়ে যাবে।

বেঠিকটা আবার কী? আমার কী খোকা বরাবরের জন্যে এসে পড়ছে বলে আহ্লাদ হচ্ছে না? সত্যি এমন কখনো হবে ভাবনায় ছিলো না বলেই বিশ্বাসে আসছে না। আর লোকে কী ভাববে ভেবেই—

তা সত্যি, ওইটাই যেন এখন প্রধান ভাবনা হচ্ছে, লোকে কী বলবে? 'চাকরী খুইয়ে ফিরে এসেছে—' এই নয় কী?

চাকরী খুইয়ে আসা!

যেন বিরাট মাপের যে গ্যাস বেলুনটাকে নিয়ে আকাশে ওড়াওড়ি করিয়ে দেখানো হচ্ছিলো, সেটা হঠাৎ ফুটো হয়ে গিয়ে চুপসে যাওয়া।

নাতি নাতনীকে প্রথম দেখবেন বলে, 'মুখদেখানি' হিসেবে অনামিকা যে দুটি সোনার জিনিস মনে মনে ঠিক করছিলেন, সেই খোকারই পাওয়া ছোটবেলার একটু সরু বিছেহার, আর একখানা গিনি। সে দুটোকে যে আলমারী থেকে বার করে হাতের কাছে এনে রাখতে হবে। তা ভুলে গিয়ে ভাবতে থাকেন, অন্য পাঁচজনকে এক্ষুণি সে কথা বলবার দরকার কী? এখন ওই বরাবরের জন্যে চলে আসাটা চেপে গেলেই তো হয়। পরে বললে হবে, আমরা কিছুতেই ছাড়তে চাইছি না বলে, খোকা চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চিঠি লিখে দিয়েছে, সেই ওর সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারের অফিসকে।

বিলেত আমেরিকাকে এতো দূর দেশ মনে হয় না। ওকে জেনে জেনেই নিকট হয়ে গেছে। কিন্তু খোকার এই অফিস? এ একদম অজানা অচেনা বলেই মনে হয় বহুদূর। সেই দূরত্বের মনোভাব নিয়েই ইদানীং ভেবে আসছিলেন—হয়তো আর দেখা হবে না। কিন্তু এ যে আবার উল্টো ঘটনা। এক পশলা বৃষ্টি চাওয়ার ফলে বন্যার স্রোত! যাক, আপাততঃ এইভাবেই মান-সম্মান বজায় রাখা হবে!

কিন্তু তারপর?

যখন সেই খোকা এসেই উৎফুল্ল হাস্যে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, 'মা! এসে গেলাম।' সেই সব বানানো কথা ভেসে চলে গেলো, সেই প্রবল আনন্দের উছলে ওঠা কান্নার গলায় বলে উঠলেন অনামিকা, এসেছিস? আর আমাদের ছেড়ে চলে যাবি না তো বাবা? কথা দিয়েছিস! মনে থাকে যেন।

খেয়াল করেন না খোকার আশে পাশে পাড়ার কিছু লোকজন।

তারা সুরঞ্জনকে ছেলেকে নিয়ে আসবার জন্যে বেরিয়ে যেতে দেখেই অপেক্ষা করছিলো! তবে অনামিকার অসাবধানতাতেই যে তাঁর চতুর চিন্তাটি ফেল মেরে গেলো, তাতো নয়। স্বয়ং তাঁর খোকাই সোৎসাহে সব্বাইকে বলতে বলতে আসছে, 'চলে এলাম। বরাবরের জন্যে চলে এলাম। চিরকালের জন্যে কি দেশছাড়া হয়ে থাকবো নাকি?'

* * *

তারপর?

তারপর তো সেই আলোর ঝরনা, সুরের ঝঙ্কার, আকাশের চাঁদ মাটিতে নেমে আসা।

একটা মুখে কী করে যে একসঙ্গে একশোটা কথা কইছেন অনামিকা সেটাই আশ্চর্য! অলৌকিকের মতই।

তবুও তো যেন কিছুই বলা হয়ে উঠছে না। কাকে ফেলে কার সঙ্গে কথা কইবেন অনামিকা? কোন্ কথাটা রেখে—কোন্ কথাটা?

ওরে খোকা! এ কী সুন্দর সুন্দর ছেলে মেয়ে রে তোর? এ যে দেবদূত আর দেবকন্যে! তুইও--ছেলেবেলায় খুব সুন্দর ছিলি, সবাই 'আহামরি' করতো—কিন্তু ছেলে তোকেও ছাপিয়েছে—।

ছাপিয়েছে যে সেটা সত্যি, আর তার প্রকৃত কারণ স্বাস্থ্য। নাঃ, এমন মোমের মত নিটোল হাত পা ছিলো না অনামিকার খোকার। এমন গোলগোল পা, এমন চমৎকার রেশমের মতো চুল, আর স্বাস্থ্যে ফেটে পড়া গাল। তিন বছরের ছেলের মাপ যেন পাঁচ বছরের মতো। এমন ছিলো না খোকা! আর চুল? রেশমের মতো যে চুলটি ছিলো, পারিবারিক নিয়মে আঠারো মাস বয়সে ন্যাড়া করা বাবদ, যেগুলি বিসর্জন দিতে হয়েছিলো। তার পরে কিন্তু আর তেমনটি হয়নি।

ছেলেকে ডেকে কথাটা বলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, ওই 'দেবদূত দেবকন্যার' ক্রেডিটটা একা ছেলেকেই দেওয়া বোধহয় সমীচীন হলো না, তাই তৎক্ষণাৎ বলে উঠেছেন, তা বলবোই বাবু বৌমা তোমাকে, একা বিদেশ বিভুঁই তবু ছেলে যত্ন করতে শিখেছ বটে।'

পরক্ষণেই—'ওগো শুনলে, শুনলে খোকার মেয়ে দিব্যি বাংলা কথা বলছে—আহা তা বললে হয় না। দেশের মধ্যে দিল্লী—বম্বে থেকেই মা বাপ ছেলেমেয়েকে বাংলা কথা শেখায় না। বৌমা আমার সুবুদ্ধিমতী। কী বাংলা বললো? শুনলে না? বললো—'প্রণাম হই ভালোবাসার ঠাকুমা।' বেশ করেছো বৌমা ঠাকুমা শিখিয়ে! 'দিদি দিদান দিদু দিদাই দিদুভাই' এই সব এক ঘেয়ে আহ্লাদেপনা ডাক শুনে

শুনে কান পচে গেছে। এই চিরকেলে সাবেকি ডাকটি তো আর শুনতেই পাওয়া যায় না। তাছাড়া 'দিদা দিদু' সবরকম সম্পর্কেই হতে পারে, কিন্তু 'ঠাকুমা' মানেই বাবার মা। স্রেফ পিতামহী!'

আবোল তাবোল অনর্গল এই বাক্যস্রোতের মাঝখানে অপর কেউ কথা বলবার ফাঁকই পাচ্ছে না। তবু ওর মধ্যেই মালতীর মা এসে কিছু বলার চেষ্টা করে। অনামিকা বলে ওঠেন, 'তোমায় তো পাখিপড়া করে সব শিখিয়ে রেখেছি মালতীর মা। আবার কিসে ঠেকছে? তুমি পুরনো লোক সবই তো জানো?

'পুরনো লোক' শব্দটার ওপর জোর দেন অনামিকা, যাতে না ধরা পড়ে যায়, আজই ওকে ডেকে এনে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে বছর আষ্টেক বাদে।

খোকা বৌ নিয়ে বিদেশ পাড়ি দেওয়ার পরও বছর দুই ওকে রেখেছিলেন অনামিকা, ছেলে ছুটিতে এসে যাবে। অতঃপর যখন জানলেন, পাঁচ বছরে 'চুক্তি'বদ্ধ কাজের মধ্যে এমন বড় কোনো ছুটি নেই, যাতে দেশে ঘুরে যাওয়ার খরচ আর হ্যাঙ্গামা পোষায় এবং মন ওঠে। কাজেই হতাশ হয়ে জবাব দিয়েছিলেন তাকে।

তারপর তো সেই পাঁচ বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনর্চুক্তি। মাঝখানে ফাঁকটা এতো কম যে, সেই একই প্রশ্ন। কিন্তু ছেলের বৌ যেন না বুঝে ফেলে, আজই এসেছে ওই রাঁধুনীটি। আপাততঃ নানা বর্ণের আবেগতাড়িত অনামিকা বেশি ক্ষেত্রেই বোকামি করে বসছেন। যার মূল উৎস হচ্ছে দিশেহারা ভাব!

সুরঞ্জন একবার বলে ফেলেন, পাখি পড়াবার আর সময় পেলে কোথায়? যাও না একবার রান্না ঘরে গিয়ে দেখেই এসো না!

অনামিকা বলে ওঠেন, যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। জানি যেটি না দেখবো, সেটি ঠিক মতো হবে না।

আর সেই সময় অনামিকার খোকা একটি বোমা ফাটিয়ে বসে, তোমার এ অবস্থা জাস্ট আজকের রাতটা পর্যন্ত মা। কাল সকাল থেকে দেখো তোমার আর তাকিয়ে দেখতে হবে না। শুধু আমার সঙ্গে গল্প করবে, আর নাতি নাতনীদের নিয়ে আমোদ করবে।

কাল সকাল থেকে।

অনামিকা একটু থতমত খেয়েই সামলে নিয়ে বলেন, কী? কাল থেকেই সংসারটাকে তোর বৌয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আরাম করবো?

কেন নয়? এতোদিন একা কষ্ট করছো?

ছেলের এই ভালোবাসাভরা কথাটা কী খুব পছন্দ হয় অনামিকার? উত্তরটা শুনে সেটা তো মনে হয় না। প্রায় নীরসভাবেই বলেন, ঘোড়া দেখেই খোঁড়া হবো? নতুন বৌটাকে খাটাতে বসবো? এমন শাশুড়ী পাওনি তুমি আমায় বাবা!

নতুন বৌ? হা হা হা! ও লিলি, মা কী বলছে শুনছো? 'নতুন বৌ!' দেখেছো একবার বৌটির দিকে তাকিয়ে?

তা দেখেছেন বৈকি অনামিকা। বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দেখে নিয়েছেন। দশ বছর আগে রাজ্য তোলপাড় করে খুঁজে ছেলের জন্যে যে, 'সরস্বতী ঠাকুরটির' মতো বৌটি এনেছিলেন অনামিকা, আর ওই আনার গুণে ধন্যি ধন্যি পেয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন, সেটি এখন প্রায় সরস্বতী জননী দেবী দুর্গার

মতই ভরাট ভরন্ত হয়ে গেছে।

তাহলে সমীহ আসে।

তা বলে সমীহ করতে বসবেন নাকি অনামিকা? তা হয় না। তাই স্নেহ বিগলিত গলায় বলেন, তোর কাছে না হোক, আমার কাছে তো নতুন বৌ! সেই অষ্টমঙ্গলার কনেটিকে পাঠিয়েছিলাম, একটু আদর যত্ন করবার সময় পেয়েছি?

আরে বাবা 'কালক্রম' বলে একটা কথা নেই? সেই যে জ্যেঠুর মুখে ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, 'কভু পিতা পুত্র হয়, পুত্র হয় পিতা।' সেটাই ঠিক। এখন যত্ন আদরটি তোমার প্রাপ্য! খুব করিৎকর্মা আছে তোমার বৌমা, ম্যানেজ করে ফেলতে দেরি হবে না। অবশ্য তোমার পদ্ধতিটা শিখিয়ে দেবে। আর এই লিলি, কী বলে রেখেছি মনে আছে তো? মায়ের কাছে সমস্ত সাবেক রান্নাটান্নাগুলো শিখে নেবে। উঃ। মাংস খেতে খেতে জীবন গেছে। এখন মাংস-ফাংসর নাম করতে ইচ্ছে করে না!

সুরঞ্জন বলেন, কেন? মাছ কী একেবারেই পাওয়া যায় না ওখানে? কোনো-রকম?

একেবারে যায় না, তা বলবো না। তবে সে ঠিক আমাদের কেনার মতো নয়। যদিও বা নামে এক হলো তো স্বাদে অন্য রকম। আমার বক্তব্য হচ্ছে—স্রেফ আমাদের পিসিমার রান্না ঘরে ফিরে আসা! সেই আমাদের পুরনো বাড়িতে পিসিমার রান্নাঘর থেকে যে রকম সব ভালো ভালো গন্ধ নাকে আসতো, সেগুলো স্মৃতিতে ভরা আছে। তাদেরকে রূপে ধরা দেওয়াবার চেষ্টা করা হোক। সেই সব পোস্ত চচ্চড়ি, সুক্ত, ঘণ্ট মোচা, চালতার চাটনি নারকেল কী যেন—কুমড়ো নারকোল তাই না না? আর—

সুরঞ্জন বলেন, আরেব্বাবা তোর তো সব মুখস্থ আছে দেখছি। আমিই তো ওসবের নাম ভুলে গেছি।

কেন? ওসব খাও না? সহ্য হয় না, না কী?

সহ্য হয় না? হা হা হা জুটলে তো? তোমার জননীর তো সোজা জবাব—দুজনের জন্যে আবার অতো হ্যাংগামা!

তাই বুঝি? মা? কী কাণ্ড! আচ্ছা—এখন তো পাঁচজনের জন্যে? অতএব ওই চালাও। রাঁধতে ভুলে যাওনি তো? আচ্ছা করে শিখিয়ে দেবে তোমার বৌমাকে।

অনামিকার হঠাৎ মনে হয়, এ সবই খোকার বৌকে নিয়ে আদিখ্যেতা মাত্র! বৌয়ের দায় পড়েছে ওসব শিখতে। এ হচ্ছে বৌ নিয়ে মা বাপের সামনে আদিখ্যেতা।

এখন বলেন, আচ্ছা আচ্ছা। শিখবে। তার আগে ওকে একটু জিরোতে দেতো। অতো ভয় খাইয়ে দিসনি।

লিলি তার দুর্গাপ্রতিমার মতো ভরন্ত মুখের একটি কোণায় টোল খাওয়া হাসিটি হেসে বলে, বাঃ। আমায় বুঝি তেমনি ভীতু মেয়ে ভেবে রেখেছেন? মোটেই ভয় খাচ্ছি না। আমিও তো তাই চাই। খাওয়া পরা প্রতিটি ব্যাপারে আমরা যে ক্রমেই আমাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছি, এটা আমায় খুব ভাবায় মা! ধরুন, আমরা বাঙালি মেয়েরা দেখেই তো গেছি এখানে 'চাইনিজ ডিশ' রাঁধতে না জানাকে খুব লজ্জার ব্যাপার মনে করি, সারা পৃথিবীর রান্নাঘরের রেসিপি জড়ো করে করে আমাদের রান্নাঘরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাই, কিন্তু কটা চাইনিজ মেয়ে আমাদের

'সুক্ত ঘণ্ট সর্ষে ইলিশ কৈপাতুরি' রাঁধতে শেখার কথা ভাবতে পারে? একটাও না। মনেও আনে না, নিজস্বতা বিসর্জন দিয়ে অন্যদের ফ্যাসান নেবো।'

সুরঞ্জন উৎসাহিত ভাবে বলেন, বারে। বৌমা তুমি—এই বয়েসেই তো বেশ ভাবতে শিখেছো! চীন জাপান ছেড়ে দাও—এখানেই কটা অবাঙালি মেয়ে বাংলা রান্না শেখাতে উৎসাহী? অ্যাঁ। অথচ বাঙালি মেয়েরা সমস্ত প্রদেশের পাকপ্রণালী নিজের রান্নাঘরে জড়ো করে করে, নিজেদের চিরকালীনগুলো ভুলে যেতে বসেছে। অথচ দক্ষিণ ভারতীয়রা ইড্‌লি ধোসা এখনো সমান নিষ্ঠায় আঁকড়ে ধরে আছে। সারা ভারতবর্ষ—

অনামিকা বলে ওঠেন, বাঃ। তুমিও বৌমার সঙ্গে তাল দিয়ে বাঙালি মেয়ের সমালোচনা করতে বসলে, ওদের একটু ফ্রেশ হতে দাও, খেতে দাও।

আরে বাবা, ওরা ঠিকই ফ্রেশ আছে? একী আর সেই আমাদের আমল? রেল-গাড়িতে গুড়ের নাগরী ঠাসা হয়ে ফেরা হলো তক্ষুণি চান না করতে পেলে বিষম অবস্থা! মনে আছে একবার পিসিমাকে নিয়ে বেনারস ঘুরিয়ে আনার পর—

ওঃ। এখন আবার আদ্যিকালের গল্প শুরু করতে বসলে? বলি—খাবেও তো?

দেখছিস খোকা? তোর মায়ের ব্যবস্থা? নিজে যে ওরা আসা মাত্রই কথার রেলগাড়ি চালিয়ে চলছিলে—তার বেলা?

খোকা হো হো করে হেসে বলে, তোমরা দুজনে সারাক্ষণ এইরকম ঝগড়া করেই কাটাও বুঝি? ভালো ভালো!

অনামিকা বলেন, হ্যাঁ সারাক্ষণ ঝগড়া করে কাটাই! কাজ নেই যেন?

হঠাৎ খোকার বৌ লিলি একটু হেসে ফেলে বলে ওঠে, দুজন মানুষের বাড়িতে দুজন 'কাজের মেয়ে—' কতই আর কাজ মা? অন্য দেশে এরকম ভাবতেই পারে না!

অনামিকা থম্‌কে যান। তাঁর এত ভেবেচিন্তে সৌষ্ঠব সৃষ্টি করার বিনিময়ে এইটি লাভ হলো?

হঠাৎ কেমন মিইয়ে গিয়ে বললেন, আসলে পুরনো লোক, ছাড়তে মায়া হয়। সব জানেটানেও তো।

বলেই আবার সহজ হবার চেষ্টায় ডাক দিয়ে ওঠেন, ও মালতীর মা, মলিনাকে বলেছো, টেবিলে চায়ের সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে রাখতে। আর তোমায় যা বলেছি মনে আছে তো? চায়ের জল চাপিয়ে, তবে কচুরি কটা ভাজবে। আগে থেকে যেন ভেজে ফেলো না।

যদিও বৌমের হাসির হুল্‌টিতে দমে যান, একটু তবু অনামিকা গলার স্বরে সেই দৃঢ়তাটি আনতে চেষ্টা করেন, দু'দুটো কাজের মেয়েকে চরানোই তাঁর অভ্যাস!

* * *

মরা গাঙে বান!

সুরঞ্জন আর অনামিকার সংসারে এখন সর্বদা জনস্রোত। আত্মীয়জন তো বটেই পাড়াপড়শীরাও আবার নতুন কৌতূহলে এই পুরনো সংসারটাকে দেখতে আসে, এবং যা দেখে যায়, তা নিয়ে আলোচনায় মুখর হতে থাকে।

'চাকরি কী আর অমনি ছেড়ে দিয়ে এসেছে? টাকার পাহাড়টি জমিয়ে নিয়ে

তবেই এসেছে। দেখেছেন তো—বুড়ো মা বাপকেও পাঠাতো বলে মনে হতো না। তাছাড়া—এখন তো সোনা নিয়ে আসা আর নিষিদ্ধ নয়; ওখানের সস্তা সোনা প্রচুর নিয়ে এসেছে এখন এখানে—'

শুনলাম নাকি কিসের একটা কারখানা খুলবে!

'না না, কে বলেছে? শুনলাম যে টাটায় নাকি একটা বিরাট চাকরির ব্যবস্থা করে তবেই চলে এসেছে।'

'শুনেছি, ভেতরের লোকের কাছেই শুনেছি।'

তাহলে তো আরো ভালো। এখানের এখন যা অবস্থা, চালু কারখানাগুলোই তালা ঝুলিয়ে বসে আছে। নতুন কারখানা খোলা? আহাম্মুকী মাত্র। আমায় যেন বলছিলো কিসের যেন কারখানা...

...হতে পারে হয়তো সেটাই পরিকল্পনা ছিলো—তবে এখানের অবস্থা দেখে—আহা 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—'

.. ও মশাই দেখছেন? আমাদের সুরঞ্জনবাবুর ছেলেটি বোধহয় আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে এসেছে। আসা মাত্রই কণ্ট্রাক্টার লাগিয়ে বাড়ির তিনতলা তুলছে—

তা না তুললে চলবে? শুনলাম তো প্রচুর জিনিস এনেছে। সে সব ধরাবে কোথায়? মানে বাড়ির মেয়েরা বলছিলো, এ যুগের ফ্যাসানের সংসারের দরকারি হেন জিনিস নেই, যা আনেনি। ক্যামেরা, কালার টি. ভি., ভি. সি. আর,, ভি. ডি, ও, বিরাট ফ্রীজ, ওয়াশিং মেসিন, রুম হীটার আরো কত কীই যেন বললো!

কাঁচা পয়সার ব্যাপার। বুঝলেন? কিন্তু এতো সব আনলো কী করে?

...আনবে না কেন? ব্যবহার করা জিনিস সব আনা যায়। নতুন আনতে হলেই—

না বলছিলাম কী—এয়ারে আসা তো? এতো সব—

...সব ব্যবস্থাই আছে মশাই! টাকা থাকলে কোনোখানেই পথে খোয়া পাথর নেই। সবই পীচ্ ঢালা রাস্তা!

তা কথাটা সত্যি, বিস্তর জিনিস এনেছে শুভরঞ্জন। তার এই দশ বছরের নানা শহর বদলে বেড়ানো চাকরি জীবনে সংসার করবার উপযুক্ত এতো জিনিসও এনেছে! তবু সব প্যাকগুলো তো এখনো খুলতেই পারা যায়নি, পেরেক ঠোকা প্যাকিং বাক্সের মধ্যেই আছে এখনো। তাদের মধ্যে নাকি রান্নাঘরের যাবতীয় বাসনপত্র সাজসরঞ্জাম বন্দী হয়ে আছে।

অনামিকার পুরনো বাড়ির জ্ঞাতিদের মধ্যে সংসারেই প্রথম ঢুকেছিল 'প্রেসার-কুকার, ইলেকট্রিক টোস্টার' (অনেকদিন যাবৎ খারাপ হয়ে আছে অবশ্য) মশলা পেষা 'মিক্সার'...তাতেই অনামিকা রীতিমত গৌরববোধ করেছিলেন, তবে ইদানীং আর তাদের 'ব্যবহার' হচ্ছিল না এই যা।

টি ভি-ও তো তাঁর ঘরেই প্রথম আসে। এখন অবশ্য হাল পালটে গেছে সকলেরই, তবু অনামিকা নিজেকে ওদের থেকে বিশিষ্ট ভাবতেন। মানে জ্ঞাতি জা ননদদের। কিন্তু সেসব কী ঝটপট হয়েছে? কতো আবেদন নিবেদন করে, কতো কাঠ খড়

পুড়িয়ে—কিন্তু অনামিকার ছেলের বৌ তার মাত্র দশ বছরের সংসার জীবনে—এতোটি হয়েছে। কিন্তু হয়েছে তো অনামিকারই খোকার ক্যাপাসিটিতে! তাহলে? এতে তো অনামিকারই গৌরব। ছেলের বৌয়ের কাছে বাহাদুরি দেখাবার কথা, 'দ্যাখো ছেলেটি কেমন মানুষ করেছি?'

এই রকম একটা ভাব নিয়ে মনে উল্লসিত আহ্লাদের ভাব আনতে চেষ্টা করেন অনামিকা, কিন্তু বারেবারেই সে উৎসাহ যেন স্তিমিত হয়ে আসে। গভীর অবচেতনে কেমন যেন একটা শূন্যতাবোধ।

আনন্দে আছেন সুরঞ্জন।

তিন বছরের নাতিটিতো গলার হার, দাদুকে সে এতো ভজেছে যে, মাকে বলে 'তোমার কাছে ঘুমোবো না, ঠাকুন্দার কাছে ঘুমোবো!'

আর সাত বছরের মেয়েটা?

সেও 'ঠাকুমার' থেকে বেশি ঠাকুন্দাকেই। 'ঠাকুন্দা, তোমার মা কীরকম দেখতে ছিলোগো? তোমার মায়ের একটাও ছবি নেই কেনগো? ঠাকুন্দা, তুমিও বাপীর মতো অফিস যেতে? তখন কী ড্রেস করতে? ঠাকুন্দা, এখানে একটাও ভালো পার্ক নেই কেন? পার্কের দোলনাটা কী বিচ্ছিরি গো—'

আবার তক্ষুণি সামলে নিয়ে চুপিচুপি বলে, ও ঠাকুন্দা মামণিকে যেন বলে ফেলোনা 'বিচ্ছিরি' বলেছি। মামণি বলে দিয়েছে নিজের দেশের কিছুকে 'বিচ্ছিরি' বলতে নেই! আমাদের দেশ নাকি গরীব দেশ, তাই বেশি ভালো হয় না। আচ্ছা ঠাকুন্দা মানুষই তো গরীব হয়, 'দেশ' আবার 'গরীব' হয় কী করে?

সেই বিচ্ছিরি পার্কেই বসে গল্প চলে। একজন বক্তা, আর অপরজন শুধু ছোটখাটো উত্তর দিয়ে চলা শ্রোতা!

পাড়ার আরও কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি আসেন, আর সুরঞ্জনের নাতনীর অবলীলায় বাংলা বলা শুনে মোহিত হন।

হ্যাঁ তাই হন তাঁরা। বাঙালির মেয়েকে বাংলা কথা বলতে শুনে মোহিত হন।

পাড়ার মহিলারাও বিগলিত হন সুরঞ্জনবাবুর ছেলের বৌয়ের গুণপনায়।

'নিজে তো পুরো বাঙালি হয়েই আছে, আবার ছেলেমেয়ে দুটিকে তেমন তৈরি করছে দ্যাখো। শুনলে আশ্চর্য হবে, দু তিনটি দিব্যি চমৎকার রবীন্দ্রসংগীতও শিখিয়েছে মেয়েকে। বলে. আশ্চর্যের কী ভাই? আমি তো গীতবিতানের ছাত্রী ছিলাম। কোর্সটা শেষ হতে না হতেই বিয়ে হয়ে গেলো।'

এ এক অদ্ভুত আলোচ্য বিষয়।

একটা বাঙালির মেয়ে বছরকয়েক অন্য একটা দেশে বাস করে এসেছে, এই সূত্রে সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হচ্ছে তার বাঙালিয়ানা দেখে।

তা' অভিভূত না হয়ে তো পারাও যায় না।

কারণ আজকের মেয়েরা তো পশ্চিমী হাওয়ায় পাল তুলে পানসি ভাসিয়ে, আচারে আচরণে, সাধনে প্রসাধনে যেন 'বাঙালিয়ানামুক্ত' হতে বসতেই বদ্ধপরিকর।

আর এ মেয়েটা বলে কিনা, 'কী আশ্চর্য! বাঙালির মেয়ে বাংলা কথা বলবে না?'

নিজেকে 'বাঙালির মেয়ে' বলাটা যে এই প্রজন্মে ক্রমশঃই লজ্জার হয়ে যাচ্ছে,

'সেকেলে' হয়ে যাচ্ছে, 'অনগ্রসরতা' বলে গণ্য হচ্ছে, তা' খেয়াল না করে বলছে কিনা —'আচ্ছা বলুনতো—কোনো বিদেশী যদি কাজের জন্য বছরকয়েক ভারতে বাস করতে বাধ্য হয়, তাহলে তাদের ভারতে জন্মানো—শিশুরা মাতৃভাষা শেখে না? তাঁদের মা বাবা ভারতীয় ভাষা শিখে ফেলে নিজেদের ঘরে সংসারে সেই নতুন ভাষাতেই কথা বলাবলি করে—নিজের মাতৃভাষা ছেড়ে? পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, মা বাবা যদি বাড়িতে নিজের ভাষায় কথা বলে, আর ছেলেমেয়েকে সেই ভাষা শেখাবার জন্যে যত্ন নেয়, তাহলে সেই বাচ্চাদের তো মাতৃভাষা না শেখবার কোনো কারণ নেই।'

সকলেই শুনে ধন্যি ধন্যি করে। কিন্তু অনামিকার যেন মনে হয়, কথাগুলো যেন বেশি বড়ো বড়ো! অনামিকার জীবনের পরিধির মধ্যে কখনো ঠিক এ ধরনের কথা এসে হাজির হয়নি। 'এখনকার মেয়েদের' সমালোচনা হতে শুনেছেন বিস্তর। তাঁদের সেই—উত্তর কলকাতার পুরনো বাড়ির পাড়ার গিন্নীমহলে তো কেবলই ওই ধরনের কথারই চলন হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে 'জাতীয়তা', 'স্বকীয়তা' 'মাতৃভাষার মহিমা' ইত্যাদি শব্দকে আবার কবে দেখা গিয়েছে?

অনামিকার যেন মনে হয় বৌ তাঁর নাগালের অনেকটা উঁচুতে!

অথচ তার সমস্ত আচার আচরণ তো একেবারে অতি সহজ সাধারণ! এ বৌ অনায়াসে মালতীর মা বা মলিনাকে কাছে বসতে দিয়ে তাদের জীবনের সুখদুঃখের কথা শোনে, তাদের জন্যে সাহায্যের হাত বাড়ায়।

এসেই বলেছিলো বটে, 'বাবাঃ! দু'দুটো কাজের লোক! রান্নার জন্যে আবার লোক কেন মা? আমরা বুঝি রাঁধতে পারি না? আমি, আপনি? নিজে হাতে রান্না করে বাড়ির লোককে খাওয়ানোয় কতো আনন্দ, তা বলুন?'

অনামিকার অবশ্য তখন নিজের মানমর্যাদা রাখতে বলতে হয়েছিলো, 'আব বোলো না বৌমা! তোমার শ্বশুরের বাতিকের জ্বালাতেই, রান্নার লোক রাখা! আমার চোখ খারাপ 'এই সব ছুতো।'

বানিয়ে কথা বলার আর্টটা যেন ক্রমেই বেশ শিখে ফেলছেন অনামিকা!

বৌমা বলেছে, তা সেটা অবশ্য সত্যিও। আপনার ছেলেও তো কেবলই বলেছেন, 'মা বেচারী চিরকাল খেটে খেটেই সারা। আগে—পুরনো বাড়িতে—কী বিশাল সংসার ছিলো, বাবাঃ। সারাদিনে একটুও মাকে কাছে পেতাম না! তাই ছেলেবেলায় ভাবতাম—বড় হলে অনেক টাকা হলে, মাকে রানীর মতো বসিয়ে রাখবো!'

শুনে অবশ্য আহ্লাদে আনন্দে পুত্রগৌরবে চোখে জল এসে গেছে অনামিকার। বলেছেন, 'ওটা একটা পাগল।'

কিন্তু তারপরই বৌ যখন বলেছে, 'আমিও তাই ওকে বলে রেখেছি, 'দেখো তোমার মাকে আমি কিন্তু খাটতে দেব না, রানীর মতই বসিয়ে রাখবো' তখনই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে! মনে হয়েছে, এ যেন কৌশলে দুর্গ দখলের চেষ্টা!

তবে লিলি শেষমেষ আবার বলেছে, 'যাকগে বাবা থাকুক আপনার মালতীর মা। কারো অন্ন মারার কারণ হতে চাই না বাপু! তবে ভালো ভালো রান্না টান্না কিন্তু আমিই করবো মা! রান্নায় আমার খুব শখ!'

তা'হলে কি করেই বা বলা যায় এ হচ্ছে দুর্গ দখলের চেষ্টা?

এরকম কোনো কোনো সময় শুভরঞ্জন যদি এসে পড়ে, অমনি বলে ওঠে, কী? মায়ের কাছে বসে আমার নামে অপবাদ দেওয়া চলছে বুঝি?

লিলি সোৎসাহে বলে, চলছেই তো! উঃ আসার আগে তুমি সর্বদা তোমার মায়ের নাম করে করে কী শাসানোটা শাসাতে আমার মনে আছে? 'মা এই পছন্দ করেন না, মা ওইটা পছন্দ করেন না! মা এই রকমটি ভালোবাসেন, মা সেই রকমটি ভালোবাসেন' উঠতে বসতে এইসব। ভয় জন্মিয়ে দিয়েছিলো একেবারে। অথচ এমন ভালো মা! সত্যি মা আমি তো এসে আপনাকে দেখে অবাকই হয়ে গেছলাম। ওমা এমন মিষ্টি এমন সুন্দর দেখতে 'মা মা' ভাব ভরা মানুষটিকে নিয়ে অতসব বলেছে কেন 'লোকটা'! হি হি লোকটা বললাম বলে রাগ করবেন না মা। 'ছেলেটা' তো আর বলতে পারি না। সত্যি ভাবতে ভাবতে এসেছিলাম খুব একজন জাঁদরেল গোছের মহিলাকে দেখবো। যেমন ছিলেন আমার মামী। তাঁকে ভীষণ ভয় পেতাম। তবে মনে ঠিক করে এসেছিলাম এখানে 'মাকে' কিছুতেই ভয় পাবো না। নিজের জ্ঞান হয়ে চক্ষে দেখিনি, 'মা' ডাকটি কখনো ডাকতে পাইনি। এখানে যখন সে ডাক ডাকতে পাবো, তখন 'ভয়'কে কাছে আসতে দেব না। দেখি আমার কাছে তিনি কেমন ভীতিকর হয়ে ওঠেন। দেখেই তো ভয়ের লেশও উপে গেলো ভালোবাসা এসে গেলো। তাহলে ওই আপনার ছেলেকে অপবাদ দেব না?

শুভরঞ্জন হেসে হেসে বলে, 'ভাগ্যিস ভয়টি জমিয়ে রেখেছিলাম, তাই না এই রেজাল্টটি হলো?'

অনামিকাও হেসে ফেলে বলেন, 'ছেলেটা চিরকাল ওইরকম দুষ্টু জানো বৌমা। বড় ননদটি ছিলেন খুব দুরন্ত রাগী। অল্পবয়সে বিধবা, চিরকাল বাপের বাড়িতেই বসে। মা বেঁচে থাকতেও সংসারের দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে থাকতেন। আমি অবশ্য শাশুড়ীকে দেখিনি। ওঁকেই দেখেছি। যমের মতো ভয় করতাম। খোকা কী করতো জানো? সবে চান করে ঘরে এসেছি, কী দুপুরে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েই তাড়াতাড়ি উঠেছি, কিম্বা ছাতে উঠে ছাত ভর্তি শুকনো কাপড়-চোপড় তুলে এনে নেমেছি, হঠাৎ দুষ্টুটা চোখ গোল গোল করে চুপি চুপি বলতো কি না, 'মা! আজ তোমার ফাঁসির হুকুম! পিসি অ্যায়সান রেগেছে!' শুনে তো আমার হাত পা ঠান্ডা! গলা শুকিয়ে কাঠ, যতোই বলি, 'হ্যাঁরে কেন রেগে গেছেন?' ততোই হাত উল্টে বলে, 'তা আমি কী জানি?' তারপর আমি যখন প্রায় বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে 'আদালতে'র দিকে যাচ্ছি, তখন হি হি করে হেসে বলতো, 'কলা! কলা! তোমায় ঠকালাম। পিসি এখন কিছুই রাগেনি!' তোর মনে আছে খোকা?

শুভরঞ্জন হো হো করে হাসে, 'খুব মনে আছে! তুমি এমন বোকা ছিলে, যে বারে বারেই ঠকতে।'

'তা সত্যি বৌমা! ও এমনভাবে বলতো, ভয় না হয়ে পারতো না। যদি জেরা করতাম 'সত্যি বলছিস? বানানো নয়?' তখন বলতো, 'ঠিক আছে! বানানো!' বোঝো দুষ্টুমি। মিছে কথা বলা হলো না। অথচ আমার মনে আতঙ্কটি ভরে রাখা হলো! কাঁটা হয়ে ননদের আশেপাশে ঘুরে আর মন জুগিয়ে জুগিয়ে চলে, যখন তাঁর মুখে একটু প্রসন্নতার ভাব দেখতাম, তখন ধড়ে প্রাণ আসতো! আর তখন যদি বলতাম, খোকা, তুই আমায় মিছিমিছি ভয় খাইয়েছিলি—হি হি করে হেসে বলতো,

'আমি তো তখনি স্বীকার করলাম বানানো!' বোঝো?

শুভরঞ্জন উল্লসিত গলায় বলে, আর একদিন কেমন পালে বাঘটি পড়েছিলো? মনে আছে?

অনামিকা বলেন, হ্যাঁ রে কী যেন একদিন হয়েছিলো, সে একেবারে কুরুক্ষেত্র কান্ড! তবে কারণটা ঠিক মনে নেই। আমি ভেবেছিলাম, খোকা তো অমন বলেই। বাজে কথা। কই খুব রেগে যাবার মতো কী করেছি? তাই সহজ হয়ে বলতে গেছি 'দিদি, আজ কী ডাল চড়ানো হবে?' সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত!

শুভরঞ্জন বলে, 'মনে হচ্ছে তুমি বোধহয় ছাত থেকে পিসির বানানো আচার না বড়ি কী যেন তুলতে ভুলে গেছলে, বৃষ্টি পড়ে ভিজে গেছলো!'

লিলি অবাক হয়ে বলে, কিন্তু বাড়িতে তো আরো অনেক বৌ ছিলেন? তাঁরা কেউ কোনো কাজটাজ করতেন না?

শুভরঞ্জন বলে, তা করবেন না কেন? পিসির সংসারে কারো রেস্ট্ নেবার জো ছিলো নাকি? তবে আমার মার অপরাধ, তিনি বড় বৌ! অতএব দায়িত্বটা সব তাঁর! সময় হয়নি তো অন্যকে দিয়ে করাননি কেন? এই নিয়ে তুমুল বকুনি। আসলে—কারণটা যে—'মনে না থাকা', কাজেই অন্যকে দিয়ে করানোর প্রশ্ন আসে না, সেটা কে বোঝাবে?

লিলি একটু নিশ্বাস ফেলে বলে, মানুষ যে কেন ইচ্ছে করে নিজেকে ভীতিকর করে তুলে সুখ পায়।

শুভরঞ্জন বলে, 'নিজেকে প্রীতিকর করে তোলবার মতো সঞ্চয় ভেতরে থাকে না বলে। অথচ 'সুখ'টা দরকার!

লিলি বলে, 'মামী অনেকটা ওই ধরনের ছিলেন। বলা উচিত নয়, মা মরা মেয়েটাকে মানুষ করবার দায়িত্বটা তো নিয়েছিলেন। তবে সেই দায়িত্বটা তাঁর ঘাড়ে চাপানোর দায়ে মামা যেন তাঁর কাছে সবর্দা 'চোর' হয়ে থাকতেন! মামা আর আমি দুজনেই সর্বদা কাঠগড়ায়। তাই বা বেশিদিন রইলেন কই? হঠাৎ একদিন রাগারাগি করতে করতে স্ট্রোক হয়ে—তখন আমার বিয়ের কথা চলছে, মামার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে—একটু থেমে বলে, এখন বুঝতে পারি হাই ব্লাড-প্রেসারের রোগী ছিলেন! আপনার ওই ননদটিও হয়তো তাই ছিলেন। আগে তো মেয়েদের বেলায় অতো দেখাটেখা হতো না—

অনামিকা হঠাৎ হেসে উঠে বলেন, 'ষাটষাট! ষষ্ঠির দাস!' 'ছিলেন' কী গো? এখনো তো তিনি 'আছেন।' তবে আগের মতো তেমন খোশমেজাজে, দাপটের সঙ্গে নয়। এখন নাকি আর তাঁকে কেউ তেমন মানেটানে না। আসলে—এখন তো সব ভাগ ভাগ হয়ে গেছে! একখানা আস্ত সংসার নয়। কে কার কড়ি ধারে?

শুভরঞ্জন বলে, 'ভাগ ভাগ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁরে! সবারই আলাদা হাঁড়ি!'

ওই একই বাড়িতেই?

'তাছাড়া আবার কী? আলাদা বাড়ি পাচ্ছেই বা কোথায়? আর তার ভাড়া জোগাবার সামর্থ্যই বা ক'জনের? তাছাড়া—পৈত্রিক বাড়ির হক্ ছাড়বেই বা কেন? তাই সেই বাড়িতেই চারটে হেঁশেল। অথচ বাড়িখানা ভেঙে ধ্বসে পড়ছে। মেরামত

হয় না। ভাগের মা তো? গঙ্গা পায় না।'

শুভরঞ্জন বলে, ভাগ্যিস তুমি ওই 'একবাড়ির মধ্যে আলাদা'র মতো বিশ্রী ব্যাপারটার আগেই কেটে পড়েছিলে।

অনামিকা বিগলিত স্নেহে বলেন, 'সে তোরই বাহাদুরিতে। তোর বাবাতো হাত পা ছেড়ে বসে বলেছিলো, 'জমি একটু কেনা আছে বলেই কী অমনি 'বাড়ি বানাই' বলে লাফানো যায়? আজকের দিনে বাড়ি বানানো কী সোজা কথা?' তুইই জোর দিয়ে উৎসাহ দিয়ে—'

শুভরঞ্জন হেসে বলে, 'এবং তোমার গহনাগুলো দিয়ে—'

ছেড়ে দে ওকথা—কতোই বা গহনা! তবে বাবা বিয়ের সময় গা ভর্তি করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন বটে। একটাই মনের খেদ বৌমার জন্যে শুধু ওই এক-জোড়া অমৃতি পাকের বালা ছাড়া আর কিছুই রাখতে পারা গেল না। সাধ ছিলো সব দিয়ে বৌকে সাজিয়ে আনবো!'

'তোমার বৌমার সাজের কী তাতে কিছু হানি হয়েছে?'

আহা তাই কী বলছি? বৌমার মামাও তো সাধ্য মতোই গা সাজিয়ে দিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া এখন তো আপন ভাগ্যে—

'তাহলে? খেদটা কিসের? সবই হলো, আবার বাড়িটাও হলো! খেদ থেকে যাবার ভয়ে যদি তখন গহনাগুলি না ছাড়তে তো বাড়িটি হতো না।'

'আরে বাবা বাড়ি কী আমার সেই পনেরো ষোলো ভরি সোনাতেই হয়েছে?'

ভিৎটা তো গাড়া হয়েছে। তারপর তো বাবার প্রভিডেণ্ট ফান্ড থেকে। একটা জেদ চেপে গিয়েছিলো, ওই পচা বাড়ি আর পিসির শাসন থেকে তোমাকে উদ্ধার না করে ছাড়বো না! তখনো তো জানা ছিলো না, কোম্পানী আমায় পুলিপোলাও চালান করে দেবে। বাড়িটাই হলো, সাজানো গোছানো তো হলো না।'

'সাজানো না হোকগে, তোরা যে চলে গেলি, সেইটাই বড় যন্ত্রণা গেছে খোকা। কেবল ভেবেছি—ছোট থেকে সাধ ছিলো একটি ছবির মতো বাড়ি, ছিমছাম সংসার নিজের মতো করে চালাবো। ভাগ্যক্রমে বিয়ে হলো বাবা, বলতে নেই একখানি রাবণের পুরীতে। সংসারে শুধুই একটি শ্বশুর নয়। চার খুড়শ্বশুর, আর দুই জ্ঞাতি ভাসুরপো, সবাই সপরিবারে। তোর তো সবাই তুতো—তুই শুধু একলা ছেলে।'

শুভরঞ্জন বলে, আবার তুতোর তুতোও ছিলো। কী করে ধরতো অতো?

সে কী আর ধরা রে? তুইই তো দেখেছিস? যা দেখে অতিষ্ঠ হয়েছিস। তবু তখন তো খুড়শ্বশুররা আমার শ্বশুরের কাছে বাড়ির শেয়ার বেচে দিয়ে নিজ নিজ পছন্দে চলে গেছেন। তুই শুধু তোর নিজের কাকাদের আর ওই জ্যেঠতুতো দাদার সংসারটিই দেখেছিস।

সেও তো এক বিরাট বাহিনী।

সেই তো। সে যাইহোক সেইখানেই তো জীবন কাটলো। নিজের মতো জীবনের স্বপ্নই সার। আর যেই সে স্বপ্ন সফল হতে বসলো, ভাবলাম "এতদিনে সত্যিকার জীবন পেলাম।" সেই তুই চলে গেলি।

আমি চলে গেলাম তো কী? তোমরা তো ছিলে—

'কী যে বলিস খোকা? তুই চলে গেলি সদ্য বিয়ে হওয়া নতুন বৌটি চলে গেলো, আর আমি সুখের স্বপ্ন সফল করতে বসলাম? ধ্যাৎ, এই দশটা বছর কী 'জীবন' বলে কিছু ছিলো? শুধু দিনগত পাপক্ষয় মাত্র। দেখলি তো—এই দশ বছবের মধ্যে বাড়িটায় একবার রঙের পোঁচ পড়েনি। কী হালই হয়ে এসেছিলো।'

শুভরঞ্জন হেসে বলে আবার তো তোমার বাড়িতে রঙের পোঁচ পড়ছে মা। বাড়তি আবার ছাতের ওপর আর একটা তলা। এবার—মনের আনন্দে চিরদিনেব স্বপ্ন সফল করো! আর দূর বিদেশে যাচ্ছি না বাবা।

যেতে চাইলেই বা যেতে দিচ্ছে কে? লিলি বলে ওঠে, আমি বলেছি, আমি বাবা কলকাতা থেকে নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু। যে যাই বলুক, কলকাতা হচ্ছে কলকাতা। ওর আকাশে বাতাসে প্রাণের আরাম। তাছাড়া—বলুন তো মা, কলকাতার বাইরে আমাদের নিজস্ব সমাজ আছে? এই দশ বছরের মধ্যে একটাও বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন খাইনি, একটাও বাংলা সিনেমা দেখিনি, নিজে নিজে গেয়ে শোনা ছাড়া একটাও রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনিনি!

অনামিকা বলে, 'গিয়েছিলেও যে বাবা একেবারে একটি পান্ডব বর্জিত দেশে। লোকে শুনলে বুঝতেই পারে না। তবু গোড়ায় যখন 'লিবিয়া' 'ত্রিপোলী' শুনেছে, বুঝেছে। ইদানীং বলেছো 'মাসকাট?' সেটা আবার কোথায়? নইলে বিলেত আমেরিকায় তো এখন এদেশের মতো সবই আছে। এমন কী দুর্গা পুজো, সরস্বতী পুজোরও সেখানে রমরমা।

'তাহলে বলছো, বিলেত আমেরিকায় চলে গেলেও যেতে পারি?'

অনামিকা রেগে বলেন, 'হ্যাঁ বলছি। চিরকাল এত স্বভাব। কেবল জ্বালানোর তাল।'

মাঝে মাঝেই এমন এক একখানি বৈঠক বসে মা ছেলে বৌ। মাঝে মাঝে বাবাও। এবং অবশ্যই নাতি নাতনী।

হাসি আহ্লাদ, গল্প! তার সঙ্গে শুভরঞ্জনের দুষ্টুমি। একে যদি চাঁদের হাট না বলে তো কাকে বলা হবে?

মাঝে মাঝে লিলির গান শোনা হয়।

সত্যিই ভালো গায়।

শুভরঞ্জন বলে, 'তোমার সেই জাঁদরেল মামীর কব্জা থেকে গানটান শেখবার সুবিধে পেলে কী করে বলতো?'

লিলি বলে, 'কেবলমাত্র মামার ভালোবাসার জোরে। কী করে যে মামীকে রাজী করিয়েছিলেন। কেবল বোঝাতেন গান না শিখলে ভালো বিয়ে হবে না। নির্গুণ মেয়ের বিয়েতে খরচ বেশি হবে।'

বলতে বলতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, 'মামার সঙ্গে আর দেখা হলো না। কতো কষ্ট করে বিয়েটা দিলেন। যেদিন চলে আসছি কেঁদেই সারা। বলতেই লাগলেন, আর তোর সঙ্গে দেখা হবে না। আমি জানেন, নিজের কান্না চেপে বকেই দিলাম, আর পাঁচটা বছর বেঁচে থাকবে না? কতো বুড়ো হয়েছো? কে জানতো পাঁচ দুগুণে দশ বছর হয়ে যাবে।

শুভরঞ্জন বলে, তোমার সেই মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে যে একবার দেখা করার কথা বলেছিলে, সেটা কবে হবে?

লিলি বলে, 'সেই তো। যাবো যাবো তো করছি।'

তা করছে বটে! বছর দুয়ের ছোট মামাতো ভাইটা খুবই ভালোবাসার ছিল। যদিও প্রকৃতপক্ষে ওই ভাইটির জন্যেই মামীর কাছে সে আরো বিরক্তিভাজন হয়ে পড়েছিল।

বিয়ের বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত লিলির ওই মামা মামী নিঃসন্তানই ছিলেন। বলতে গেলে মামী বাঁজা নামেই অভিহিত হয়ে পড়েছিলেন, সেই সময় লিলির মা, একটা সদ্যোজাত মেয়েকে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে রেখেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে বসলেন। তাও কঠিন রোগগ্রস্ত স্বামীকে রেখে।

সেই অবস্থায় লিলির ঠাকুমা লিলির বাবাকে বলে বসলেন, "তোমার ভাগ্নীটিকে তুমি নিয়ে যাও বাছা। আমার এখন এমন বলশক্তি নেই যে, আমার ওই যেতে বসা ছেলের সেবাযত্ন করে আবার একটা আঁতুড়ে খুকী পালতে বসবো। তোমাব ঘরে মা ষষ্ঠির কৃপা নেই, ঠাঁই পাবে।"

তা কথাটা যুক্তিযুক্ত তো নিশ্চয়ই।

নিয়ে এসেছিলেন মামা। এবং তখন নাকি মামী বেশ হৃষ্টই হয়েছিলেন। কিন্তু বছর দুই পরে যখন অপ্রত্যাশিতভাবেই ওই ছেলেটির আবির্ভাব ঘটলো, মামীর প্রতিমুহূর্তে মনে হতে থাকলো, তাঁর প্রাণের পুতুলের প্রাপ্যর অনেকখানিই ভাগ পেয়ে যাচ্ছে ওই মা বাপ খাওয়া অপয়া মেয়েটা। বিশেষ করে পিতৃহৃদয়ের পূর্ণ ভালবাসার আগে থেকেই খানিকটা নিয়ে বসে আছে।

সেই সূত্রেই মামা-ভাগ্নী যেন দুজনেই কাঠগড়ার আসামী।

তবু ছেলেটা লিলির একান্ত ভালোবাসার। পিঠোপিঠি ভাইবোন হলে যেমন হয়। মামী মারা যাবার পর ওই দুবছরের বড় দিদিটিই হয়ে উঠেছিল তার গার্জেন। তার জননীতুল্যও।

সেই ভাই লিলির বিয়েটা দেখতে পায়নি। কম দুঃখ।

ও তখন খড়্গপুরে আই. আই. টি-তে পড়ে। এমনই ভাগ্য ঠিক বিয়ের দিনই ওর আচমকাই বিশেষ একটা পরীক্ষা পড়ে গেল। পড়বার কথা নয়, পাঁজীটাঁজী আর পরীক্ষার দিনটিন দেখে—ক্যালকুলেশান করেই বিয়ের দিনস্থির করা হয়েছিল। কিন্তু 'আচমকা' ঘটনাকে, কে এড়াতে পারে?

সেই ভাই এখন টাটায় ভালো পোস্টে কাজ করে, ভালো কোয়ার্টার্স পেয়েছে বিয়েও করে বসেছে। সেই বার্তা দিয়ে চিঠি লিখেছিল নাকি, 'আমি তোর বিয়ে দেখতে পাইনি, তুই আমার বিয়ে দেখতে পেলি না। শোধবোধ। আশা পোষণ করছি কোনো একদিন আমি তোকে বৌ দেখাতে পাবো। আর তুই আমাকে বর দেখাতে পারবি।'

তা' সেও হয়ে গেল বছর দেড়েক। তখন শুভরঞ্জনের—দেশে ফেরার সংকল্প দানা বাঁধেনি। তা কলকাতায় এসেই, বলাবলি হচ্ছে, একবার টাটায় যেতে হবে। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। ভাইয়ের তো তখন ট্যুর চলছে।

তবে টেলিফোনে কথা হয়েছে সেই বিদেশ থাকাকাল থেকেই। এখানে এসেও

হয়েছে। বাড়িতে ফোন না থাকুক পাবলিক ফোন থেকেই।

সেই কথোপকথনের ফলেই দু'পক্ষের সুবিধের যোগাযোগ হচ্ছে না। তবে হবে।

অনর্গল এসব কথা বলে যায় লিলি। ভীষণ গল্পবাজ মেয়ে।

কিন্তু অনামিকার যেন হাই ওঠে, বেজার আসে। 'তোমার জীবন ইতিহাসের এতো কথা শুনে আমার কী হবে বাবা!...আমারও তো একটা ছেলেবেলা ছিল, কই সেসব গল্প তো কেউ কান পেতে শোনে না।'

এই সর্বদা কলহাস্য মুখরিত, আর বাক্যঝঙ্কৃত বাড়িতে দেখা যায়, হাসিকথা গল্পের সিংহভাগটিই লিলির অধিকারে গিয়ে বসে থাকে। অথচ সেই কলকণ্ঠের কাকলি, বেশির ভাগটিই তো অনামিকাকে উদ্দেশ্য করেই।

'ওমা, দেখুন এসে কী রান্নাটান্না হবে। বাঃ 'আমি আর কী দেখবো?' মানে? না দেখতে চাইলে এই মাছটাছ সব আপনার কাছে নিয়ে চললাম! কী হবে, সেটা বলে দেবেন, তবে রাঁধবো বাবা আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'ও মালতীর মা, তুমি আবার রেগে গেলে নাতো? আসলে আমি না রান্না করতে খুব ভালবাসি। কিছু মনে কোরো না ভাই।'

অনায়াসে তাদের সঙ্গে 'ভাই' বলে কথা কয়।

ওরা তাতে বিগলিত। পারুল আর মালতীর মা দুজনেই বৌদির প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে!

"কী গুণের বৌ গো তোমার মাসিমা! তিনভুবন ঘুরে এলেও আজকের বাজারে এমন বৌ পাবে না। পাড়ার লোকের কাছে গপ্পো করি, শুনে তো সবাই ধন্যি ধন্যি করে।"

লিলি বলে ওঠে, এ মা! তুমি পাড়ার লোকের কাছে আমার গল্প করতে বসো?

"ওমা। করবো নাতো কী? গুণের বৈ তো দোষের গপ্পো নয়?"

অনামিকার মনে হয় সবটাই যেন বাড়াবাড়ি! ন্যাকামী। সাজানো সাজানো!

অথচ ওই সদাহাস্য মুখ বৌয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলারই কী আছে?

সব থেকে বিরক্তিকর, সুরঞ্জনের 'বৌমা' বলতে অজ্ঞান হওয়া। তাঁরও মতে ত্রিভুবন ঘুরে এসে এমন বৌ মিলবে না! আর বিরক্তিকর, ছেলের মা বাপের সামনে হরদম 'লিলি লিলি' বলে কথা!

উঃ। কী জীবন তাঁর গেছে?

অথচ অনামিকাও খুব হাসিখুশি, গল্পপ্রিয় ছিল। কিন্তু, সমস্ত বয়েসকালটা? একবার খোলাগলায় হেসে ফেলার জো ছিল না। তাতে নাকি ননদিনীকে হেয় করা হয়।

স্বামীর সঙ্গে গলা খুলে কথাই বা বলেছেন কবে? সে এই বাড়িতে আসার পর।

চারিদিকে লোক। দ্যাওররা জায়েরা তাদের ছেলেমেয়েরা ভাসুরপো এবং তার সম্প্রদায়! সর্বোপরি সেই ননদ।

কখন কী কথা বলে ফেলবেন, আর সে কথা ফেনায়িত এবং বিকৃত হয়ে, কার কানে উঠে বসবে, এই ভয়েই তটস্থ থেকেছেন। আর অনামিকার আমল পর্যন্ত তো ওই ননদিনীর দাপটটি ষোলো আনাই ছিল। পরে ভেবেছেন অনামিকা, অন্ততঃ এখন পরবর্তীজনদের বেপরোয়া ভঙ্গী দেখে ভাবেন, সে দাপটটি ছিল, এই নির্বোধ

অনা।মকার জন্যে। অতো ভয় করার কী দরকার ছিল?

তা দরকার ছিল! সুরঞ্জন যে চিরদিন 'দিদি' বলতে তটস্থ। পাছে দিদির মান-সম্মানের একটু ঘাটতি হয়ে বসে, সেই সম্পর্কে সদাই কাঁটা। আর সেই ঘাটতি ঘটতে না দেওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্বটি বরাবর চাপিয়ে রেখেছিলেন অনামিকারই ওপর।

এ বাড়িতে এসেই অনামিকার প্রথম মনে হয়েছিল, মাথার ওপর থেকে যেন একখানা পাহাড় নেমে গেছে। অনামকার ভাগ্য। কটা দিনই বা? সেই পাহাড়টি আবার বুকে চেপে বসলো, ছেলে বৌ বাড়ি শূন্য করে সাতসমুদ্র তেরোনদী পারে চলে যাওয়ায়।

আচ্ছা ফিরে তো এসেছে ছেলে। 'আর যাব না' গ্যারাণ্টিও দিয়েছে। তবে সেই পাহাড়টা স্থানচ্যুত হচ্ছে না কেন? অনেকগুলো দিন চাপানো ছিল বলে কী তার ভারের অনুভূতিটা রয়ে গেছে?

তিনতলা উঠছে জোর দমে।

পাড়ার লোক চোখ ট্যারা করে তাকিয়ে দেখে।

কপাল বটে ওই সুরঞ্জনবাবুর।

কার ভাগ্যে আবার এমন ঘটে? দশ বছর বাইরে থেকে এসে কোন ছেলে বৌ 'ছানাপোনা' নিয়ে আবার মা বাপের খোঁয়াড়ে এসে ঢোকে? তাও দৈন্যদশা নিয়ে নয়। টাকার পাহাড় নিয়ে।

এই বাড়িতেই যত টাকাটা ঢালছে সুরঞ্জনের ছেলে, তাতে তো অভিজাত পাড়ায় অতি আধুনিক একটি ফ্ল্যাটই হয়ে যেতো, নিজের যুগ্যি। তা নয় পুরো তিনতলাটায় একটা দারুণ ফ্ল্যাট বানাচ্ছে। আশেপাশের লোকেরা নিজেদের জানালা বারান্দা দিয়ে দেখে কতটা উঠলো।

ওরা ফিরে আসার পর প্রথম প্রথম পাড়ার মেয়ে বৌরা তেমন আসেনি, কিন্তু লিলির ওদের সব বাড়িতে যাওয়ার ঘটায় আর অমায়িক ব্যবহারে সবাই মোহিত। তাই আসা যাওয়ার দরজা এখন অবাধ।

অনামিকা ঘরে বসে অনুভব করেন, কারা যেন এসেছে। হাসি গল্প চা পর্ব চলছে। যাবার বেলায় তারা অনামিকার কাছে এসে দেখা করে, প্রণাম করে।

অনামিকা যেন এইমাত্র টের পেলেন এইভাবে বলেন, 'ওমা! কখন এলে?'

ওরা বলে, 'এই খানিকক্ষণ! ইয়ে আপনি পুজো করছিলেন (অথবা ব্যস্ত ছিলেন) ভেবে ডিস্টার্ব করতে আসিনি।'

চা-টা কিছু খেয়েছ?

ও বাবা। বৌদি ছাড়বে?

বাড়ির সব ভালো তো? আচ্ছা এসো। ভালো থেকো।

আচ্ছা অনামিকা কেন সহজ ভাবে বলতে পারেন না, 'কী? এতক্ষণে মাসিমাকে মনে পড়লো? অনেকক্ষণ তো এসেছ বাছা। টের পাইনি ভেবেছ?'

এমন সরস কথা কী জানেন না অনামিকা?

অথচ সেটা আসে না! কেন কে জানে।

সুরঞ্জন ছেলেকে বলেন, 'তিনতলাটায় তো দেখছি অনেক খরচ করে ফেলছিস? এই যে বলেছিলি, আর চাকরি করবি না, বিজনেস করবি। তাতে টাকার দরকার হবে না?'

শুভ হাসে। হবে হবে। সব হবে। সে ব্যবস্থাও হচ্ছে। লিলির ওই মামাতো ভাই? সে একটা দারুণ পরামর্শ দিচ্ছে। বলবো তোমায় সব বুঝিয়ে। আগে নিজে সবটা বুঝে নিই।

'বৌমার ভাই? তার সঙ্গে দেখাটা হলো কবে?'

'দেখাটা হয়নি। ওই টেলিফোনেই কথা। সেইজন্যেই আরো 'যাবো যাবো' করে যাওয়াটা পিছিয়ে দিচ্ছি। গিয়ে হয়তো দিন তিন-চার থাকতে হতে পারে। একটা কণ্ট্রাক্ট করার ব্যাপার আছে। তারপর হয়তো মাঝে মাঝে এক দু'দিনের জন্যে ঘুরে আসতে হবে। সেটা অবশ্য আমি একাই যাবো। তোমরা একা পড়ে থাকার চিন্তা কোরো না!'

অনবরতই মা বাবার জন্যে ব্যস্ত এরা!

বাবা! তোমার চেহারাটা অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? শরীর ভালো নেই? এটা ঠিক নয়। একবার চেক-আপ করানো দরকার।

'বাজে বকিস না শুভো! কোনোখানে কিছু নেই, হঠাৎ চেক-আপ করাতে বসবো!'

'না না। উড়িয়ে দেবে না। একদম উড়িয়ে দেবে না। এখন—ক্রমশঃ বয়েস হচ্ছে, মাঝে মাঝে প্রেসারটা অন্ততঃ দেখিয়ে নেওয়া খুব দরকার।'

অতএব সুরঞ্জনের শত আপত্তি ঠেলে শুভরঞ্জন ডাক্তার সান্নিধানে ধরে নিয়ে যায় বাবাকে। চেক-আপ হয়। এবং যখন দেখা যায় কোথাও কিছুই গোলমাল নেই, তখন সুরঞ্জন যখন রাগ দেখিয়ে বলেন, 'বলেছি কিছু হয়নি, তবু মিছিমিছি একগাদা টাকা খরচ। টাকা কী তোকে কামড়ায়?'

তখন ছেলে হো হো করে হাসে।

'টাকার দাঁত আছে বুঝি বাবা? এই টুনটুনি শোন তোর দাদুর কথা! টাকার নাকি দাঁত আছে। তারপর বলে, 'মিছিমিছি' কেন বাবা? নিশ্চিন্ততার একটা মূল্য নেই?'

সুরঞ্জনের হঠাৎ মনে হয়, আচ্ছা খোকা যদি হঠাৎ অনেক টাকা জমিয়ে ফেলতে না পারতো, তাহলে কী খেয়াল করতো নিশ্চিন্ততার একটা মূল্য আছে, আর সেটা 'পয়সা দিয়ে' কিনতে হয়। হঠাৎ মনে হয় সুরঞ্জনের ছেলের এতোটা বেশি পয়সা হওয়ার কী দরকার ছিল? আর একটু কম হলে ভালো হতো না? মধ্যবিত্ত মনের কাছে, এই টাকাই অনেক বেশি।

মিস্ত্রীর কাজ দ্রুত চালিয়ে চালিয়ে—তিনতলা সমাপ্ত করে ফেলে শুভরঞ্জন। যদিও সব সময়ই গিয়ে গিয়ে দেখা হয়েছে, তবু সব ফিনিস না হওয়া পর্যন্ত যেন সম্যক বোঝা যায় না!

অনামিকা বলেন, 'একী রে খোকা? এ যে মনে হচ্ছে সাহেব বাড়ি!'

শুভ মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তাইতো! এখানে একটি বুড়ি মেম আর বুড়ো সাহেব থাকবে!'

অনামিকা রেগে ওঠেন। বলেন, 'বাজে কথা বলিস না তো।'

কিন্তু বৌ ছেলে দুজনেই ধরে বসে, 'নতুন ঘরে, তোমরা থাকবে।'

সুরঞ্জন বলেন, 'ক্ষেপেছিস? তোর মার এই হাঁটুতে বাত, আর আমার হাঁপানির ধাত! আমাদের পক্ষে তিনতলা কী বেশ একটা সুবিধের হবে?'

তা শেষ পর্যন্ত ওই হাঁপানির ধাত আর হাঁটুর বাতের কাছে পরাস্ত মানে ছেলে বৌ। 'নিজেদের মতো' করেই সাজিয়ে ফেলতে শুরু করে।

শেষ পর্যন্ত রফা, গৃহপ্রবেশ হিসেবে অন্ততঃ একটা রাতও ওখানে দুটো ঘরে সবাই মিলে থাকা হবে।

হলো সে ব্যবস্থা।

ঠিক ঠিক ভাগে।

একটা ঘরে খোকা তার বৌ আর ছেলে নিয়ে। আর অন্য ঘরটায় সুরঞ্জন তাঁর স্ত্রী আর নাতনীকে নিয়ে।

অতএব পরস্পরের হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করার কোনো সময় হলো না। শুধু অনামিকা মৃদু নীল আলো জ্বালা ঘরে, ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে ভাবতে থাকেন, আচ্ছা এ বাড়িটা যখন তৈরি হয়েছিল, তখন এসে যেন মনে হয়েছিল স্বর্গে এলাম। এখন এই এতো শৌখিন সুন্দর ঘরে শুয়েও তেমন ভাব মনে আসছে না কেন?

আর লিলি আর শুভরঞ্জন?

ওদের যেন একমাত্র আপ্রাণ চেষ্টা মা বাপকে আরাম দেওয়া, যত্নে রাখা। এটা যেন একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে এদের। অথবা শখ।

অনামিকা বলেন, 'আচ্ছা খোকা। আমরা কী তোদের কুটুম এসেছি? এতো বাড়াবাড়ি করিস কেন বলতো? একগেলাস জল নিয়ে খেতে দেখলেও হাঁ হাঁ করে ছুটে আসিস।'

শুভরঞ্জন বলে, 'কুটুমই তো। প্রাণের কুটুম।'

তবে এর থেকে সুখের অবস্থা আর কী হতে পারে?

তবু যেন সুখের তেমন একটা ভরাটি স্বাদ আসছে না।

অথচ উপকরণের ত্রুটি নেই। দিন দিন বেড়েই চলেছে। শুধুই কী বহিরঙ্গে? অন্তরেও তো সে উপকরণ অগাধ। অথবা অন্তরে সেই অগাধই আছে বলেই বহিরঙ্গে তার প্রকাশ।

'মা, কী সব বাজে শাড়ি পরে থাক তুমি? দেখতে ভালো লাগে না।'

বাজে শাড়ি।

অনামিকা অবাক হন।

ছেলে বৌ আসা বাবদ তিনি তো তাঁর আজেবাজে শাড়িগুলো বাতিল করে (ভেবেছেন পরে বাসন কিনবেন ওগুলো দিয়ে) তোলা শাড়িগুলোই বার করে পরছেন।

বাজে আবার কী রে? বাড়িতে আবার কী এতো সেজেগুজে থাকতে হবে?

'হবে না কেন? হবে। সব সময় সুন্দর হয়ে থাকবে।'

ডাক দেয়, 'লিলি, এই লিলি। নিজে তো বেশ সব সময় সিল্কের শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াও। রান্নাও চালাও সিল্ক শাড়ির আঁচলে কোমর বেঁধে। আর আমার মায়ের দিকে দৃষ্টি নেই!'

অবশ্যই এ অভিযোগ অভিনয় মাত্র।

লিলি বলে, 'মাকে সিল্কের শাড়ি পরে ঘোরাতে পারবে—গ্যারাণ্টি দাও। এক্ষুণি দু ডজন সিল্কের শাড়ি এনে হাজির করছি। গ্যারাণ্টিটা আদায় করো।'

অনামিকাকে অবশ্যই স্নেহে বিগলিত হতে হয়। হেসে ফেলে বলতে হয়, 'ওরে বাবা! এ যে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হওয়ায় উলু খড়ের প্রাণ যাওয়া। দোহাই বাবা।'

তা শত দোহাই পেড়েও ছেলে বৌকে নিবৃত্ত করা যায় না। দুজনে মিলে বেরিয়ে গাদাখানেক শাড়ি কিনে আনে। সিল্কের অবশ্য নয়। সুতিই। মিহি সুন্দর ধনেখালি টাঙাইল।

সেই সঙ্গে সুরঞ্জনের জন্যেও মিহি আদ্দির পাঞ্জাবীর গোছা গোছা ভর্তি কাঁচির ধুতি। সব সময় এই সব পরে থাকতে হবে। সুরঞ্জনও অবশ্য ছেলে বৌ আসার পর আর লুঙি গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়ান না, ধুতি পাঞ্জাবীই পরেন। কারণ ফতুয়া পরলে চাকর চাকর দেখতে লাগে এটা শুভর চিরকেলে অভিমত। তাই বলে, এই মিহি পাঞ্জাবী চিকন ধুতি? সর্বদা?

বিব্রত বিপন্ন হয়েই হেসে ফেলেন, তোরা কী আমাদের খেলনা পুতুল পেয়েছিস? দুটো চাঁদের মতো বাচ্চা পুতুল তো আছেই বাবা, আবার এই দুটো বুড়োধেড়ে মাটির পুতুল নিয়ে খেলার শখ কেন?

'বাঃ! খেলার মধ্যে রাজারানী সৈন্য-সামন্ত থাকবে না? তোমরা হচ্ছো রাজারানী! আমরা সৈন্য-সামন্ত।'

এ হেন মহান বাণী কবে কোন ছেলে তার মা বাপের সামনে উচ্চারণ করেছে? অবশ্যই শুভরঞ্জনের কথার ভঙ্গীই এইরকম বরাবরই। তবু সুরঞ্জনের মনে হয় সত্যিই যেন এরা তাদের খেলাঘরে, অনামিকা আর সুরঞ্জনকে নিয়ে পুতুল খেলা খেলছে।

'এই সব দামী জামাকাপড় পরে বাড়িতে বসে থাকবো?'

'বসে থাকতে কে বলেছে বাপী? বেড়াও না। হাঁটলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।'

'হাঁটতে আমার দায় পড়েছে। যা, যা ওসব ফেরৎ দিগে যা! ইচ্ছে হয় মোটা মোটা দুখানা নিয়ে আয়।'

'বাপী!'

এবার শুভরঞ্জনের স্বর গাঢ়। 'আমরা সর্বদা যা পরে থাকি তার দাম কতো জানো? আমার এই একটা প্যাণ্টের দামে তোমার এরকম পাঁচ সাতটা ধুতি হয়। কেন পারবে না?'

অনামিকার দিকেও সেই একই যুক্তি। 'তোমার বৌ সর্বদা কতো দামের শাড়ি পরে বেড়ায় জানো? তার সিকির সিকি দাম তোমার এই জরিপাড় শাড়ির।'

অতএব বাড়িতেই জরিপাড় শাড়ি পরে বেড়াতে হয়—

অনামিকাকে!

অবশ্য পরিবেশও বেশ খানিকটা পাল্টেছে। খুব বেমানান লাগে না।

এখন আর একতলার উঠোনের সেই বাথরুম থেকে স্নান করে ভিজে শাড়ি পরে শপশপিয়ে ঘরে উঠে আসতে হয় না অনামিকাকে। দোতলায় আর একটা বাথরুম বানিয়ে দিয়েছে ছেলে। নীচের তলায় সেই জায়গাটায় ভাবী গাড়ির জন্যে গ্যারেজ বানানো হয়েছে।

লিলি অবশ্য সব সময় বলেছে, 'কলকাতায় গিয়ে তোমার প্রথম কাজ হবে সেকেন্ডহ্যান্ড হোক, থার্ড হ্যান্ড হোক একখানা গাড়ি কিনে ফেলা। এখানে তো যানবাহনের প্রবলেমটাই সব থেকে বেশি।' এবং এখনো বলে, 'এই ক'মাসের মধ্যে যা ট্যাক্সি ভাড়া খরচ করলে তুমি, তাতে যাহোক একটা পক্ষীরাজ হতো।'

কিন্তু শুভরঞ্জন বলেছে, আগে মন্দির, তবে বিগ্রহ। গাড়ি কেনবার আগে তার একটা আস্তানা করতে হবে না? যেমন বিয়ে করবার আগে 'ঘর' প্রস্তুত রাখা।

তাই এখনো গাড়ি কেনা হয়নি। তবে মন্দিরটা হয়েছে এবার।

বাড়ির প্যাটার্ন বদলে গিয়ে অনামিকার জীবনযাত্রার প্যাটার্নটাও যেন বদলে গেছে।

এখন আর চায়ের পাট নীচের তলায় নেই। উঠে এসেছে দোতলায়। সেই বারান্দাটায়, যেখানে সন্ধ্যা থেকে রাত অবধি অন্ধকারে মুখোমুখি বসে থাকতেন দুটো মানুষ, অদূরে রাতের খাবারটা ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে। আর একসময় দু'জনেব একজন বলে উঠতেন, "আর রাত করে কী হবে। সেরে নেওয়া হোক।"

এখানের এ টেবিলে নতুন অতি সুদৃশ্য বিদেশ থেকে আনা বাহারি টেবল ম্যাট পেতে চা বানানোর ব্যবস্থা। সাজসরঞ্জাম সবই ঝকঝকে ঝলমলে!

মালতীর মা ফর্সা ধবধবে চওড়াপাড় শাড়ি পরে (যেগুলো কিছুদিন আগেও অনামিকার প্রিয় শাড়ি বলেই গণ্য ছিল। বিতরণ করে ফেলা হয়েছে তাকে।) নীচেব তলা থেকে যা কিছু দরকার উঠিয়ে নিয়ে আসে। হাঁটু ব্যথা অনামিকাকে সাধ্যপক্ষে সিঁড়ি ভাঙতে দেওয়া হয় না।

সিঁড়ি ভাঙতে দেওয়া হয় না। আরামের চূড়ান্ত। তবু ভিতরে ভিতরে যেন কোথাও ভাঙন ধরতে বসেছে। একটুতেই আজকাল হাঁপিয়ে পড়েন অনামিকা। অতএব আরো আরাম আয়েস বিশ্রামের ব্যবস্থা।

যদিও অনামিকা বলেন. 'সিনেমার ছবির গিন্নীদের মতো সর্বদা এই রকম দামী দামী শাড়িজামা পরে থাকার জন্যেই আমার হাঁফ ধরে।' সেকথা আর কে মানছে?

অনামিকার মনে হয় কিছু কাজ করতে না পেয়ে অনামিকার এতো দুর্বলতা-বোধ। সিঁড়ি না ভেঙে হাঁটুর ব্যথা বৃদ্ধি। সে কথা আর মুখ ফুটে বলে উঠতে পারেন না। রান্না করা জিনিস ছাড়া কতোদিন যেন কাঁচা শাকসব্জি হাতে নেওয়া তো দূরের কথা চোখেই দেখেননি যেন।

একদিন হঠাৎ বলে উঠেছিলেন, 'কী সব বাজার-টাজার আসে তোমাদের বৌমা? দেখি না!'

সেদিনের পরই মালতীর মা আর পারুল দু'ব্যাগ আনাজপাতি দোতলায় উঠিয়ে এনে সামনে বিছিয়ে বলে, এই দেখুন মাসিমা কী বাজার এসেছে। বৌদিদি বললো

'মাকে দেখিয়ে এসো, আর জিজ্ঞেস করে এসো আজ কী রান্না হবে?'

পারুল বলে ওঠে, 'ওমা, একদিনেই কী শেষ হবে? ফিরিজে থাকবে। বৌদিদি যে পেল্লায় ফিরিজটা সেখান থেকে এনেছে, সেটা তো এতোদিন প্যাক করাই ছিল, ক'দিন হলো প্যাক খুলে ফিট্ করা হয়েছে!'

অনামিকা তাকিয়ে দেখেন। এই চমৎকার চমৎকার তাজা ফুলকপি, তেল চুকচুকে বড় বড় বেগুন, সবুজ কড়াইশুঁটি, সদ্য মাঠ থেকে তুলে আনা পালংশাক, টোম্যাটো! এইসব কেটে কুচোবে ওই মালতির মা।

হাত নিসপিস করে অনামিকার! হঠাৎ যেন জিনিসগুলোর ওপর বিতৃষ্ণা এসে যায়। বলেন, 'নিয়ে যা। দোতলায় বসে আবার দেখবো কী? খাবোই তো।'

দোতলায় বসে অবশ্য দুপুরের খাওয়াটা নয় সেটা নীচের ঘরে ডাইনিং টেবলে। তবে ব্রেকফাস্ট এই দোতলায়। যার ধারে কাছে একটা রঙিন টেলিভিশন বসানো হয়েছে।

শুভরঞ্জন তো এসেই বলেছিল, মা তোমার টিভি-টা পুরনো বাড়িতে ফেলে দিয়ে চলে এসেছিলাম, গিয়েই কিনে দেব বলে, সে তো হয়ে ওঠেনি। বাপীকে চিঠিতে কতোবার লিখেছি, কিনে ফেলতে, এখনো তোমরা 'দূরদর্শনহীন' হয়ে পড়ে আছো? আশ্চর্য।

এসে গিয়েছিল রঙিন টিভি।

অনামিকার দিকে তাকিয়ে সুরঞ্জন হেসে হেসে বলেন, একসময় বিজ্ঞাপনে ছবি দেখাতো, 'সুখী গৃহকোণ, শোভে গ্রামোফোন।' এখন আমাদের এই সুখী গৃহ-কোণের জন্যে কী 'ক্যাপসান' হতে পারে বলতো?

হাসির তরঙ্গ খেলে যায় ঘরে!

রোজই খেলে।

সত্যিই যে বড় সুখী গৃহকোণ!

আজ সকালে শুভরঞ্জন চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বলে, 'মা আজ তিনটে সুখবর!'

বাঃ। বল শুনি।

'এক নম্বর হচ্ছে—টেলিফোন এসে যেতে পারে দু একদিনের মধ্যেই—'

অনামিকা মাঝ পথে বলে ওঠেন, 'এখন আর টেলিফোন। যখন বাইরে ছিলি, তখন হলে বরং—'

'ভালো জিনিস সবসময় ভালো মা। তোমার ছেলে এখন 'বিজনেস' করবে, টেলিফোন নাহলে অচল। যাক দু'নম্বর হচ্ছে—সেই বিজনেসের ব্যাপারেই একটি শুভ পদক্ষেপ করতে সামনের সোমবারে টাটায় যাচ্ছি। অবশ্যই তোমার বৌ নাতি-নাতনী সবাইকে নিয়ে। তিন চারটে দিন তোমাদের একা থাকতে হবে, এই যা।'

সুরঞ্জন ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে বলেন, 'হ্যাঁরে শুভ, তোর শালাতো ছেলেমানুষ, সে কীরকম কী পরামর্শ দিল?'

হো হো করে হেসে ওঠে, 'শালা ছেলেমানুষ। আমি তো আর নই? আমি এখান থেকে খুব ছোট্ট একরকম জিনিস তৈরি করিয়ে ওখানে পাঠাবো। সেটা নেবে। কোনো চিন্তা কোরো না!'

জমানো টাকার কতো তো ফুরিয়ে ফেলনি।

আবার হাসে শুভ, 'তাতে কী? টাকা তো আবার ডিমও পাড়ে। আজকাল এতো সব স্কীম হয়েছে, ডিমের মতো দারুণ। যাক তিন নম্বর সুখবর—তোমাদের টুনটুনিকে স্কুলে ভর্তি করে ফেলা গেছে।'

নাতনীকে অনামিকা টুনটুনি বলে, ওরাও তাই বলে। 'তা একটা সাত বছরের মেয়েকে হঠাৎ একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করা তো সহজ নয়। সেটা হওয়া অবশ্যই সুখবর।

তবু অনামিকা বলে ওঠেন, ওমা। টুনটুনি তাহলে এবার আমাদের দলছাড়া হয়ে গেল? কোন্ স্কুল? কখন যেতে হবে?

শেষ কথাটারই উত্তর দেয় ছেলে, 'সে বাচ্চাদের স্কুলে যেমন হয়। সকাল ছটায় ক্লাশ বসবে। তার আগেই পেঁাছতে হবে।'

কোথায় রে?

সেই লেক-এর কাছে। মুস্কিল এই এখান পর্যন্ত বাস আসে না। যতদিন পর্যন্ত না যাহোক একটা গাড়ির ব্যবস্থা হচ্ছে, ওর মাকেই আরামের ভোরের ঘুম ভেঙে উঠতে হবে। আবার দুপুরে ভাত খেয়ে অথবা না খেয়ে ছুটতে হবে।

সুরঞ্জন তাড়াতাড়ি বলেন, 'আরে কেন? আমিই তো পেঁাছনোর কাজটা করতে পারি। আমিতো শেষ রাত্তিরে উঠি, বেড়াতে বেরোই।'

'সে তো পায়ে হেঁটে যতটুকু পারেন।' লিলি বলে ওঠে, 'তাই বলে বাসে করে অতটা। আবার বাসে ফেরা। তাই কী আর হয়? আপনার ঘাড়ে ওই পাহাড় চাপানো চলে? আমিই ম্যানেজ করে নেবো।'

দু'একবার কথাবার্তা হয়।

কিন্তু ছেলে বৌ দুজনেই সুরঞ্জনের ওই সক্কালবেলায়, ব্রেকফাস্ট না সেরেই অতটা বাসে যাওয়া আসা সমর্থন করে না। আর দুপুরে, রোদের সময় তো নয়ই।

অতএব চুপ করে যান সুরঞ্জন।

কত বয়েস হয়েছে তাঁর?

আটান্নয় রিটায়ার করেছিলেন, আর সেটা হয়ে গেল বারো বছরের ওপর। সত্তরের গোড়ায় পেঁাছেছেন বটে। কিন্তু সেটা কী সকলের ক্ষেত্রে একেবারে অক্ষমতার পর্যায়ে পড়ে? সুরঞ্জন নিজে তো দেখেন বেশ ফিট আছেন। চৌষট্টির অনামিকার থেকে তিনি অনেক বেশি মজবুত। এইতো সেদিন পর্যন্তও, যখন এরা আসেনি, সংসারের সমস্ত ভারী কাজগুলো তো সুরঞ্জনই করেছেন। সিঁড়ি ওঠা নামাও! বাড়ির ঝুল ঝেড়েছেন, দরকার হলে বালিশ বিছানা রোদে দিয়েছেন, নিজের জামাকাপড় বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি সাবান কেচেছেন, বাজার দোকান সব করেছেন, কই নিজেকে তো বুড়ো বলে মনে হয়নি।

কিন্তু ওদের সঙ্গে কথায় জিতবেন, এমন সাধ্য নেই সুরঞ্জনের।

শেষ অবধি যখন শুভরঞ্জন বলে, 'আচ্ছা নিয়ে যাবার ভারটা তুমি নিতে পারো, যদি কথা দাও ট্যাক্সিতে কী অটোতে যাওয়া আসা করবে।'

সুরঞ্জন দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেন, 'নমস্কার বাবা। আমার আর সংসারের কাজ করে দিয়ে কাজ নেই।

শুভরঞ্জন অবশ্য তখন বৌয়ের দিকে একটু কৌতুক দৃষ্টি হেনে বলেছে, 'বেশি রোদটোদ হলে, গলে যাবার ভয়ে মোমের পুতুলটি তাই করবেন। এ বিশ্বাস রাখি।'

মোমের পুতুল রাগ দেখিয়ে বলে উঠেছে, 'কখন গলতে দেখেছ?'

'অপারচুনিটি পেয়েছি কবে?'

এরকম দাম্পত্যলাপ এরা মা বাপের সামনে করে।

কিন্তু তাতে কী অপমান বোধ হবার কথা? তা তো নয়? সুরঞ্জন তো করেন না। অথচ অনামিকা যেন মাঝে মাঝে করেন অপমানবোধ। মনে হয় এতো কী বেহায়াপনা আদিখ্যেতা।

তা অকারণ অপমানবোধ একটু আছে অনামিকার।

নাহলে কবে যেন একদিন খেতে বসে টুনটুনি বলে উঠেছিল, 'ঠাকুমা! আগে নাকি তোমরা মাটিতে ভাত খেতে?'

'খেতাম তো। তাতে কী?'

'এ মা, ধুলোবালি লেগে যেত না? ভাত ময়লা হয়ে যেত না?'

অনামিকা হতবাক।

'মাটিতে খেতাম মানে, ভাতটা মাটিতে রেখে?'

'তবে? মামণি তো বললো, তোমার শ্বশুরবাড়িতে সবাই মাটিতে ভাত খেতো! বাপী দাদু সবাই খেতো তাই।'

এ সময় অবশ্য খোকা তার স্বভাব গুণে হাওয়া হালকা করে দেয়। বলেছে তোর মামণি বলেছে, আমরা মাটিতে ভাত ডাল মেখে খেতাম? হা হা হা। তোমার ঠাকুমার শ্বশুরবাড়ি মানে তো সেটা আমাদেরই বাড়ি। তোমার বাড়ি। আমরা বুঝি এতো গরীব ছিলাম যে একটা ডিশ প্লেট কিচ্ছুটি ছিলো না! আরে বাবা মাটিতে খাওয়া মানে—

বলে মানেটা বুঝিয়ে দেয় শুভরঞ্জন তার মেয়েকে। এবং এও বলে, শুধু ঠাকুমার নয়, তোমার মামণিরও শ্বশুরবাড়ি সেটা। বুঝলে হে খুকী?

তবু অনামিকা যেন মনে মনে কেমন একটু অপমান বোধ করেন।

মনে হয় লিলি হয়তো তার মেয়ের কাছে অনামিকাদের দৈন্যদশার কথা তুলে তুলে গল্প করে।

অথচ লিলি নেহাৎই সৎ সরল।

টাটায় যাবার আগেরদিন বলে, 'মা আপনার ঠাকুরকে বলবেন যেন যা করতে যাচ্ছে আপনার ছেলে, যেন ভালোয় ভালোয় হয়ে যায়।'

আজকের দিনের কোন মেয়েটা বলে এমন?

হয় ওসব মানে না। নয়তো 'নিজের ঠাকুর' মানে।

তিন চারদিনের তো মামলা। তবু শুভরঞ্জন বাপকে পাখি পড়ায়, 'বাপী একদম যাহোক তাহোক করবে না। খুব সাবধানে থাকবে। ডাক্তার ঘোষকে বলে যাচ্ছি, হঠাৎ দরকার হলে যেন, তাড়াতাড়ি চলে আসেন। টেলিফোনটা দেবে বলেছিল এর মধ্যে দিল না। যাইহোক পাশের বাড়িতে তো ফোন রয়েছে। ডাক্তারবাবুর ফোন নাম্বারটা

হাতের কাছে রেখো। মার বা তোমার একটু শরীর খারাপ হলেই—

বিপন্ন বিব্রত সুরঞ্জন একটু হেসে ফেলে বলেন, 'ওহে বাবামশাই এই দশটা বছর আমরা আমাদেরকে নিজের হেফাজতে রেখেই তো টিকিয়ে রেখে এসেছি। অতো দুশ্চিন্তা করিস কেন?'

'বাপী। তোমার যুক্তিটা খোঁড়া। দশ বছর কিছু হয়নি বলে যে হঠাৎ একদিনও কিছু হবে না, তার কোনো মানে নেই। সাবধান হতে দোষ কী?'

আর ওদিকে?

লিলিও কাজের লোক দুটোকে পাখি পড়াচ্ছে!

'একদম অন্যমনস্ক হবে না। মা বাপীর যখন যা যা লাগে মনে রাখবে। মনে রাখবে পারুলদি, তুমি কিন্তু মোটেই এর মধ্যে কামাইটামাই করবে না। মা আপনিও দুষ্টুমি-টুষ্টমি করবেন না। লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকবেন। টি. ভি.-তে কখন কী প্রোগ্রাম থাকবে আগে থেকে দেখে রাখবেন। নাহলে ঠিক সময়ে খুলতে ভুলে যাবেন।'

অনামিকা কী সেসব হিতবাক্যে কর্ণপাত করেন?

অনামিকার যেন মনে হতে থাকে, আচ্ছা বাপু আচ্ছা! ঢের গিন্নীত্ব হয়েছে। দু'দিন তুমি এসে একেবারে যেন আমার গার্জেন হয়ে বসেছো! এতদিন যেন আমি বেঁচে ছিলাম না।

হঠাৎ মনে হয়, সেই বৌবেলায় যখন তাঁর ননদ, যদি দু'চারদিনের জন্যে কোনোখানে তীর্থটির্থ করতে যেতেন, তারকেশ্বর কী নবদ্বীপ শান্তিপুর। তিনিও এইরকম যাবার সময় পর্যন্ত বকবক করতেন। আর অনামিকা ভাবতেন, আচ্ছা বাবা। তুমি গাড়িতে গিয়ে ওঠো তো! হাঁফটা ফেলে বাঁচি। তারপর যা করবার করবো।

ওদের ট্যাক্সিতে ওঠা দেখে তবে ভিতরে চলে এলেন অনামিকা।

সুরঞ্জন তখনো বাইরে। পাড়ার কে একজন এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিই জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ছেলে বৌ বাচ্চারা কোথায় গেল? আবার বদলিটদলি হলো না তো?

যেন তাতে একটু ইতিবাচক উত্তর পেলেই খুশি হন। তা তাঁকে আর খুশি করা গেল না।

অনামিকা ঠিক করে ফেলেছিলেন, লিলি যতই গার্জেনি করুক, তিনি পারুল আর মালতীর মাকে বলবেন, বৌমা তোদের যতই কড়কে দিয়ে যাক, এ দুটো দিন তোরা একটু ছুটি নিয়ে বাঁচ! আমাদের দুটো বুড়ো-বুড়ির কতই বা কাজ? বৌমা তো বলে গেল ফ্রীজের মধ্যে তিনদিনের মতো মাছ রান্না করে রেখে গেছে ; বাকি যা আমিই করে নেব।

ট্যাক্সি চলে যাবার পর ভিতরে চলে এলেন!

সঙ্গে সঙ্গে ওই কাজের লোক দুটোও। ওরাও তো দাদা বৌদির যাত্রা দৃশ্য দেখতে অনামিকার পিছু পিছু গিয়েছিল। কিন্তু এক্ষুণি কথাটা বলতে যেন একটু লজ্জা করলো! শুধু রান্নাঘরের দৃশ্যটি অবলোকন করতে এলেন। কিন্তু দেখে যেন সেই নিজে চালিয়ে নেবার ইচ্ছেটা উবে গেল। যেন একটা অপরিচিত জগতে এসে

দাঁড়ালেন।

সবটাই ভোল বদলেছে।

অনামিকা মাটিতে বসেই হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে সবকিছু টেনে নিয়ে কাজ করতেন। বঁটি কাটারি চাকি বেলুন চায়ের জল গরমের কেটলি আরো কত কীই সাজানো থাকতো ওই গ্যাস সিলিন্ডারের পাশে নীচু সেল্ফটায়। সেই সেল্ফটাই অন্তর্হিত! অন্তর্হিত নীচু বেঞ্চে সাজিয়ে রাখা মশলাপাতির কৌটো বা কটা শিশি। চোখ বুজে হাত বাড়িয়ে চিনে নিতে পারতেন কোন্টা হিং, কোন্টা কালোজিরে, কোন্টা মৌরী, কোন্টা রাঁধুনী! টুকটাক কিছু খাবার করতে এগুলো লাগতো।

হাঁটুর ব্যথার জন্যে ওঠাউঠিটা যতো কম করতে হয়, তাই সব রাখা ছিল হাতের কাছে। এমন কী নির্মাক কাটা সরু ছুরিটা পর্যন্ত। তাদের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলেন না অনামিকা। ঘরে আলাদা একটা নতুন সেলফ, তার মধ্যে রকমারি রান্নার বাসনের সম্ভার। প্রেসারকুকারেই যে রান্না হয়, তা বোঝা গেল। যেটা কোনোদিন ব্যবহার করে দেখেননি অনামিকা। সাধ ছিল, কিন্তু কবে সে সুযোগ পেলেন?

পুরনো বাড়ির সেই সিমেন্ট গাঁথা জোড়া উনুন সম্বলিত রান্নাঘরের পর এখানে এসেই কেনা হয়েছিল একটা, কিন্তু ব্যবহারবিধি শেখবার আগেই তো সংসার সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

মনে মনে ভাবলেন, জীবনটা হাতে পেয়েছিলাম মাত্র। সঙ্গে সঙ্গেই হাত থেকে পিছলে গেছলো।

এখন আর তাকে কোনোদিন খুঁজে পাবো না!

ওদের আর ছুটি দেওয়া হলো না।

চলে এলেন দোতলায়।

তারপর সুরঞ্জন এলেন। বললেন, "ওই এক ভদ্রলোক বাবা! কথা ধরলে আর ছাড়বার নাম নেই। ছেলে অন্য কোথাও যাচ্ছে না, শুধু বৌমার মামাতো ভাইয়ের কাছে টাটায় যাচ্ছে, যেন বিশ্বাসই করছে না! তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়েদের মতো জিজ্ঞেস করা নতুন তিনতলায় কে থাকে, আমরা কোন্ তলাটা ব্যবহার করি। তোদের এ নিয়ে অতো মাথা ব্যথা কেন রে বাবা?"

তারপরই চুপ করে বসে থাকা অনামিকার কাছে এসে আস্তে একটু গায়ে হাত দিয়ে বলেন, খুব মন কেমন করছে? না? ছেলেমেয়ে দুটো যেন মায়ার পুতুল। কতক্ষণ যে মুখ বাড়িয়ে টা টা করলো।

অনামিকা সহসা একটু লজ্জিত হলেন।

ঠিক এই বিষণ্ণতার মুহূর্তে কী তিনি ওই মায়ার পুতুল দুটোর কথা ভাবছিলেন?

অনামিকাকে বলতে হলো না। পরদিনই মালতীর মা নিজেই বলে ফেললো, 'বৌদিদি যেন জানতে না পারে মাসিমা, বলছিলুম বিকেলে বেলাবেলি আপনার আর মেসোমশায়ের রাতের খাবারটুকু তৈরি করে, সব গুছিয়ে ওপর তলায় উঠিয়ে দিয়ে রেখে, একটু ঘুরে আসতুম। বেশি রাত করবো না। সন্ধ্যেবেলায় ফিরে আসবো!

এখন তো আর দুয়োর খোলো বন্ধর জন্যে আপনাদের নীচের তলায় নামতে হয় না। দাদাবাবু অন্য সব বাড়ির মতো দরজায় নতুন কল বসিয়ে দেছে।

অনামিকা এতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু বলেন, 'বৌদিদি জানতে পারলে, হাতে মাথাটা কাটবে তোর?'

মালতীর মা জিভ কেটে বলে, 'না বাবা। অমন কথা বোলো না, বৌদিদির গুণের তুলনা হয় না। তবে পৈ পৈ করে বলে গেছে কি না, মেসোমশাইয়ের রুটিটা গরম গরম সেঁকে দিতে। ভালো করে, সেই 'খাবার গরম থাকবার কৌটোটায়' ভরে রেখে যাবো।'

অনামিকা বলেন, 'আচ্ছা বাবা যাস। কেউ তোর বৌদিদির কাছে লাগাতে যাবে না। আমি যখন নিজে চালিয়েছি, রোজই কী আর গরম করে দিতে পেরেছি?'

তখনকার সেই দুপুরে সেরে নেওয়ার দৃশ্যটি চোখে ভেসে উঠলেও, কাজের লোকের কাছে ওই ভাবেই বলেন অনামিকা।

হ্যাঁ ওই 'খাবার গরম থাকা কৌটোটি' অনামিকাই কিনেছিলেন বটে, তবে 'কতক্ষণই বা গরম থাকবে?' এই ভেবে তেমন ভালো করে ব্যবহার করেনি।

আচ্ছা খোকা বিয়ে হয়েই বৌ নিয়ে বিদেশ চলে যাওয়ার পর কোনটাই বা ভালভাবে ভোগ করেছেন অনামিকা? বাসনপত্র বিছানা বালিশ চাদর মশারি এমন কী নিজেদের পরনের পরিচ্ছদ পর্যন্ত। প্রথমটা মনে করেছেন, 'থাক ওরা এলে নতুনটা ব্যবহার করবো।' আর অতঃপর ওদের আসা সুদূরপরাহত হয়ে ওঠায়—মনভাঙা হয়ে ভেবেছেন, 'এই দুটো বুড়ো-বুড়ির জন্যে এতো কী দরকার? কী হবে সংসারটাকে ছড়িয়ে সাজিয়ে কাজ বাড়িয়ে?'

তাই ক্রমশঃই প্রয়োজনটাকে সংক্ষিপ্ত করে এনেছেন।

তাছাড়া টাকার সমস্যাও তো ছিল।

বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা গ্রহণ করতে যেসব ঝঞ্ঝাট, তা এড়াতে, ছেলেকে সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। বলেছেন 'ওনার পেন্সনেই যে চলে যাবে।' বাড়ির একাংশ ভাড়া দেওয়াতেও ছিল পরম আপত্তি।

বেশ চলার কথা নয় কারণ বাজারদর তো উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তবু একটা যেন নেশার মতো পেয়ে বসেছিল, 'যত কমে চালানো চায়। কত কমে চালানো যায়।'

ওই কৌটোটার কথা শুনে দুঃখটা উথলে উঠলো।

জীবনটা পেলাম না কোনোদিন।

অনেকদিন পরে আজ আবার নির্জন নিঃসাড় বাড়িতে সন্ধ্যার অন্ধকারে আলো নেভানো বারান্দায় বসে রয়েছেন দুটি প্রাণী।

মুখোমুখি।

মালতীর মা সামনে পাতা ওই চায়ের টেবিলটাতে দুজনের খাবার গুছিয়ে রেখে গেছে। বার বার বলে গেছে—'সকাল করে খেয়ে নেবেন গো মাসিমা। তবে আমি বেশি দেরি করবো না। তবু দরজার চাবির একটা ডুপ্লিকেট আমাকে দিয়ে রাখুন। এসে আর আপনাদের বেল বাজিয়ে বিরক্ত করতে হবে না।'

অতএব ধরে নিতে হবে যতো ইচ্ছে দেরি করেই ফিরবে সে!

তা তাই ফিরুকগে।

আজ আর ইচ্ছে করছে না তৃতীয় ব্যক্তি কেউ এখনি এসে পড়ুক।

মনে হচ্ছে যেন কত কতদিন পরে এমন একখণ্ড নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ সময় পেয়েছেন অনামিকা। অদ্ভুত একটা হালকা আর মুক্তি মুক্তি ভাব আসছে যেন।

কতদিন পরে বসেছেন এমন।

বছরও তো ফেরেনি। মাসের হিসেবেই আছে এখনও। অথচ মনে হচ্ছে যেন যুগযুগান্তর পরে। কিন্তু যখন দিনের পর দিন এই নৈঃশব্দের মধ্যে সন্ধ্যা কাটিয়েছেন, তখন তো মনে হতো না, এটা একটা 'পাওয়া'। বরং উল্টোটাই মনে হতো। আজ মনে হচ্ছে, যেন এই সন্ধ্যাটা একটা প্রাপ্তি।

খানিক আগে বোধহয় একটু বৃষ্টি হয়ে গেছে। সামান্য ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। উঠে বারান্দার কাঁচের জানালাগুলো বন্ধ করলে হয়। কিন্তু দুজনের কেউই তাতে তৎপরতা দেখাচ্ছেন না।

কতদিন ধরে কেবলই ভাবতেন, বাবাঃ একটু মন-প্রাণের কথা বলবার সুবিধে হয় না। সুরঞ্জন যেন হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন এই হাতের মুঠোয় পেয়েও, কথা বলছেন কই অনামিকা?

তিল তিল করে কত কথাই তো জমা হয়ে চলেছিল এতদিন ধরে।

ছোট কথা?

সংকীর্ণ কথা?

মলিন কথা?

যেমন কথা উচ্চারণ করে ফেলতে লজ্জা হবার কথা?

তা হোক। তবু তো সেইরকম সব কথাই তো বলে ফেলবার জন্যে আকুলতা এসেছে। জগতে এই একটা মানুষই তো আছে, যে সেই 'ছোট কথার' দায়ে অনামিকাকে অবজ্ঞার চোখে দেখব না!

কিন্তু বলা হয়নি।

সুযোগ হয়নি, অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যায়নি।

যেমন যেতো না সেই অতীতে। বধূ জীবনে।

কত কথা না বলা হয়ে থেকেছে।

তবু তখন যেন সবই সয়ে গেছে, 'দিন পাবার' আশায়। আসবে বৈকি একদিন সেই দিন। অনামিকার স্বামী যেটা এনে দিতে পারেননি, সেটা এনে দেবে অনামিকার ছেলে।

অনেক বিষণ্ণ হতাশার কাল পার হয়ে এসে তো গেলো সেই প্রত্যাশিত দিন। তবু কেন অহরহ অনামিকার মধ্যে তিলে তিলে কথা জমে উঠতে চেয়েছে?

নিষ্ফল আক্রোশে তাকিয়ে দেখেছেন ওই সদা হাস্যমুখ, যেন সদাই আহ্লাদে ভাসা মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে।

ওর মনের মধ্যে কেন কোনো 'কথা' জমে ওঠে না?

তিনতলাটা ভালো করে বন্ধটন্ধ করে রেখে যাবার জন্যে বলে রেখেছিলেন সুরঞ্জন, ছেলে বৌ দু'জনকেই। তবু একবার উঠে দেখে এলেন। দোতলার সিঁড়ির কোলাপসিবলটা বন্ধ করে দিয়ে সুইচ নিভিয়ে বারান্দার ধারে চেয়ারে বসে থাকা অনামিকার মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে এনে গুছিয়ে বসে, প্রথমটায় বলেছিলেন, সুরঞ্জন, 'টিভি খোলোনি যে? বাংলা ভালো কিছু নেই বুঝি?'

'কি জানি। দেখিনি।'

'দেখবো কী আছে?'

নাঃ থাক।

আর কিছু কথা বলেননি দু'জনের একজনও।

যেন একটা নিথর সমুদ্রে ডুবে গেছেন দু'জনেই।

সুরঞ্জন আজকাল আর সেই আগের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে ইজিচেয়ারে পড়ে থাকবার সুযোগ পান না। বসবার ঘরটাতেই বসতে হয়, দুটি প্রাণের পুতুলকে নিয়ে। মেয়েটা কেবল গল্প শুনতে চায়। কাল যাবার সময় বলে গেছে, 'ফিরে এসেই স্কুল দাদু। আর গল্প শোনা হবে না!'

কিন্তু এখন কী সেই কথাই ভাবছেন সুরঞ্জন?

নাঃ। সুরঞ্জন ভেবে চলেছেন, 'এতো সুখ, এতো আনন্দ, এতো ভাগ্য! সমস্তটাই প্রাপ্তি আর পূর্ণতায় ভরা, তবু এখনো হঠাৎ হঠাৎ খুব শূন্যতা বোধ আসে কেন? কেন হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় মস্ত একটা দামী জিনিস হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

কী সেটা?

সারাজীবন কর্মক্লান্তির মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত জীবনের যে রঙিন ছবিটি মনে মনে লালন করে এসেছিলেন সুরঞ্জন সেটিতো কিছুটা বিঘ্ন বিপত্তির পর অবশেষে সম্পূর্ণই পেয়েছেন। সেই রঙিন ছবিটি তো হচ্ছে পুত্র পুত্রবধূ নাতি নাতনীতে ঘেরা একটি সচ্ছল সুখী সংসার। যে সংসারে কুটিলতা জটিলতা নেই, মনান্তর মতান্তর বিরোধ সংঘর্ষ নেই। ঠিক যেমনটি প্রার্থনা ছিলো পেয়ে গেছেন হাতের তালুতে; বুঝিবা চাওয়ার অতিরিক্তই পেয়েছেন।

তবু কেন তালুটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে?

মনে হয় বরাবর হাতের মুঠোয় ভরে থাকা যে খুব একটা বড় সম্পদ ছিলো সেটা যেন কখন হাত থেকে পড়ে হারিয়ে গেছে।

সেই সম্পদটার নাম কী?

এই অন্ধকারে বসে বসে কী সেইটার নাম খুঁজছেন সুরঞ্জন!

আর অনামিকা?

তিনি যেন আজ একটু সময় পেয়ে তাঁর সারাজীবনের ইতিহাস হাতড়ে দেখতে বসেছেন, সেই কৈশোর যৌবন থেকে ভেবে এসেছিলেন তাঁর একটা 'জীবন' পাবার ছিল, সেই পাওনাটা কী তাহলে শূন্যের অঙ্কেই মিলিয়ে গেল?

হ্যাঁ বধূজীবনে প্রবেশের পর থেকে অবিরতই আশা প্রত্যাশায় স্পন্দিত হয়েছেন। 'পাবো। পাবোই একদিন।'

সারাজীবন যেন অসহায়তা আর প্রতিকূলতাকে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছিলেন

সেই প্রাপ্তির পথের দিকে। কিন্তু তার পরই তো হাতে পানপাত্রটি চমুক দেবার আগেই ভাগ্য সরিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু দীর্ঘদিন মরুভূমির তৃষ্ণার পর আবার সেই পূর্ণ পানপাত্রটি হাতে এসে গেছে অনামিকার।

তবে? তবে তৃষ্ণা মেটার পরিতৃপ্তিটা কোথায়?

কেন এখনো মনে হচ্ছে, 'যা পাবার ছিলো পেলাম না। কোনোদিনের জন্যে পেলাম না আমার চিরপ্রার্থিত 'নিজস্ব' একটি জীবন।'

আজকের এই নিভৃতির অবকাশে, কথাদের সরিয়ে রেখে নিজের সারাজীবনের গুটিয়ে রাখা ইতিহাসখানি বিছিয়ে ধরে তন্ন তন্ন করে দেখে চলেছিলেন অনামিকা।

হঠাৎ একটা জায়গায় এসে থমকে থেমে পড়ে আকস্মিক একটি আবিষ্কারে যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন অনামিকা!

পেয়েছিলেন বৈকি!

পেয়েছিলেন তো সেই জীবন, দীর্ঘ দশটি বছর।

অথচ অবোধ অনামিকা সেই প্রাপ্তির অনুভূতির দিকে না তাকিয়ে, অবিরত নিঃশ্বাস ফেলে চলেছিলেন, 'পাওয়া হলো না! পাওয়া হলো না' বলে।

এখন থমকে তাকিয়ে দেখছেন, জীবন ইতিহাসের ওই অধ্যায়টুকুই সোনার জলে লেখা হয়ে রয়েছে।

এ যেন সেই 'পরশপাথর খুঁজে বেড়ানো ক্ষ্যাপার অবস্থার মতো। ক্ষ্যাপা কেবল অভ্যাস মতো 'নুড়ি কুড়াইতো কতো, ঠন্ করে ঠেকাইতো শিকলের পর। চেয়ে দেখিত না নুড়ি, দূরে ফেলে দিতো ছুঁড়ি, কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশপাথর।'

অনামিকাও যেন তেমনি কেবল অভ্যাস মতো দিনরাত্রির চাকায় ঘুরে ঘুরে দিনগুলো কাটিয়ে এসেছেন, তাকিয়ে দেখেননি এটাই তার প্রাপ্তির খাতায় জমা পড়ে চলেছে।

সংসার ক্ষেত্রের যে ক্ষুদ্র যন্ত্রটির একান্ত কেন্দ্রবিন্দুতে কেবলমাত্র 'আমি', কেবলমাত্র সেই 'আমি'র একাধিপত্য, যে 'আমি'টার কোনো দায়বন্ধতা নেই অপরের ইচ্ছা অনিচ্ছার মুখ চেয়ে পা ফেলবার। সেই দায়বন্ধতাহীন সময়সীমাটুকুই তো 'জীবন।' সেটা যে যতটুকু পেলে। বাকি জীবনটা তো পরমায়ুর ঋণশোধ করে চলা।

যদি কেউ আদৌ কোনোদিন সে 'জীবন' না পেলে তো না পেলে, কার কী করবার আছে?

তবে পেয়েও টের না পাওয়া এই অনামিকার দলও তো সংসারে কম নয়। খেয়াল করে না কখন 'ফেলেছে ছুঁড়ে পরশপাথর।' আর কপাল চাপড়ায় 'জীবন' পেলাম না বলে।

অন্ধকারে নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে বসে থাকা দুটো মানুষের একজন ভেবে পাচ্ছে না 'কী' হারিয়ে ফেলেছে। আর অপরজন অবাক হয়ে দেখছে 'কী পেয়েছিলাম'!

কী সেটার নাম? ভয়হীন দায়হীন একটা 'আমি'কে পাওয়া?

এমনও হতে পারে

এক

এমা! বলিস কী? এ যে স্রেফ মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা! একেবারে ছাঁদনাতলায় প্রথম 'চারিচক্ষুর মিলন।' ওরে সোমা—হিহি—

পুনোমা রুচিরা আর স্বাতী হেসে প্রায় সোমার গায়ের ওপরই গড়িয়ে পড়ে। তুই বাবা মানুষ খুন করতে পারিস। একবারও চক্ষে না দেখেই সোজা গিয়ে লোকটার সঙ্গে ফুলের বিছানায় শুতে যাবি! ভাবা যায় না!

এদের আক্রমণে সোমা অবশ্যই একটু বিপন্ন বোধ করল, তবু মুখে জোর দেখিয়ে বলল, সেটাই তো বেশি রোমাণ্টিক। না পড়া বইয়ের মত। যত পাতা উল্টোতে থাকব ততই চমক।

থাম বাবা! আর হাসাসনে।

পুনোমা বলল, ওসব তো সেই কী বলে ছেঁদো কথা! বুকে হাত দিয়ে বলতো, এটাই তোর বরাবরের মত ছিল।

সোমা তবু লড়ে যায়, 'তোদের মত আমি অমন বরাবর বর আর বিয়ের চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। স্টুডেণ্ট লাইফে 'অধ্যায়নই তপস্যা' তা জানিস না? না কি মানিস না? এতদিনে মোটামুটি লেখাপড়ায় একটা দাঁড়ি পড়ল। তবেই মা-বাবাকে বললাম, 'ঠিক আছে এখন তোমাদের যা-ইচ্ছে কর।'

পুনোমা একটু চুকচুক করে বলে, তা' সত্যিরে রুচি। এই গবেটটা এ যাবৎ কেবল ঘাড় গুঁজে পড়েই এসেছে। হিহি আজ পর্যন্ত একখানাও প্রেমিক জোটাতে পারেনি। হৃদয়টাকে তালাচাবি দিয়ে রেখে দিয়েছে। যবে সেই সাতপাকে বাঁধা পড়া পরম গুরুটিকে হাতের কাছে পাবে তবে সেই চাবিটি তার হাতে তুলে দিয়ে বলবে এই দ্যাখো, হিসেব মিলিয়ে নাও, একেবারে আনটাচড্।

আবার হেসে গড়ায় পুনোমা। রুচিরা স্বাতী আরো বেশি।

সোমা এমন বোকা নয় যে রেগে উঠে ওদের হাসির ঢেউটা আরো বাড়িয়ে দেবে। যদিও ভিতরে ভিতরে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল। নিজেকে যেন একটা 'বেচারী' বলে মনে হচ্ছিল। অপদস্থও লাগছিল। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে হাতের ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে বলে তা বেশ বাবা, আমি খুব গাঁইয়া। এই গাঁইয়াটার বিয়েতে যাবি তো? না কী যাবি না? 'মধ্যযুগীয় বিয়ে আবার কে দেখতে যাবে' বলে নাক কোঁচকাবি?

আহারে! তা আর নয়?

পুনোমা রুচিরা স্বাতী তিনজনেই এক সঙ্গে হৈ হৈ করে ওঠে, 'বিয়েতে যাব না? তোর বিয়েতে! আমাদের এই 'দুষ্ট চতুষ্টয়ের' মধ্যে তুইই প্রথম কৌমার্য ভাঙতে চলেছিস।

'দুষ্ট চতুষ্টয়' এই বিশেষণটি ওদের নিজেদেরই দেওয়া। যদিও সোমা ঠিক ওদের ধরনের নয়, তবু সেই কলেজে ঢোকা পর্যন্তই ভাব। এই ভাবটা বয়েসের

উচ্ছ্বাসের, এবং সত্যি বলতে—সঙ্গ সুখের। এদের মধ্যে কেউই অন্তত সুপর্ণা বা দ্যুতির মত উন্নাসিক নয়।...

সুপর্ণা অবশ্য খুব স্ট্যাটাস সম্পন্ন অভিজাত ঘরের মেয়ে। তার চলনে বলনে চাওনিতে ভঙ্গীতে সেই পরিচর্যাটি যেন ঠিকরে পড়ে।...দ্যুতি ওর মত অতটা নয়। তবে দ্যুতি সুপর্ণার 'চামচা' তুল্য। এই তুলনাটি স্বাতীর আবিষ্কার।... স্বাতীই বলেছিল একদিন, এই তোরা 'চামচা' মানে জানিস তো?

চামচা!

হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ। আকাশ থেকে পড়লি যেন সবাই। মানে না জানিস তো দ্যুতিটাকে দেখে বুঝেনে। স্রেফ সুপর্ণার চামচা।... আমার মতে ওর নামের বানানটা একটু বদলে দেওয়া উচিত। দ্যুতি নয় 'দূতী'। সুপর্ণা তো এমন ডাঁটের ওপর থাকে, ভাব দেখায় যেন কারুর সম্পর্কে ওর কোন কৌতূহল নেই! কারুর কোন খবরে ওর দরকার নেই। আসলে কিন্তু ভীষণ ইয়ে। কে কখন কার দিকে তাকালো, কে কার দিকে তাকিয়ে হাসল, কোন জুটিটি বেছে-বেছে একই সময় একসঙ্গে লাইব্রেরীরুমে ঢুকল, এসব খবর ঠিক জানা চাই। তা 'দূতী'ই সেই সংবাদ সরবরাহকারিণী। দেখেছিস তো আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কেমন গায়ে পড়ে ভাব জমাতে আসে, কারণটা আর কিছুই না খবর জোগাড়।

সহপাঠিনী হলেও একবার 'বিরোধী পক্ষ' বলে ভাবতে শুরু করলে ক্রমশই এহেন সমালোচনার চাষ বাড়তেই থাকে।...আসলে এটাও হয়ত আড্ডার একটা রস।

এরা চারজনই যে একদম একই অবস্থার তা নয়। একটু এদিক-ওদিক তো থাকবেই, তবু কেমন করে যেন একই শিবিরের হয়ে গেছে।...কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে সর্বদাই প্রায় চারজনে একই সঙ্গে। পুনোমাই তাই একদিন হেসে হেসে বলে, এই আমাদের দেখে অন্যেরা কী ভাবে বল তো? 'দুষ্ট চতুষ্টয়?'

সে কথা ছেলেগুলোর কানেও পেঁৗছেছে বৈ কি। তাদের মধ্যে ফাজিল মার্কা দু'একজন ওদের দেখলেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'ওই যে 'দুষ্ট চতুষ্টয়।' কী মতলব ভাঁজছেন কে জানে।'...কোন কোন দিন হয়ত একজনকে দলে না দেখলে, দেওয়ালকে শুনিয়ে বলে, 'আহা আজ বুঝি শুধুই ত্রি-শক্তি সম্মেলন! আর একটির কি হল?'

এ সেই সেকাল নয়. যে-কালে ছেলেরা কলেজে ঢুকলেই তাদের 'যুবক' বলা হত, আর 'এম. এ'র ছাত্রকে রীতিমত ভার-ভারিকী 'ব্যক্তি' বলে ধরা হত আর তার সম্পর্কে 'করেছেন,' 'বলেছেন' বলে উল্লেখ করা হত। একালে এই এম.-এ.-র ছাত্রদেরকেও 'ছেলে' বলেই অভিহিত করা হয়! তাদের মধ্যেও প্রায়শই সেই হালকা চপলতা।

ওই সব দেওয়ালকে শুনিয়ে কথা বলাবলির মধ্যে প্রেমে পড়াপড়ির ব্যাপারও ঘটে বৈকি। পরে কার সঙ্গে কার কতটা ধোপে টিকবে ভবিষ্যৎই জানে, তবে আপাতত প্রায় সকলেরই কেউনা কেউ একজন 'নিজজন' আছে।...বাদে ওই গবেট মার্কা সোমাটা!

সোমা বলে 'থাম বাবা, তোদের 'ওর' গল্প আর শুনতে চাই না। যা পড়তে

এসেছিস তাই পড়। এখন এই প্রেমে পড়তে যাবার দরকারটা কি? শুধু সময় নষ্ট আর ব্রেন নষ্ট।'

ওরা হিহি করে হাসে, বলে খুকু! এখনো মায়ের দুধ খাস না তো? তবে ওদের ভাষায় তো প্রেমে পড়া নয়, 'প্রেম করা।'

কে কটা প্রেম করছে, অথবা এখন কে কার সঙ্গে প্রেম করছে, সেই আলোচনাতেই আড্ডা জম্পেস হয়ে ওঠে।

গবেটটা গবেটের মত কাজই করে বসেছে। কোনখানে কিছু নেই, হঠাৎ বন্ধুমহলে একেবারে বিয়ের নেমন্তন্ন পত্তর নিয়ে হাজির।

পরীক্ষাটা শেষ হয়েছে বটে, তবে এখনো তো রেজাল্ট বেরোয়নি।...কে রিসার্চের সুযোগ পাবে আর কে হয়ত পাবে না। তাই নিয়ে মনের মধ্যে চিন্তার খেলা।... মুখে অবশ্য সকলেই বলছে আমার কথা বাদ দে! আমার যা হবে তা' বুঝতেই পারছি।

পুনোমা আর রুচিরা 'পূবালী ম্যানসনের' একই ব্লকে থাকে, একজন চারতলার ফ্ল্যাটে, আর একজন দোতলার ফ্ল্যাটে। স্বাতীরা ফ্যাটের নয়, পুরনো পাড়ার বাসিন্দা। সোমাও তাই। তবে সোমাদের বাড়িটা স্বাতীদের মত তিন পুরুষের নয়, বাবারই তৈরি বাড়ি। ছোট্ট দোতলা বাড়ি। বাড়িতে লোক সংখ্যাও কম। মা বাবা সোমা আর ছোট ভাই!

তা'বলে মোটেই খুব একটা কট্টর রক্ষণশীল নয় সোমার মা বাবা! প্রেমে পড়ে বিয়ে, অথবা 'প্রাক বিবাহ পরিচয়' ইত্যাদি বাজার চলতি ব্যাপারটাকে তাঁরা ভয়ানক গর্হিত কিছু ভাবেন না। ধরে নেন এমন তো হচ্ছেই। তবে মেয়ে পাড়ার কোন একটা মস্তানের প্রেমে পড়ে বসলে কি হত বলা যায় না। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁরা কিছুটা নিশ্চিন্ত।...মেয়ের স্বভাবের মধ্যেই একটা রক্ষণশীলতা আছে এটি তাঁরা অনুধাবন করে থাকেন।

অতএব সোমার মা বাবা যে খুব ব্যস্ত হয়ে মেয়ের পড়া সাঙ্গ হতে না হতেই বিয়ের ব্যবস্থা করছেন এমন নয়, 'পাত্রটি প্রায় আপনি হাতের কাছে এসে পড়েছে এবং বলতে গেলে 'দারুণ পাত্র।'

এরা অন্তত তাই বলে উঠল, পুনোমা রুচিরা স্বাতী। 'তা এতো দেখছি বাজারদর হিসেবে দারুণ পাত্র। তা'হলে অমন মধ্যযুগীয় প্যাটার্নে রাজি হচ্ছে যে?

সোমা একটু হাসল, যতদূর শুনেছি প্যাটার্নটা নাকি ওর নিজেরই।

তার মানে?

মানে-টানে জানি না বাবা, শুনলাম, 'ওই এক অদ্ভুত ছেলে। ঠাকুমা যা বলে তাই শিরোধার্য। ওর ঠাকুমা নাকি বলেছে একবার চোখে দেখে, কি বড়জোর দশদিন মেলামেশা করে একটা মানুষের কতটুকু বোঝা যায় রে?...মিছিমিছি একটা অদিনে অক্ষণে দেখাদেখি কেন? শুভক্ষণের একটা মূল্য আছে, সে সময় দেখা হওয়াই 'শুভদৃষ্টি।'

মাইগড্। সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৃদ্ধা মহিলার বচনটি শিরোধার্য? জানিনা বাবা। পেরে উঠবি তো?

বন্ধুদের এইসব মন্তব্য শুনতে শুনতে সোমা যে মনে মনে বেশ একটু দমে

যাচ্ছিল না তা বলা যায় না, তবু সোমার মনের জোরই তাকে রক্ষা করে।

তাই একটু হেসে বলে, দেখা যাক। না পারলে তো আইনের দরজা খোলাই আছে।

রুচিরা বলে, 'তা অবশ্য ঠিক। তবে সে সব তো আবার অনেক ঝামেলার ব্যাপার।

একবার চোখে দেখলে কিম্বা দু' চারদিন একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করলেই যে সে ঝামেলার হাত এড়ানো যায় তার কি কিছু গ্যারাণ্টি আছে?

এটাই যে ঠিক সোমার মতবাদ তাও নয়, শুধু নেহাৎ ত্রিশক্তি-তে মিলে তাকে বড্ড কোণঠাসা করে ফেলছে বলেই হাতের অস্ত্র হিসেবে মতবাদটা এখনই গড়ে উঠছে। অর্থাৎ ওকে হেরে যাবার ভয়ে অস্ত্র আমদানী।

যদিও সোমার মনটা মোটেই কুটিল নয়। তবু ওদের এই তিনজনে একযোগে সোমাকে পেড়ে ফেলে হ্যানস্থ করার ভাবটা তাকে বিরূপ করে তুলছিল, তাই একবার মনে হল হঠাৎ আমার ভাল একটা বর জুটে যাচ্ছে জেনে 'দীর্ঘ ঈ' হচ্ছে। তাই এত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।...তক্ষুনি মনে মনে লজ্জা পেল, ধ্যাৎ! আমি কী একটা বাজে কথা ভাবছি?...বন্ধুরা তো এমন ঠাট্টা করেই থাকে।

স্বাতী বলল, গ্যারাণ্টি অবশ্য কিছুই নেই, তবু দুম করে সেই পিতামহীর আমলের মত একটা বিয়ে করবি ভেবে বড্ড বাজে লাগছে।

সোমা কৌতুকের গলায় অমোঘ বাণী উচ্চারণের মত বলে, একটু ভুল করছ সখি! মেয়েরা বিয়ে করে না। মেয়েদের বিয়ে হয়।

ওঃ। তুই তাহলে নিজেকে সেই মাতার আমলের 'মেয়ে' বলেই মনে করিস?

আমার মনে করা না করায় কিছু এসে যায় না হে, যা ফ্যাক্ট তাই বলছি। এই যে পুনোমটা এখন এত চুটিয়ে দু'তিন খানা প্রেম করছে, শেষমেষ কিন্তু দেখবি সেই বিয়ে 'হচ্ছে।' তখন ওর প্রেমিকটি দিব্যি গোপাল অতি সুবোধ বালকের মত পুরো ব্যাপারটি গার্জেনদের হাতে ধরে দেবে!

ইস্। তা' আর নয়?

পুনোমা, হাতে নেমন্তন্ন চিঠিখানার দিকে একবার দেখে ফেলে বলে, সবাই তোর 'নীলাঞ্জনের' মত নয়।

তবে বলতেই হবে আমার লাকটাই খারাপ। আচ্ছা চলি। যাস কিন্তু!

রুচিরা বলে ওঠে, ওমা এক্ষুনি 'চলি' কিরে? এমন সংবাদটা নিয়ে এলি। একটু মিষ্টি খেয়ে যাবি না? রেগে গিয়ে চলে যাচ্ছিস বুঝি?

ধ্যাৎ। কি যে বলিস?...দেরি হয়ে যাবে রে! মা বলে দিয়েছে, দেরি না করতে।

তা ত বলবেনই মাসিমা। এখন রোদে ঘুরলে, নাওয়া খাওয়ার সময় পার হয়ে গেলে মেয়ের কনকচাঁপা বর্ণটি মলিন হয়ে যাবে না? বোস বাবা, দেখি ফ্রীজে কিছু আছে কিনা। মা তো বাড়ি নেই।

এই ফ্ল্যাটটা রুচিরাদের। রুচিরার মা একজন স্কুল মিসট্রেস, বাবা সরকারি অফিসের একটি মেজসেজ গোছের অফিসার। রুচিরার কোন ভাইবোন নেই, একাই। বাড়িতে তার নেহাৎই একাকীত্ব। এখন নিজের কলেজ-টলেজ যাওয়ায় পাঠ উঠে যাওয়া পর্যন্ত আরোই অসুবিধে কথা বলার সঙ্গী বলতে 'কাজের মেয়ে' পার্বতী।

...তবে আজকাল পুনোমা প্রায় বেশির ভাগ সময় চারতলা থেকে নেমে এসে এখানে

আড্ডা জমায়। ভাবভঙ্গী, নিজের ঘর বাড়ির মত। তাই বলে উঠল এই তোর ওঠার কি দরকার? পার্বতীকে ডাক না?

বলে নিজেই গলা তুলে ডাক দিল, পার্বতী!...এই যে দেখো তো ফ্রীজে কিছু মিষ্টি আছে কিনা?

পার্বতী বলল আছে। চন্দরপুলি আছে।

চন্দরপুলি? মার্ভেলাস। কে বানিয়েছে? তুমি?

না না, কাল মাসিমার দিদি বেড়াতে এয়েছিল, এনেছিল।

খুব ভাল। তাহলে তুমি একটু চা বানিয়ে ফেলতো! আর ওই চন্দরপুলি দুখানা—

সোমা বলল, এই না না এখন আর চা-টা নয়। দে ওই চন্দরপুলি না কি তাই দে। আর এক গেলাস ঠাণ্ডা জল।

এখন আবার 'ঠাণ্ডা জল' কেন মাণিক? মনের মধ্যে তো মলয় বাতাস বইছে।.. তো থাক। বলি পণ-টন নেবে না তো?

মাথা খারাপ! শুনলাম অর্ডার এসেছে 'প্রেজেনটেশান' বলেও যেন বেশি কিছু চালান করা না হয়।

যাক বাবা, তা ভাল। ভয় হচ্ছিল, যে রকম গুড্‌বয়, বোধহয় সব কিছুই 'গুরুজনরা যা ভাল বুঝবেন' বলে যায় দিয়ে যারে। তোকে কনে দেখতে কে কে এসেছিল? মানে বাড়িতে কে আছে-টাছে?

সোমা জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল, কনে দেখাদেখি কিছু হয়নি বাবা, বড়মাসির মেয়ের বিয়েতে গেছিলাম, সেখানে মাসির শ্বশুরবাড়ির কে যেন হয়, ননদ না ভাগ্নী বা ওইরকম একটা কিছু আমায় দেখতে পেয়ে একেবারে লটকে পড়লেন 'ছেলের বৌ করব' বলে। ব্যস।...ওইখানেই পাকা কথা।

রুচিরা বলল, 'এন্‌তার' সেজে গিয়েছিলি বুঝি?

সোমা একটু কৃত্রিম গর্বের ভঙ্গী করে বলল, কেন? 'এন্‌তার' সাজতে হবে কেন? আমি কম সুন্দরী না কি?

মানলাম বাবা! তোর শ্বশুর নেই? শুধুই শাশুড়ী?

আরে বাবা, আমি কী তাদের বংশতালিকা দেখে এসেছি?...মার মুখে মুখে যেটুকু জ্ঞান অর্জন। তবে যতদূর মনে হল শ্বশুর আছে খুড়শ্বশুর খুড়শাশুড়ী ইত্যাদি প্রভৃতি বহুবিধ সব আছে। দেদার লোক বাড়িতে।

ওরে বাবা! এহেন বিরাট ব্যাপার। তোর জীবন তো তাহলে মহানিশাদ হয়ে যাবে।

বাঃ কেন? আমার বড় মাসির বাড়িতে তো অগুণতি লোক। বুঝেই উঠতে পারা যায় না, কে কোনজন কার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক, মাসির কে হয় ওরা সব। তবু তো বেশ ভালই লাগে। সারাক্ষণ বাড়িটায় জমজমাটি কারবার। বড় মাসির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার তো নিজেদের বাড়িটা ঘুমন্ত পুরী বলে মনে হয়।

তার মানে তুই আগে থেকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করে বসে আছিস।...সেই আদ্যিকালের বুদ্যিবুড়ি ঠাকুমাটির সঙ্গে তো বসবাস করতে হবে? তিনি অবশ্যই সর্বদা নাকের উপর ছড়ি ঘোরাবেন। তাঁর আবার অমন অনুগত বাধ্য [illegible] পাত্তা [illegible] না।

সোমা বলল সে ভয় নেই শুনলাম তিনি নাকি দেশের বাড়িতে থাকেন।

তাই না কি? একা?

অত জানি না বাবা। দেশের বাড়ি পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে না কি—যা কানে এসেছে তাই বললাম। খাওয়া দাওয়াতো হল। এবার সত্যিই চলি। যাবি তো? বাইশ তারিখে। মনে থাকবে? মা ওয়ার্নিং দিয়ে রেখেছে এই যা দুদিন পথে পথে ঘুরে নাও এরপর আর বেরোতে দেওয়া হবে না। অবশ্য মাঝখানের এই তেরোটা দিন তোদের রোজ একবার করে ফোন করে মনে করিয়ে দেব।

অত দরকার নেই বাবা। তোর সেই ঠাকুমা লালিত বরটিকে দেখবার জন্যে নিজেরাই দিন গুনব।...তোরই বরং ভুল হয়ে যেতে পারে। নীলাঞ্জন মায়াঞ্জন হয়ে বিশ্ব ঢেকে দেবে।

বাঃ! না দেখেই?

কেন নয়? এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি—

বাঁশিই শুনলাম কখন? একেবারে অন্ধকারে ঝাঁপ!

সোমা চলে যেতেই রুচিরা পুনোমা আর স্বাতী একসঙ্গে সোমার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। হলেই বা প্রাণের বন্ধু এমন মওকা কেউ ছাড়ে? বাড়িতে এরা 'বন্ধু' সম্পর্কে ভীষণ গদগদ। সমীহও খুব। বন্ধুরা যেন গুরুদেব। মা বাবা কি বাড়ির অপর কেউ কারো সম্পর্কে একটু এদিক-ওদিক বলে ফেলুক দিকি? রক্ষে থাকবে না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সমালোচনা হয়েই যায়।...নিন্দে তো নয়। সমালোচনা।

বিশেষ করে আজ।

পুনোমা বলল, সোমাটা বরাবরই ন্যাদাড়ু আছে, তবু এরকম না দেখা না শোনা একটা বিয়ে করে বসবে জন্মেও ভাবিনি।...

সত্যি। আর বরের বাড়ির যা নমুনা শুনলাম ওর আর রিসার্চ-ফিসার্চ হয়েছে। অথচ ও নির্ঘাৎ ফার্স্ট ক্লাশ পাবে।

স্বাতী হিহি করে হেসে ওঠে, দেখা যাক এখন কোন রিসার্চ নিয়ে ডুবে যায়।

আচ্ছা—বলল বরটা নাকি ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনীয়ার গোল্ড মেডালিস্ট তা ছাড়াও আরো কি যেন একটা বলল। একবার নাকি বছর খানেকের জন্যে জাপানও ঘুরে এসেছে, তবু এমন সেকেলে কেন রে?

ভগবান জানে। কি জানি পাত্রপক্ষ বানিয়ে বানিয়ে ছেলের কোয়ালিফিকেশান শুনিয়েছে কিনা। গেঁয়ো বাড়িতে শুনেছি এমন করে। হি হি কন্যাপক্ষরা যেমন মেয়ের মায়ের রান্না খাবার খাইয়ে বলতো 'মেয়ে রেঁধেছে।' মেয়ের মাসি পিসির হাতের সেলাই বোনা দেখিয়ে বলতো 'মেয়ের হাতের কাজ।'

ধ্যেৎ। এখন আর ওসব আছে না কি?

পুনোমা বলল কী যে 'আছে' আর কী যে নেই তা বলা সহজ নয়। শুনেছি এই কলিযুগে সত্য ত্রেতা দ্বাপর, সবই নাকি কোথাও না কোথাও একটু আধটু রয়ে গেছে।

বিশ্বাস হচ্ছে। সোমাকে দেখে বিশ্বাস হচ্ছে ত্রেতা যুগের একটু আছে। দেখিস

সোমা একদম সীতা বনে যাবে। স্বাতী বলল, যাক আমিও পালাই। আর দেরি করলে মা বাড়ি ঢুকতে দেবে না।

দেখছিস মেয়ে হওয়ার এই এক জ্বালা।

অতি প্রগতিশীল এই স্মার্ট আর আপাতদৃষ্টে বেপরোয়া মেয়েরাও অকপটে স্বীকার করে ফেলল, 'মেয়ে হয়ে জন্মানোর আলাদা একটা 'জ্বালা' আছে।'

দুই

এদের এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোমার মুখের এবং অবধারিত মনের চেহারাও বদলে গেল। এদেব সামনে যে মনের জোরটা রাখতে চেষ্টা করছিল সেটা ঝিমিয়েই গেল।

একটা বিয়ে বাড়িতে পাত্রের মা পিসি বৌদিরা একবাব দেখলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পাকা কথা হয়ে গেল। এ আকস্মিকতায় সোমা বেশ একটু হতভম্ব হয়ে গেলেও, সকলে মিলে পাত্র সম্পর্কে এত উচ্ছ্বসিত হলেন, যে সোমা তেমন জোরালো প্রতিবাদ করতে পেরে উঠল না।

বাড়ি এসে মাকে অবশ্য 'একহাত' নেবার চেষ্টা করেছিল, কী ব্যাপার বলতো মা? তোমাদের অবস্থা দেখে যে মনে হল সেই যে রাজা মশাই অধৈর্যের শেষ প্রান্তে এসে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'কাল সকালে উঠে যার মুখ দেখব, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব' সেই রকম। বড় মাসির কে নাকি আত্মীয় ব্যস?

মা বলল, ছেলের রূপ গুণের কথা শুনলি? হাজারে একটা মেলে। সেধে চাইছে, আর 'না' বলব? আর সহজে অমন একখানা যোগাড় করতে পারব আমরা? . .বলতে যাচ্ছিল, তাছাড়া, একটুও দাবি দাওয়া নেই, বরং উল্টো। দেওয়া থোওয়াই বারণ, এমন কটা মেলে? .কিন্তু বলল না। ভাবল মেয়ে হয়ত ভেবে বসবে ও সস্তায় সারতে পারা যাবে বলেই বুঝি?

সোমা বলল, তা বলে, এরকম হঠাৎ?

মা মেয়ের মুখটি একবার নিরীক্ষণ করে দেখে আস্তে বলল, আর কাউকে পছন্দ-টছন্দ করে রাখিসনি তো? তাহলে বল বাবা?

সোমা বলল, বাজে কথা বোলো না তো। যাকে জামাই করবে, তাকে চক্ষে না দেখেই? কানা না খোঁড়া বেঁটে না মোটকা দেখবে না?

মা হেসে ফেলে বলল, তোর বড় মাসি কি আমাকে ঠকিয়ে মিথ্যে প্রচার করে তোকে ভাগ্নে বৌ করে নেবে? বড় মাসিকে তাহলে অবিশ্বাস করছিস বল? অথচ ছেলে বলেছে, 'মা'র পছন্দই শেষ কথা।'

বড় মাসিকে অবিশ্বাস। আঃ তাই যেন বলছি। তবে বিয়ে বাড়িতে সেই ভাগ্নে না ভাইপো কে যেন, নেমন্তন্নে আসেনি? তোমরাও তো একটু দেখে নিতে পারতে?

মা বলল, এখানে এখন থাকলে তো? বড়দি তো তাই দুঃখ করছিল। ঠিক এই

সময়ই অফিসের কাজে নাকি ভুবনেশ্বরে যেতে হয়েছে। সবাই বলল, হীরের টুকরো ছেলে, এমন ছেলে সহজে হয় না।

সোমা হেসে ফেলে বলে বিজ্ঞাপনে ভুলতে নেই সকলেই নিজের 'মাল'টি গছাবার জন্যে বেশি বেশি বলে।

ঠিক আছে বড়দিকে বলে পাঠাই, সোমার মত নেই!

ওঃ বাবা! অমনি মান হয়ে গেল? ওই কথা বল, আর তোমার প্রাণের বড়দি ভেবে বসুন, মেয়েটা বোধহয় পাড়ার ছেলের সঙ্গে ভাব করে মরেছে!

মাও হেসে ফেলে।

তারপর বলে, এত তাড়াতাড়ি আমারও অমত একটু—তবে এই মাসটাকে ছাড়লে এখন পরপর বিয়ের মাস নেই! ততদিনে কত কি হতে পারে।

সোমা লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলে ঠিক আছে বাবা। তোমাদের যা ইচ্ছে কর!

তিন

পাত্রপক্ষ কিছু নেবে না, এমন কি ছেলের ঘড়ি আংটি বোতামও নিষেধ বলেছে না কি সোনার বোতামের প্রশ্ন নেই। আর ঘড়ি-টড়ি তো রয়েইছে। ঠাকুম তো আগেই দুদুটো আংটি দিয়েছে।

এদিকে তাই সোমার বাবা সুতপন রায় মেয়ের বিয়ের ঘটা পর্বটি প্রাণভরেই করতে পারলেন। বিয়ে বাড়ি ভাড়া করে আলোক সজ্জায় পথচারীদের মুগ্ধ করে নিজেই আনন্দে বিহ্বল হল।

লোকজন এল বিস্তর।

সোমার এই ত্রিশক্তি তিনজন বাদেও, এল আরো বেশ ক'জন দলবেঁধে, দলীয় উপহার নিয়ে। আসবার সময় হেসে হেসে বলাবলি করছিল, হ্যাঁরে গিয়ে দেখব নাতো বরের মাথায় টিকি? 'ভটচায্যি'ও তো! যে রকম শুনছি! শুনলাম না কি কাল সকালে বরকনেকে সোজা ওদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে, দেশের বাড়ির ঠাকুর আর সেই বিখ্যাত ঠাকুমাটিকে প্রণাম করাতে। সে নাকি একটা অজ পাড়া গাঁ। বোঝ?

কিন্তু ফেরার সময় সে মুখরতা দেখা গেল না।...একে তো সোমার বাবা যে এতটা আয়োজন করবেন এ ধারণা ছিল না। তাছাড়া যাকে নিয়ে এত ঠাট্টা তামাসা তাকে দেখে রীতিমত চুপসেই গেল এরা। এমন একটা হ্যান্ডসাম এবং রীতিমত স্মার্ট 'বর' আশা করেনি তারা।

বেশি রাতে লগ্ন, তাই সেই 'শুভদৃষ্টিটি' না দেখেই বন্ধুদের ফিরতে হল। কিন্তু বিয়ের আগেই বর কেমন করে যেন সোমার সহপাঠিনীদের চিনে ফেলে দিব্যি গল্প বানালো এবং বলল দয়া করে আপনাদের ঠিকানাগুলো দিন দুজনে গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসব একটি স্পেশাল দিন ঠিক করে। আজ তো আপনারা পঞ্জিকার

নিষ্ঠুরতায় বাসর না কি দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরছেন, আর একদিন সুযোগ পাওয়া উচিত!

সোমার ছোট ভাই বারো বছরের রাজাকে দিয়ে সত্যিই ক'জনের ঠিকানা লিখে নিল, জেনে নিল ডিরেকশান।

এরপর আর কি করে তার গাঁইয়ামির কথা তুলে মুখর হওয়া যায়?

অতএব ফিরতি বেলায় আলোচনা, সোমাটা দারুণ লাকী!

স্বাতী বলল, বলা যায় না হয়ত সোমাটা ফাস্টক্লাশই পেয়ে যাবে, আর রিসার্চের সুযোগও পেয়ে যাবে!

রুচিরা বলল, শুনেছিলি তখন কি বলছিল—জিজ্ঞেস করছিল, পরীক্ষা দিয়ে এসে অবশ্য সকলেই বলে, একদম বাজে দিয়েছি, ফেলও করতে পারি, মেয়েরা তো বেশিই বলে, তবে আপনাদের কি ধারণা আপনাদের বন্ধুটি সম্পর্কে? মানে যে বন্ধুটিকে আমি লাভ করতে চলেছি।...তার মানে অঙ্ককষা কথা, 'লাভ করেছি নয়, লাভ করতে চলেছি।'

পুনোমা বলল, তা বলতেই হবে সোমা একখানা দেখালো বটে!

এই মেয়েরা তর্কের সময় জোর গলায় ঘোষণা করে 'বিবাহ প্রথা তুলে দেওয়া উচিত' 'বিয়ে মানেই দায়িত্ব।' ..'বিয়ে হচ্ছে—মেয়েদেরকে ইঁদুরকলে ফেলবার মত একটা কল..এবং স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে পুরুষ কারোরই বিয়ে করা উচিত নয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত তো জীবন স্রেফ অর্থহীন'। তারাই অনায়াসে (বোধ হয় অসতর্কেই) ঘোষণা করে সোমাটা দারুণ লাকী!

চার

অজ পাড়াগাঁ বলে হ্যানস্থা করতে চাও করো। প্রতিবাদ করতে আসার মত এনার্জি কারো নেই, তবে খাস কলকাতা থেকে মোটরে মাত্র ঘণ্টা আড়াইয়ের মধ্যে চলে আসতে পারা যায় এই 'গগনপুরে'। গ্রামটার চেহারাটা প্রায় শহরতলীর মত। যেমন ঝোপজঙ্গল পানা পুকুরও আছে, তেমনি হরবখৎ রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে লোক বোঝাই প্রাইভেট বাসগুলোর ছুটোছুটি আছে।

ছেলেপুলেদের পড়া যত হোক না হোক, দু'দুটো প্রাইমারী স্কুল আছে, এবং পুরনো পুরনো সব বাড়ির কাছে পিঠে বেশ আধুনিক ছাঁদের কিছু কিছু নতুন তৈরি বাড়িও আছে। আর আছে পুরনো নতুন সব দেওয়ালে স্কুলবাড়ির পাঁচিলে মুদির দোকানের চালা ঘরের করোগেট সীটের দেওয়ালে এবং মোটাসোটা গাছের গুঁড়ির গায়ে গায়ে নামাবলীর মত 'অমুক ছাপে ভোট দিন' বলে হরেক রকম পোস্টার সাঁটা।

এই পারিপার্শ্বিকতার মাঝখান দিয়ে ফুল সাজানো মোটরখানা এগিয়ে যেতে যেতে—গগনপুরের 'ভটচাষ্যি বাড়ির' কাছ বরাবর একবার গ্রাম দেবতা রাধাকান্তর

মন্দিরের সামনে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থেমে চলে এল ভটচায্যি বাড়িরই সামনে।

পুরনোকালের ছাঁদেরই বাড়ি, পুরনোই বাড়ি তবে একদা যে, বেশ জমকালোই ছিল তা বোঝা যায়। সম্প্রতি যে কিছু সংস্কারও হয়েছে, তাও বোঝা যাচ্ছে।

বাড়ির সামনে সদরের দুপাশে স্বস্তিক আঁকা মঙ্গল ঘট বসানো, দরজার মাথায় আম্রপল্লবের মালা।

দরজার সামনে একে একে নামল নতুন বরকনে, এবং বরের মা বাবা, একটি কম বয়সী বৌ এবং গোটা তিনেক ছোট ছেলে মেয়ে। অর্থাৎ গাড়ির খরচাটি উসুল করে নেওয়া হয়েছে। এবং বলা বাহুল্য নতুন বরকনেকে পরস্পর কথাবলার কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। তবে গাঁটছড়ার কল্যাণে, তাদের গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে বসবার সুখানুভূতিটুকু দেওয়া হয়েছে। যথারীতি সেই গাঁঠছড়া সমেত নামা।... সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে যেন ভোঁ ভোঁ করে বেশ কয়েকবার শাঁখ বেজে ওঠে, আর সেই সঙ্গেই বেরিয়ে আসেন গরদের থান আর গরদের ব্লাউজ পরা একটি রূপবতী বৃদ্ধা। রূপবতীই বলা চলে, পাতলা লম্বা ছিপছিপে গড়ন, বেশ ধারালো কাটানো মুখের ছাঁচ, এবং প্রায় সব সাদা হয়ে আসা ঘাড় পর্যন্ত চুলগুলোয় এখনো কোঁকড়ানোর আদল।

তিনি গাড়ির কাছে এসে হাসিমুখে বরকনে দুজনের হাত এক করে নিয়ে চেপে ধরে বললেন, মন্দিরে ঠাকুর নমস্কার করিয়ে আনা হয়েছে তো বৌমা?

বৌমা অর্থাৎ নীলাঞ্জনের মা বললেন, হয়েছে বৈকি মা। আপনি যেমন যেমন প্রণামী দিতে বলে দিয়েছিলেন তা ওদের হাত দিয়ে দেওয়ানো হয়েছে।

বেশ। খুব ভাল। আমি আজ আর মন্দিরে গেলাম না। এদিকটা দেখছি।...ও অলকা দুধটা ওথলাচ্ছিস তো?

নীলাঞ্জনের মা অরুন্ধতী বলে ওঠেন, অলকা কে?

ও এখানের এক জ্ঞাতির ঘরের নাত বৌ। বড় লক্ষ্মী মেয়ে। আর কী কাজের! উঠান 'বৌছত্রের' আলপনা দিয়েছে দেখবে এসো! ওই এবড়ো খেবড়ো চটা ওঠা উঠোন। তবু যেন আলো ঝলসাচ্ছে। এসো বৌমা তুমি ওদের হাত ধরে নিয়ে এসো! খোকা তুই অমন বোকার মত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কোন পথ দিয়ে ঢুকতে হয়, ভুলেই গেছিস বুঝি?.. বলে হেসে ওঠেন। ব্যঙ্গের হাসি নয় কৌতুকের হাসি।

খোকা মানে নীলাঞ্জনের বাবা, অপ্রতিভ হাস্যে বলেন, যা বলেছ। সত্যি কতকাল যে আসা হয়নি। মানে নীলু তো প্রায়ই আসে, খবর-টবর পাই। তাই আর—

নীলু তো রোজ ভাত খায়। তুই খাস কেন?

বলে বৃদ্ধা আর একবার হেসে ওঠেন।

ততক্ষণে দুধ ওথলানো দেখে ভিতর উঠোনে এসে গেছে বর কনে।...উঠোনের মাঝখানে দুধে আলতার পাথরটাকে ঘিরে বিরাট পদ্মলতা মার্কা আলপনা। সত্যি বলতে শানের ওপর যেন ঝকঝক করছে।

এই যে নাতবৌমা তাকিয়ে দেখো এই পাঁচ পুরুষের দুধে আলতার পাথরে ষাট বছর আগে আমি এসে দাঁড়িয়েছিলাম, এত দিন পরে আজ এ বংশের বংশধারার

ধারক বাহক তুমি এসে দাঁড়াচ্ছ। আমার বৌমাদের তো কারো এটি ভাগ্যে হয় নি, তিনজনেরই কলকাতার বাড়ি থেকে বিয়ে হয়েছে। আজ আমার একটা অনেক দিনের সাধ মিটল।

নীলাঞ্জন হেসে উঠে বলে, মিটেছে তাহলে? 'থ্যাঙ্ক্যু'। উঃ ফুল্লকুসুম, তোমার যা এক একখানি সাধ! আজ তো তোমার সাধ মেটাতে চিড়িয়াখানার বাঁদরের ভূমিকা!

ওমা। সে আবার কি? কেন?

কেন আবার! ওই ফুল সাজানো গাড়ি! রাস্তায় রাস্তায় দর্শনার্থীর ভিড়। ছেলেপুলেগুলো তো স্রেফ চিড়িয়াখানার বাঁদরকে ছোলা ছুঁড়ে দেওয়ার মত, মুঠো করে ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

ফুল্লকুসুম হেসে ফেলে বলেন, এখানে তো সচরাচর এমনটা দেখতে পায় না। তাই এই বেচারা নীলুকে একটা 'দ্রষ্টব্য' হয়ে আসতে হল। ছিঃ। ভদ্রলোকে ফুল সাজানো গাড়িতে চড়ে।

ভদ্রলোকে না চড়ুক বিয়ের বর চড়ে।

ওঃ তা'হলে বলছ ভদ্রলোকে বিয়ে করে না?

তা করবে না কেন? করে। তবে বিয়ের পর তো আর ভদ্রলোক থাকে না।

বল কি ফুল্লকুসুম! আর সেই কাজেই তুমি আমায় প্রবৃত্ত করতে তর্কযুদ্ধে নেমে শেষ অবধি জিতে ছাড়লে?

ফুল্লকুসুম বললেন, তা' কি হবে? পৃথিবীর নিয়মেই তো চলা উচিত। তার মধ্যে থেকে যদি কেউ বিয়ে হয়ে বর্বর হয়ে না উঠে শুধু 'বর'ই' থাকতে পারে সেটা তার ক্যাপাসিটি।. যাক বাজে কথা—কই রে তোদের বরণ ডালা সাজানো হয়েছে?

অরুন্ধতী ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, হ্যাঁরে নীলু নতুন বৌয়ের সামনেও তুই ঠাকুমাকে নাম ধরে ডাকছিস? শুনে শুনে বৌও তাহলে তাই ডাকবে!

নীলু একবার মার দিকে প্রফুল্ল হাস্যে তাকায়। কিন্তু যেন একটু নির্নিমেষে তাকায়। তারপর বলে ওঠে, আমার কথা 'শুনে শুনে' যদি তাই বলতে থাকে, তাহলে তো তোমার বৌটি আইডিয়াল বৌ হবে মা! সেই যে ভাল বাংলায় কি বলে, 'পদাঙ্ক অনুসারিণী' না কী!

তোর সঙ্গে কে কথায় পারবে?

ফুল্লকুসুম বললেন, থাক এখন আর মায়ে পোয়ে তর্ক করতে বসিসনি বাবা। বেলাটা চেয়ে দ্যাখ। কি ভাগ্যি যে বর্ষা নেই আজ দুদিন। ওমা খোকা তুই সেই দাঁড়িয়েই আছিস? ওরে সত্যচরণ বড় বাবুকে মুখ হাত ধোবার জায়গায় নিয়ে যা। ...বামুন মেয়ে চা বানাচ্ছে তো?...খোকা তুই বাবা চা খেয়ে একটু বৈঠকখানার ওদিকে গিয়ে দেখাশোনা কর গে।...বেশি নয়, জনা পঞ্চাশ ষাট মতন লোককে বলেছি দুটো মাছ ভাত খাবে।...বেশি বলতে ভরসা হল না, তোদের তো আজই ফিরে যেতে হবে!

খোকা আবারও অপ্রতিভভাবে বলে, মানে কাল তো আবার ওখানের ব্যাপার!

হ্যাঁরে বাবা, সে তো আমার জানাই। আজ এখানটা একটু দেখাশোনা করে চটপট মিটিয়ে নে।

খোকা এখন একটু হেসে বলে, তোমার ব্যবস্থার ওপর আর কিছু দেখবার

থাকে মা?

খুব হয়েছে। তোর মা মস্ত কর্মিষ্ঠি। এখন চাটা তো খা।...এসো বড় বৌমা! তোমার দাদা শ্বশুরের ভিটেয় তোমার বৌকে বরণ করে ঘরে তোলো। কই রে তোরা বরণ দ্রব্যগুলো নিয়ে বেরিয়ে আয়।

ভিতর দিক থেকে বেশ কয়েকটি সাজাগোজা বৌ মেয়ে চিরপরিচিত সেই জিনিসগুলি নিয়ে এসে দালানে নামায়। সোমার তো এ দৃশ্য শতবার দেখা। তবু সোমার যেন সব কেমন নতুন লাগে।...এই চিরপরিচিত নাটকটি আজ অভিনীত হবে সোমাকেই কেন্দ্র করে?

সোমার শাশুড়ী সেই বরণডালা হাতে নিয়ে নিজের শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললেন কই মা, কি করতে হবে বলে-টলে দিন আমি তো একদম আনাড়ি। কই কেউ উলু-টুলু দিচ্ছে না?

ফুল্লকুসুম হেসে বলল, নিয়ম রক্ষে হিসেবে তুমিই একটু দাও তাহলে।...আমি বাছা ওদের মানা করে রেখেছি। একে তো জানোই আমার ওই উলুটা কেমন যেন লাগে। মনে হয় একটা 'বন্য উল্লাস' ধ্বনি। তায় আবার এদের এখানে যা। বাবা! পাড়ায় কোথাও কিছু শুভ কাজ হলেই, দূর থেকে মনে হবে যেন বাঁশবাগানের সব শেয়ালগুলো এক সাথে হুক্কা হুয়া করে উঠল। . এই সেরেছে। নাত বৌমা, তুমি কিছু মনে করছ নাতো তোমার এই দিদি শাশুড়ীটির কিছু কিছু 'কিম্ভুত' ব্যাপার আছে।...হ্যাঁ বৌমা আগে বরণডালার প্রদীপটি জেবলে নাও। তারপর প্রথমে ঘটের জল নিয়ে—

সোমা দুধে আলতার পাথরে পা রেখে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমটা ভীষণ অস্বস্তি লেগেছিল, সেটা মিলিয়ে গেছে।

সোমা কেমন যেন আচ্ছন্নের মত অবাক হয়ে দেখছে।

বাড়ি ভর্তি তো লোক। নানান বয়েসের। কে ওরা? কি সম্পর্ক এদের সঙ্গে!

মনে পড়ল তার বান্ধবীদের সেই উক্তি...'ওমা! দেশের বাড়িতে পড়ে থাকে বুড়ি? একা?'

কই একাকীত্বের ছাপ তো ওনার মুখে দেখা যাচ্ছে না।

নানা নিয়ম পর্ব চলতে থাকে। ক্রমেই যেন আরো আচ্ছন্ন হয়ে যায় সোমা।.. চব্বিশ পরগণা জেলার এক গ্রাম, নাম গগনপুর, জীবনে যার নামও শোনেনি সোমা। সেখানে-সম্পূর্ণ অপরিচিত কাদের একটা বাড়িতে তাদের বংশের 'বধূত্বের' দাবিতে তাদের প্রবাহ ধারার উত্তরাধিকারিণীর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে সোমা। এই একখানা প্রকাণ্ড ভারী দুধে আলতার পাথরে পা রেখে।...যে পাথরে নাকি একদা ঠিক এইভাবেই নববধূর বেশে দাঁড়িয়েছিলেন আজকের ওই শুভ্রকেশ বৃদ্ধা।...আরো কত কত নববধূ হয়ত এই একইভাবে দাঁড়িয়েছে।...আজকের 'সমাজ' অনেক পুরনোকে বাতিল করে চললেও—এখনো কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে ধরে রেখেছে পুরনোকালকেই। বিশেষ করে এই বিয়ের অনুষ্ঠানে।...যারা সব কিছুই সেকেলে আর কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেয়, তারাও ঠিক এই সময় আচারে

নিয়মের খুঁটিনাটির ভক্ত হয়ে ওঠে।...হয়ত পুনোমা রুচিরাও ঠিক এইভাবেই—

সোমার মনে পড়ে সেই কবে স্কুলে একদিন বাংলার টিচার বলেছিলেন... 'জীবজগতের' সঙ্গে, এইখানেই মানুষের প্রধান পার্থক্য। জীবজগৎ 'ঐতিহ্যের' কথা জানে না। জীবজগৎ তার বংশধারার হিসেব রাখতে বসে না। সে জগৎ 'প্রকৃতির'ই একটা অংশ মাত্র।...প্রকৃতির নিয়মেই সে পরিচালিত। তার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। মানুষই প্রথম ভাবতে শিখেছে সে স্বতন্ত্র। তার নিজস্ব একটা সত্তা আছে। আবার সে, খণ্ড বিচ্ছিন্ন আকস্মিক একটা ঘটনা মাত্রও নয়। অন্ধ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তী ধারার ঊর্ধ্বে তার আলাদা আর একটা জগৎ আছে। আছে— উপলব্ধির জগৎ, বোধের জগৎ। মানুষ প্রবহমান সেই অন্যস্তরের এক জীবন ধারার একটা শরিক।...'

ভারী সুন্দর পড়াতেন সেই শিক্ষয়িত্রী আর ভারী পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করতেন।...তার বক্তব্যর মূল কথাটি ছিল, মানুষ যেমন অন্ধ প্রকৃতির পরিচালিত নয়, তেমনি আবার নয় আপন শক্তির স্বেচ্ছাচারী উপাসক।...এই বিশ্বের প্রতি তার একটা আলাদা দায়িত্ব আছে। যা মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণীর থাকে না।

এই দুধে আলতার পাথরে দাঁড়িয়ে সোমার যে কেন কোন্‌কালের সেই ক্লাশ টেন-এর বাংলার টিচারের কথাগুলো মনে এল কে জানে।...আর গতকাল বিকেলেও যাকে চোখে দেখেনি তাকেই মনে হল যেন একান্ত আপনজন।

পাঁচ

কেমন দেখলে আমার ঠাকুমাকে?

কলকাতায় ফিরে যাবার লোকদের নির্দিষ্ট বাসে তুলে দিয়ে এসে নীলাঞ্জন দেখল সোমা একতলার দালানেই বসে রয়েছে সাবেকী মস্ত চৌকিটায়। এখানে ওটাব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। চিরদিন সংসারের মহিলাকুলের জীবনযাত্রা বেশিরভাগ কাজই সমাধা হত এই ঢাউস চৌকিটার ওপর। সকালে যদি বঁটি পেতে কুটনো পর্ব, তো দুপুরে গা গড়িয়ে ছেলে ঘুম পাড়ানোর অবকাশে নিজেও ঘুমিয়ে নেওয়া।... বিকেলে তার ওপরই চুলবাঁধা পর্ব। সেও তো বিরাট। শুধু বাড়ির মেয়ে বৌ-রাই নয়, পাড়ার বৌ ঝি-রাও চুল বাঁধতে আসত ফুল্লকুসুমের পিসি শাশুড়ীর কাছে।

কত লোক ছিল তখন। সদরে অন্দরে আত্মীয়-অনাত্মীয়।

ফুল্লকুসুম নিজেই ভেবে পান না, কোথায় গেল তারা।...

এখন সোমা একা বসে ভাবছিল, তখন এখানে যাদের দেখেছিল কোথায় উবে গেল তারা?...বুঝতে পারছে, কেউই এ বাড়ির বাসিন্দা নয়, পাড়াপড়শী, জ্ঞাতিজন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর সবাই বিদায় নিয়েছে।

বৌয়ের সেই বোনপো বৌটি, যার নাকি গ্রাম দেখার ভারী শখ, আর ওই কুচোকাচারা। ফুল্লকুসুমেরই মেজ ছেলে, ছেলের ঘরের নাতি নাতনী। এখানে রাত কাটানোর কথা কেউ ভাবতেই পারবে না।

কিন্তু নীলাঞ্জন আর সোমা?

ওরা আজকের রাতটা থাকবে।

নীলাঞ্জনেরই ইচ্ছেয় ব্যবস্থা। মা বাবাকে বলেছিল তোমাদের ওই ফুল সাজানো গাড়িটাতে বরং তোমরা চলে যেও। আমি কাল সকালে তোমার বৌমাকে নিয়ে বাসে চলে যাব। ভয় নেই ঠিক সময় তোমাদের 'জিনিস' পেয়ে যাবে।

ওঁরা অবশ্য সে প্রস্তাবে রাজী হন নি। গাড়িটাকেই মেয়াদ বাড়ানোর ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। নিজেরা বাসে চলে গেলেন।

অরুন্ধতী যাবার সময় ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে গেলেন, এই তো ভিটেয় এসে বৌ বরণ হল, রাধাকান্তর মন্দিরে পুজো দেওয়া হল, ঠাকুমাকে বৌ দেখানো হল, দেশের আত্মীয়দের খাওয়ানোও হল আর এখানে থাকবার দরকারটা কী বাবা?

নীলাঞ্জন বলল, বলেইছি তো মা, এই তোমাদের যত সব নিয়ম কানুনের গাড্ডায় পড়ে ভীষণ টায়ার্ড লাগছে, আবার এক্ষুণি তিন ঘণ্টা জার্নি! একটু রেস্ট নিতে ইচ্ছে করছে বলেই—

মা অবশ্য ছেলের এই ছেঁদো কথায় বিশ্বাস করে নি। মনে বুঝেছিল এ তার সন্তানের অধিকারের-প্রতিদ্বন্দ্বিনী শাশুড়ীর কারসাজি। তিনিই নিশ্চয় তাঁর এই 'সাধ'টি প্রকাশ করে রেখেছিলেন নাতির কাছে, একটা রাত ভিটেয় কাটাক। নীলুর আবার 'রেস্ট'-এর বাসনা!'

তবু যাবার সময় বলেছিলেন, আজকের রাতটা 'কালরাত্রি' তা জানিস তো? সন্ধের পর যেন আর সোমার সঙ্গে কথা-টথা বলতে যাস নি।

নীলাঞ্জন বলল, ঘাবড়িয়ো মৎ জননী। ভুলে যেও না দাদার ওপর দাদা আছে। শাশুড়ীর ওপর তস্য শাশুড়ী। নিয়ম কানুনেও ফাঁক বইতে দেবেন নাকি?

অরুন্ধতী মনে মনে ঠোঁট উল্টেছিলেন, কি জানি! চিরকালই দেখছি ফ্যাশান আধুনিকা নাতির সুয়ো হতে হয়ত বলে বসবেন, 'ওতে কিছু দোষ নেই।'

কিন্তু ওদের রেখে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?

তাঁদের সেই ফুলের মোটরেই বাস রাস্তা পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে তাতেই ফিরে এল নীলাঞ্জন। এসে দেখল সোমা খালি ঘরে খালি চৌকিটায় বসে রয়েছে চুপচাপ। পরনে একখানা সোনালী পাড়, লালডুরে শাড়ি, লাল রঙেরই ব্লাউজ। গায়ে নতুন সোনার গহনার ঝিলিক।

এসে চৌকির ওপরই এক পাশে বসে পড়ে বলে উঠল, উঃ। এতক্ষণে একটা কথা বলবার সময় পাওয়া গেল। কেমন দেখলে আমার ঠাকুমাকে?

সোমা যতক্ষণ একা বসেছিল তার মনটা যেন কেমন বিষণ্ণ ভারাতুর হয়ে উঠেছিল।...এই 'ঠাকুমা' নামক মহিলাটিকে তো বেশ ভালই লাগল, কিন্তু তাঁর বধূমাতা? সেই অরুন্ধতী নামের মহিলাটি? তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন ভয় ভয় করছে! হাসি হাসি ভাবের অন্তরালে কোথায় যেন রয়েছে একটা কাঠিন্যের ভাব। চলে যাবার আগে—বেশ কয়েক বারই বললেন বটে, সেই কোনকালে

এসেছিলাম। কি ভালই যে লাগল।...তবু মনে হল—এই আসাটা যেন ওঁর অভিপ্রেত ছিল না। যেন এটা বাহুল্য, আতিশয্য।

ওঁর কাছেই তো থাকতে হবে। আরো কত কে যেন আছে।.. দমে যাচ্ছিল মনটা। পুনোমাদের কথা মনে পড়ছিল। ওরা বলেছিল ওরে ব্বাস। সেই একান্নবর্তী বিরাট পরিবারের গাড্ডায় গিয়ে পড়তে হবে তোকে? এখনো এরকম সংসার আছে কলকাতা শহরে?...

এই দমে যাওয়া মনটায় হঠাৎ যেন একটা আলো জ্বলে উঠল। অন্ধকার ঘরে বিদ্যুৎবাতির সুইচটা টিপলে যেমন হঠাৎ ঝলসে ওঠে সেই ঘর।

নীলাঞ্জন এসে ঢুকল আধ ভেজানো দরজাটা ঠেলে। ..আচ্ছা এটা কি করে হল? কেন মনে হচ্ছে এই লোকটা যেন তার চিরচেনা 'নিজজন'। সব মেয়েরই কি এমন হয়? না সোমা বোকা আর 'সেকেলে' বলে? বন্ধুরা তো তাই বলে।

কারণ যাই হোক, হিসেব করে দেখলে.. মাত্র উনিশ ঘণ্টা সময়ের দেখা এই মানুষটাকে দেখে সোমার মনের মধ্যে একটা আহ্লাদের ঝংকার উঠল। বিষণ্নতাটা কোথায় বিদায় নিল। মৃদু হেসে সোমা বলে উঠল 'ঠাকুমা কোথায়? বল ফুল্লকুসুম।'

হেসে উঠল নীলাঞ্জন, নাম ধরে ডাকায় অবাক বনে গেছো না?. .আসলে ব্যাপারটা কি জানো? আমিই তো বড় নাতি? দাদুর আসনটাকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি, আর সে আমলের অনেক বিদুর সাক্ষীও।..ছোট্ট বেলায় একদিন শুনলাম দাদু বলছেন, 'ফুল্লকুসুম' নিজে হাতে দুটো পান সেজে খাওয়াওনা! ওরা যে কি বাজে পান সাজে।

আমি ধরে পড়লাম, দিদাকে ফুল্লকুসুম বললে যে? দাদু বললেন, 'দূর পাগলা ফুল্লতুসুম নয় ফুল্লকুসুম।'

তাই হোক গে। কেন বললে? 'ওগো' বললে না যে?

দিদা দাদুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হল তো?' তারপর আমায় বলল ওইটাই যে আমার নাম রে। কেউ তো আমায় নাম ধরে ডাকে না? তাই আমার মনে দুঃখু হয়। তোর বাবা কাকারা বলে, 'মা' তোরা বলিস দিদা আর তোদের এই দাদু বলে 'ওগো'। আমার নামটা ভুলেই যাচ্ছি। মনে আছে আমার খুব অবাক লেগেছিল। বলেছিলাম, 'কেউ নাম না বললে মনে দুঃখু হয়?'...

দিদা বলল, হয় না? নামটাই তো সব। জগতের আসল জিনিস।...তখন তো আর অত আসল নকলের ঠাট্টা বুঝিনি, বললাম, 'আচ্ছা তুমি মনে দুঃখু কোরো না, আমি তোমায় নাম ধরে ডাকব?' সেই থেকেই নাম ধরে ডাকা।...প্রথম প্রথম মা বাবা কাকারা খুব বকাবকি করত, বলত খবরদার ঠাকুরমাকে ও রকম নাম করে ডাকবি না। লোকে শুনলে কি বলবে? কিন্তু দাদু বলল, 'আহা ছেলে-মানুষ ডাকছে ডাকুক না।...এতে কি আর তোদের মার প্রেস্টিজ যাবে?'

বেশ উদার ছিলেন না?

তা ছিলেন। তবে বেশিদিন তো আর রইলেন না।

সোমা বলে, আর আপনাদের বাড়ির অন্য ছেলে মেয়েরা? তারা কি বলে?

'আপনাদের' বাড়ি। হায় নসিব। 'আপনাদের বাড়ি' মানে? তুমি কি আমায়

আপনি আজ্ঞে করবে নাকি?

সোমা অপ্রতিভভাবে বলে, 'বাঃ। চেনা জানা নেই—'

আমারও তো একই ব্যাপার। তাহলে কি বলব—'শ্রীমতী সোমা দেবী আপনি'—

যাঃ। হেসে ফেলে সোমা।

নীলাঞ্জন বলে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে চিরকালের চেনা। তাই এসেই তোমায় একা বসে থাকতে দেখে ইচ্ছে হচ্ছিল—এই সুবর্ণ সুযোগে একটু কিন্তু তুমি তো ভয় খাইয়ে—

সোমা দু'হাতে মুখ ঢেকে বলে ধ্যেৎ!

বাইরে থেকে ফুল্লকুসুমের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, হ্যাঁরে কানাই, নীলু ওদের বাসে তুলিয়ে দিয়ে এখনো ফেরেনি?

কানাইয়ের সাড়া পাওয়া গেল না নীলুই গলা তুলে বলল, এই যে এলাম! এসেই দেখছি—

ফুল্লকুসুম ততক্ষণে এ ঘরে এসে পড়েছেন, একটু দাঁড়িয়ে পড়ে হেসে বললেন, এসে দেখলি 'একাকিনী বিরহিনী বসে আছে বিজনে?'

প্রায় তাই। হঠাৎ বাড়িটা কি রকম বিজন নির্জন হয়ে গেল! এই মস্ত বাড়িটায় একা কি করে থাকো গো বুড়ি?

বুড়ি হেসে উঠে বললেন, 'না থাকি একেলা ভাই। 'জগৎজননী'—আমার শিযরে বসি থাকেন আপনি।'

ও বাবা! সেই কোনকালের কথা, মনে আছে? আমাকেই তো ছেলেবেলায় শিখিয়েছিলে। তাই না?

'ফুল্লকুসুম' একটু হেসে বলেন, তোর বাবা কাকাদেরও শিখিয়েছি। 'কেউ ভোলে। কেউ ভোলে না'। কিন্তু গিন্নীটির সঙ্গে তো আর বেশিক্ষণ প্রেমালাপ চলবে না হে!

যতক্ষণ এই ঝিকিমিঝি কনে দেখা আলোটি সন্ধে হয়ে গেলেই দুজনে দুজনেব মুখদর্শন নিষেধ। 'কালরাত্রি' পড়ে যাবে! বেশ ছিলি এই বুড়িই এল রসভঙ্গ করতে। বোস আর একটু—

সোমা তাড়াতাড়ি ওঁর কাপড়টা ধরে একটু টেনে বলে, বাঃ চলে যাচ্ছেন কেন?

ওই তো বললাম বাপু রসভঙ্গের দায়ে।

আঃ কি যে বলেন। বসুন। বসুন বলছি। একপা নড়বেন না।

ওমা। ও নীলু এ যে শাসন করে রে।

তাই দেখছি। নীলু হাসি চেপে বলে—আর নিজের ভবিষ্যৎটি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। এসে বোসো তিনজনে জমিয়ে বসে গল্প করা যাক। আর তো তোমার কোন কাজ নেই?

নাঃ। আর কোন কাজ নেই। কিন্তু তিনজনে আর 'জমানো' হবে কি করে ভাই? শাস্ত্র আজ্ঞা, সন্ধের পর দুজনের আর মুখ'দখা চলবে না।

নীলাঞ্জন বলে, আচ্ছা ফুল্লকুসুম, এই 'কালরাত্রি' ব্যাপারটা কি বল তো? তোমার সুযোগ্যা জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূও ওইরকম কি একটা বলে গেলেন।

সোমা অবশ্য জানে ব্যাপারটা। মানে যা শুনে আসছে বরাবর। গেরস্থালী ঘবের

বাঙালি মেয়ে অনেক কিছুই তাদের শুনে শুনে শেখা হয়ে যায়।

ঠাকুমা বললেন, ব্যাপার কি তা জানি না বাবা, তবে বলে, 'কালরাত্রিতে' দেখাদেখি হলে 'নবদম্পতী দুর্ভাগা হয়।'

তুমি এসব সত্যি বলে বিশ্বাস করো? ফুল্লকুসুম?

ফুল্লকুসুম বলেন, চিরদিন যারা এটা মেনে এসেছে, তাদের তো মেনেছি বিশ্বাস করেছি। এরকম অনেক ব্যাপারেই ভাবি, অনেকের বিশ্বাসের জিনিস উড়িয়ে দিয়েই বা কি চতুর্ভুজ হওয়া যাবে! একটা রাত না হয় নতুন বরকনে একটু ধৈর্য ধরতেই শিখল।...তারপর একটু হেসে বলেন, তবে আমার একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে—

সেটা আবার কি?

সেটা হচ্ছে এই 'বিয়ে' ব্যাপারটায় দুটো ছেলেমানুষের ওপর দিয়ে কম ধকল তো যায় না। আগের আমলে তো ছেলেমানুষই থাকত। পাঁচদিন ধরেই নানা ধকল। উপোস, বাসর জাগা!...একটা রাত রেস্ট দরকার তাদের। এই ভেবেই শাস্ত্রকারেরা হেসে ফেলে বলেন, ভাল করতে গিয়ে মন্দ করা আর কি? ফলশ্রুতি এখন বুড়ো ধাড়ি বরকনের শাপমুন্যি কুড়ানো!

সোমা বলে, দিদা আপনি ভারী অসভ্য।

দিদা বলেন, সেই তো কথা। সেই জন্যেই সভ্য সমাজ ছেড়ে এই অ-সভ্য জায়গায় এসে পড়ে আছি। যাক, আমি লক্ষ্মীর ঘরের সন্ধে আরতির গোছটা করে দিয়ে আসি। ঠাকুরমশাই এসে পড়বেন। শাঁখ বাজার শব্দ পেলেই তোরা ঠাকুর ঘরের দরজায় চলে আসিস।...তারপর আর কি! পাশের একটা ঘরে বিরহী যক্ষ একা শুয়ে এপাশ ওপাশ করবে আর যক্ষবধূর এই ফুল্লকুসুমের সঙ্গে ফুলশয্যে।

হাসতে হাসতে চলে যান।

সোমা আস্তে বলে, এ বয়েসের কাউকে আমি এমন দেখিনি।

নীলাঞ্জন বলে, সত্যিই উনি একদম অন্য রকম। তাই বাড়িতে—কিন্তু এখানে তো দেখি এই কয়েক বছরেই সবাই 'ফুলঠাকুমা' 'ভটচায্যি দিদি' 'ও বাড়ির জেঠাইমা' এমনি বহু নামে যাকে বলে রীতিমত 'জনপ্রিয়তা' অর্জন করে বসে আছেন।

আগে কলকাতার বাড়িতে থাকতেন?

তা থাকতেন।

ঠাকুর দেবতার জন্যে এখানে একা থাকতে এসেছেন?

নীলাঞ্জন একটু হেসে বলে, হ্যাঁ সেটাই বাজার চালু রটনা। তবে আসল ঘটনা 'একা' থাকবেন বলেই ঠাকুর দেবতার নাম ভাঙানো।...

কোথায় দূরে কাদের বাড়িতে যেন সন্ধ্যার শাঁখ বেজে ওঠে।

সোমা ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে বলে, যাই। কোনদিক দিয়ে তখন গিয়েছিলাম। চল আমি গাইড হয়ে নিয়ে যাই।

বলে নীলাঞ্জন সোমার পিঠে একটা হাত দিয়ে বলে, এই দিকে।

হাতের বেষ্টনটি ঘন সান্নিধ্যে নিয়ে আসে।

সোমা। তাহলে সেই কাল সকালে?

সোমা সেই ঘিরে ধরা হাতটাকে মুঠোয় চেপে ধরে অস্ফুটে কি একটা বলে।

বোঝা যায় না। তবু অনুভব করা যায়।

বাড়ির শাঁখটা বেজে ওঠে।

ছয়

পুরনো ঘর, পুরনো সাজসজ্জা।

পুরনো কালের কারুকার্য করা মস্ত পালঙ্কতুল্য জোড়া খাট। দেওয়ালে দেওয়ালে কিছু দেবদেবীর পট, আর কয়েকখানি হলদেটে হয়ে যাওয়া ফোটো।

পুরনো পালঙ্কে আজ একখানি নতুন বাহারি বেড়কভার পাতা।

ফুল্লকুসুম বললেন, আয়। এই আমার ঘর। এই ঘরেই আমার ফুলশয্যে হয়েছিল, এই খাটে। আর তার আগে আমার শাশুড়ীর।...শুনেছিলাম, এতবড় পালঙ্ক দরজা দিয়ে ঢোকানো যাবে না বলে, ঘরের মধ্যে ছুতোর এনে জোড়ের কাজগুলো করানো হয়েছিল।

হেসে উঠলেন, বললেন, সেকালের মিস্ত্রীদের বুদ্ধি। দেখবে সিঁড়ি বানাবার সময় ঠিক মত মাপজোকের অভাবে সিঁড়ির মাঝখানে হঠাৎ একখানা চাতাল বানিয়ে একখানা দু'ধাপ উঁচু সিঁড়ি বানিয়ে মেক্‌আপ করে নিয়েছে।

সোমাকে সেই পালঙ্কে বসিয়ে একটা খাটের যুগ্যিই ঢাউস 'আয়না টেবিলের' ওপর বসানো কাঁচের চিমনি পরানো টেবিল ল্যাম্পটার আলোটা উসকে দিয়ে বলেন, অনেক বছর ঘরটা চাবি, শুধু ঘরটা কেন, বাড়িটাই চাবিবন্ধ পড়ে থেকেছে। শুধু লক্ষ্মীর ঘরের চাবিটা ঠাকুর মশাইয়ের কাছে থাকত, আর সদরের চাবিটা কানাইয়ের কাছে।...কানাইয়ের জন্যে একখানা ঘর বরাদ্দ ছিল সে তার বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকত। এখনো থাকে। বুড়োই হয়ে গেল। ক'বছর হল আমি চলে আসায় আবার বাড়ির সব ঘর দরজা খোলা হয়েছে।...

সোমা আস্তে বলে, চলে এসে আর যান নি?

নারে। এসে এমন জড়িয়ে পড়ে মরেছি, আর বেরোনোই হয় না।

আমাদের বাড়িতে সবাই বলাবলি করছিল 'নাতির বিয়েতেও গেলেন না, কেমন ঠাকুমা? কত বুড়ো? একা থাকেন কি করে?'

ফুল্লকুসুম হেসে উঠে বলেন, দ্যাখ তাহলে এই ফুল্লকুসুম দেবীটি কেমন বুদ্ধিমান। গেলে কেউ পুছতো? না নাম উল্লেখ করত? গেলাম না বলেই বুড়ির খোঁজ। সমালোচনা করবার একটা সুযোগ পেল তো কেউ কেউ।...আর গেলাম না বলেই তো তোদের আনতে পারলাম।...আমি গেলে এটি হত?

নিজে সরে এসে খাটের ধারে বসে বললেন, তোকে তাহলে বলি গোপন একটু ইচ্ছে ছিল—তোদের ফুলশয্যেটা এই ঘরে এই পালঙ্কেই হোক। তা' সেই ইচ্ছে আর ব্যক্ত করিনি।

সোমা বলল, কেন? কেউ কথা রাখবে না ভয়ে?

নারে। কথা রাখবেই এই ভয়ে। ওই পাগলাটার কাছে একবার বলে ফেললেই ও সেটা যে কোন প্রকারে করিয়ে ছাড়ত।...কিন্তু তাতে অবশ্যই ওর মা ক্ষুব্ধ হত। সেই ভেবেই—

সোমার একখানা হাত কোলে তুলে নিয়ে ফুল্লকুসুম বলেন, বলেছিলাম, 'কনে দেখে কাজ নেই' তাতেই সবাই ক্ষুব্ধ।...

একটু হেসে বলেন, শুধু ক্ষুব্ধ কেন, বলতে গেলে ক্রুদ্ধই। নীলেটা যে আমার কথার এত মূল্য দেয়, এটা তো একটু ক্রোধ ক্ষোভের কারণ হবেই।

সোমা বোকা নয়, ব্যাপারটা চট করে অনুমান করতে পারে। তবু বলে আর কারো কথায় মূল্য দেন না?

ওমা। অমন কথা মোটেই ভাবিস না। ঠিকই দেয়। দারুণ চালাক তো? লাঠি না ভেঙে সাপ মারতে জানে!

আচ্ছা দিদা, আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল? দশ?

নারে বাবা অত সেকালের ব্যাপার নয়। বিয়ে হয়েছিল সাড়ে তেরো বছরে। তবে পাত্রপক্ষকে বলার সময় তাকে টেনে নামিয়ে বারো দাঁড় করানো হয়েছিল।...

এও সোমার অজানা জগতের কথা নয়। সোমা এসব শুনেছে।...তাই হেসে ফেলে বলে, সে আর এমন কি? পুকুর চুরির পর্যায়ে পড়ে না।

ফুল্লকুসুম ছেলেমানুষের মত হেসে উঠে বলেন, তা সত্যি। দেড়টা বছর ঘটিবাটি চুরিরই সামিল। কিন্তু তাই নিয়েই, মানে সেটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় রসাতল ব্যাপার।

সোমা হেসে বলে, কি করে ফাঁস হল?

আর বলিস না। আমি তো তখন একের নম্বর হাঁদা।...আমার সঙ্গে আমার এক পিসতুতো ভাই এসেছিল, আমার থেকে বছর দুইয়ের ছোট, আমায় পাখি পড়া করে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওকে 'বিনুদা' বলবি। আমার সেকথা মাথায় নেই কাদের সামনে যেন 'বিনে' বলেছি।

সে কথা আবার কে মনে রাখতে গেছে? কার সামনে ডেকে বলে উঠেছি, এই বিনে তুই নাকি এখানে পেয়ারা গাছে চড়েছিলি? পাজী ছেলে। কুটুমবাড়িতে এসে পড়ে হাত-পা ভাঙবি? সেও রেগে বলছে, 'ভাল হবে না বলছি ফুলদি।'

সেই নিয়ে হৈ হৈ কান্ড।

ও তোমার দাদা না? ও তোমায় ফুলদি বলল যে? আর তুমিও—

আমি বীর বিক্রমে বলে উঠলাম, ও আমার দাদা হয় কোন জন্মে? পাক্কা দু'বছরের ছোট না?...সেই শুনে যাচ্ছেতাই বকুনি।

সোমা হিহি করে হেসে ওঠে, তাহলে বলতেই হবে হাঁদা মেয়েই ছিলেন। আচ্ছা দিদা আপনার বরটির তখন কত বয়েস ছিল?

ওঁর বয়েস ছিল একুশ। বি.এ. পাশ করে ওকালতি পড়ছেন।

ওমা, তাহলে তো লায়েক ছেলে।

সোমা হেসে হেসে বলে, সেই ছেলের ওই হাঁদা বৌ?

হঠাৎ ফুল্লকুসুম নামী সেই সাড়ে তিয়াত্তর বছরের মহিলাটির মুখে যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে যায়—কেরোসিনের আলোর আভা ছাপিয়ে।

বলেন, তা বলে ভেবো না হে।...ওই সব কূট কচালে মিছে কথা বানানোর বেলায় হাঁদা হলেও 'বর'টি যে কি জিনিস তা বুঝতাম না, না কি?

এমা। সেই সাড়ে তেরো বছর বয়েসেই? আপনি তো তাহলে বেশ অকালপক্ক মেয়ে ছিলেন।

সোমা কখনো এমনভাবে কোন বুড়ির সঙ্গে গল্প করে নি। তার নিজের ঠাকুমা নেই। দিদিমা আছেন তবে তাঁকে বুড়ি বললে তার প্রতি বড় বেশি অবিচার করা হবে।...বুড়ি দেখেছে বড় মাসির বাড়িতে দু'তিনজন। তাঁদের কারো সঙ্গেই যে বসে গল্প করা যায়, তা ভাবনায় আসেনি সোমার। বুড়িদের থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ এবং বাঞ্ছনীয়, এটাই তো বরাবরের ধারণা।...

এই বুড়ি মহিলা কি শুধুমাত্র নিজ গুণেই 'আকর্ষণীয়া' হতে পেরেছেন, না ইনি নীলাঞ্জনের একান্ত প্রিয়জন বলে?...এ'র নামটাতেও যেন বেশ একটা আকর্ষণ আছে।

আশ্চর্য। নীলাঞ্জন কি করে সোমার মনের মধ্যে এমন মৌরসীপাট্টা করে নিল?... এখনো তো বলতে গেলে ভাল করে দেখেইনি। যা দেখেছে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে। এই একটু আগে যা মিনিট দুই-তিন একা কথা বলার সুযোগ জুটেছিল।...সেই টুকুতেই কেন মনে হচ্ছে, ওই লোকটাই সোমার সবচেয়ে আপনজন। ও সোমার জিনিস।

সোমা কি সত্যিই এত সেকেলে, যে মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করতে বসবে?...না কি সেই দর্শনমাত্রেই প্রেম সঞ্চারের থিয়োরিতে বিশ্বাসী হবে?

ফুল্লকুসুম বলে উঠলেন, সাড়ে তেরোটা কিছু কম না কি হে?... 'বরের' বেলাতেই অকালপক্ক।... বলি তোদের এ যুগের নেকি আহ্লাদী 'টিন এজার'-গুলি কিছু কম যায় বুঝি?...চোখে তো আর ছানি পড়েনি বাপু, ফ্রক পরা খুকীদের চোখে মুখে বিদ্যুৎ খেলা দেখতে পাই না?...এখন অবশ্য আরো চালাকি শিখেছেন কন্যেরা—তুই তুই করে প্রেম করছেন।...ভাবছে লোক ঠকাচ্ছি। লোকও আর ঠকেনারে।...অন্তত এই তিনকালপক্ক বুড়িটা ঠকে না। দেখি আর মনে মনে হাসি।...আমাদের তো আর এরকম ন্যাকামি করবার সুযোগ ছিল না?...জানতাম বর মানে প্রাণেশ্বর।

এমা দিদা! আপনার মুখে এরকম সেকেলে ভাষা?

সেকেলের মুখে সেকেলে ভাষা। এতে আর অবাক হবার কি আছে রে? পাঁচজনে যখন ফুলশয্যের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিল, ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠল। তবু কেমন আশ্চর্য মনে হল এই বৃহৎ অচেনাপুরীতে এই লোকটাই আমার একমাত্র আপনার লোক।

হঠাৎ সোমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠল। সোমারও তো ঠিক এই রকমই মনে হচ্ছে।...তাহলে? সোমা কি যথোচিত আধুনিকা নয়? সোমা সেই পৌরাণিক যুগে পড়ে আছে?...মহামুস্কিল তো।...নাঃ প্রতিরোধ দরকার।

দরকার, তবু কেবলই মনে হচ্ছে, আমি তো তবু দিব্যি গল্পটল্প করছি। সে লোকটা কোন একটা ঘরে একা পড়ে আছে। 'রেস্ট' নেওয়াটা জরুরি বলে কি ও ঘুমিয়েই পড়েছে?...কক্ষনো নয়। বেচারী।

আচ্ছা একেই কি মন কেমন করা বলে না?

মনের মধ্যে চিন্তার ঢেউ খেলে চলেছে, তবু মুখে কথা জোগানোর অভাব নেই।

আচ্ছা দিদা, আপনার বর প্রথম কি কথা বলেছিলেন?

ওরে বাবা! মেয়েটি তো দিব্যি রসিক।...প্রথম কি বলেছিলেন জানিস? খুব আস্তে প্রায় ফিসফিস করে বলেছিলেন, 'বাইরে সবাই আড়ি পাতছে।' আর তাই শুনেই মনে হল—হেসে উঠলেন ফুল্লকুসুম—দুজনেই আমরা একই খাঁড়ার নীচে। অতএব একমাত্র ওই আমার দলের। আর ওই আমার সুখ দুঃখের ভাগী। আমার একমাত্র আশ্রয়।

সোমা বলে, এ যুগে আর এরকম হয় না। তাই না দিদা?

দিদা বলেন, হয় না। তাই কি জোর দিয়ে বলা যায় ভাই? ভগবানের আশীর্বাদ থাকলে হয়।

বাঃ। তাইবা কেন?

সোমা যেন নিজের সঙ্গেই লড়াইয়ে নামে, বিয়ে হল বলেই তক্ষুনি তাকে 'আশ্রয়,' 'আশাভরসা' সব কিছু বলে ভাবতে হবে? দু'জনের মধ্যে যদি মনের মিল, কি মতের মিল না থাকে?

ফুল্লকুসুম একটু হেসে বলেন, 'মতের মিল?' সে আবার কর্তা গিন্নীর কোন কালেই 'এক' হয় না কি? দুজনে তো দুটো আলাদা জাত।...মতের মিল হলেই হল? তবে 'মনের মিল' না থাকলে অবিশ্যি অসুবিধে। সেটা আসে বোধহয় রুচির অমিল থেকে। ওটা একটা গোলমেলে ব্যাপার।...

তা'হলেও আপনি বলতে চাইছেন মতের অমিল থাকলেও মনের মিল হতে পারে?

বলতে 'চাইছি' কিরে? বলছিই তো!

এ আপনার একটা উদ্ভট মতবাদ দিদা।

সোমা হেসে ওঠে, আপনি আমায় ধাঁধায় ফেলবেন বলেই ইচ্ছে করে এসব বলছেন।

ফুল্লকুসুম হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান। দৃঢ় গলায় বলেন, তা' নয় সোমা, যদি সত্যি ভালবাসতে পারিস, তাহলে বুঝবি এর মধ্যে কোন ধাঁধা নেই। ভালবাসা সব এবড়োখেবড়ো সমান করে দেয়।...তোদের দাদুর সঙ্গে তো আমার সারা-জীবনই মতবিরোধের কামাই ছিল না। তিনি ছিলেন প্রতিটি ব্যাপারে পুরনোপন্থী, আর আমার সর্বদাই নতুন পালে হাওয়া লাগাতো মন। তিনি বলতেন, 'আমরা যেমন ভাবে মানুষ হয়েছি, ছেলেরা তাই হোক' আমি বলতাম 'তোমরা যে কালে জন্মেছিলে, ওরা সেইকালে জন্মেছে?'...যাকগে সে সব কথা। মোট কথা তর্ক আর তাতে জয় পরাজয়, এটাই ছিল দৃশ্যমান, তার কারণ যাই হোক জয়টা অবশ্য আপাত দৃশ্যে আমার দিকেই হত! কিন্তু সে যাক—একটা মানুষ চলে গেলে, আর একটা মানুষের জীবনটা যে একেবারে শূন্য হয়ে যেতে পারে সমস্ত পৃথিবীটা মুহূর্তে অর্থহীন হয়ে যেতে পারে, সে কথাটা তো ওই চিরদিনের বিরুদ্ধ মতের লোকটাই বুঝিয়ে দিয়ে গেল।...

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা!

একটু পরে ফুল্লকুসুম বললেন, যাক গে, এবার শুয়ে পড় ভাই। একটা বুড়ির সঙ্গে গল্প করে রাত জাগতে হবে না।...

সোমা তবু বলে, শুচ্ছি শুচ্ছি। আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব দিদা, দাদু চলে যাবার পরই কি আপনি সংসার ছেড়ে চলে এলেন?

ফুল্লকুসুম বললেন, না রে ভাই! সে রকম শৌখিন বৈরাগ্যের সময় কোথায় তখন? মাত্র একটা ছেলেই শুধু দাঁড়িয়েছে আর দুটো তখনো দাঁড়ায়নি। তাছাড়া তাঁর বড় আদরের যত্নে গড়ে তোলা ঘরবাড়ি সংসার। সবটাই আগলে নিয়ে বসে থেকেছি অনেকদিন। কিন্তু যেদিন দেখলাম শুধু যে আমার প্রয়োজনই ফুরিয়েছে তা নয়। আমার উপস্থিতিটাই বাহুল্য হয়ে গেছে, আর সংসারটাকে গ্রাস করে বসতে চাইছে কতকগুলো 'তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা আর সংকীর্ণতা' একখানা আস্ত সংসার ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়ে তিনটে আলাদা সংসার কেবলমাত্র স্বার্থের খাতিরে একটা ছাতের নীচে মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে লজ্জাবোধ করছে না, তখন সংসারকে সেলাম ঠুকে সরে পড়ে চলে এলাম।

সোমা অনুভব করে এই কয়েকটি লাইন খেদোক্তির মধ্যে কতখানি একটা ধ্বংসের ইতিহাস বিধৃত হয়ে গেল। আর সোমার হঠাৎ ভারী ভয় করে উঠল। সোমাকে তো সেই নির্লজ্জ তিনটে টুকরোর মধ্যেকার একটা টুকরোর মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে!

হঠাৎ গুটিয়ে সুটিয়ে শুয়ে পড়ল।

ফুল্লকুসুম বললেন, কিরে ভয় খেয়ে গেলি নাকি? আরে দূর। তোরা হলি আজকের যুগের লড়াকু মেয়ে, তোদের ভয় কি? তোদের দশ হস্তে দশ আয়ুধ। অস্ত্রহীন পৃষ্ঠবলহীনারাই পশ্চাদাপসরণ করে। আর আমার নীলুর মত ছেলের হাতে যে পড়েছে—

সোমা আবার উঠে বসে। এটা আপনার একদম মান্ধাতার আমলের কথা হল। হাতে পড়াপড়ি আবার কি? দুজনেই বুঝি সমান নয়?

ফুল্লকুসুম হাসলেন, সেইজন্যেই তো বলছি রে, তোদের আবার ভয়টা কি?... তবে 'হাতে পড়া'র মর্মটা যদি বুঝতিস! একটা নিশ্চিত নির্ভরতার জায়গা যে জীবনে কত দরকার। শুধু মেয়ে বলেই নয়। মেয়ে পুরুষ দুজনারই। বিয়ে জিনিসটা কেবলমাত্র 'প্রেম' আর গদগদ ভালবাসার ওপর নির্ভরশীল নয়। তার পায়ের তলার শক্ত মাটি হচ্ছে নিশ্চিন্ততা! নিরাপত্তা!

সোমা তর্কের সুরে বলে, তাহলে বুঝি আপনি সেই আমাদের দেশের সনাতন আদর্শে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিয়েতেই বিশ্বাসী?...যা না কি জন্মজন্মান্তর ধরে অক্ষয় হয়ে থাকে।

শোনো কথা। তেমন কথা আবার কখন বললাম? 'সাতপাকের' নিশ্চিন্ততার কথা বলিনি বাবা আমি, বলতে চেয়েছি বিশ্বাসের নিশ্চিন্ততা। 'ওর জন্যে 'আমি' আমার জন্যে 'ও', এইটি অনুভব করতে পারার নিশ্চিন্ততা!

আর যদি এমন হয় দিদা, ব্যাপারটা একতরফা হয়? 'ওর জন্যে আমি' অথচ আমার জন্যে 'ও' নয়। তাহলে?

ফুল্লকুসুম বললেন, তা'হলে আর কি? কোর্টে ছোটা। সে দরজা তো এযুগে খোলাই আছে।

তাই বলছেন? আপনি তাহলে বিবাহ-বিচ্ছেদের সমর্থক? আমার ধারণা হচ্ছিল বুঝি কট্টর বিরোধী!

ফুল্লকুসুম বললেন, এত তাড়াতাড়ি কি 'ধারণা' নিয়ে রায় দেওয়া উচিত রে? তারজন্যেই তো বলি বিয়ের আগে ওই যে তোরা কি যেন বলিস, হ্যাঁ 'প্রাক বিবাহ মেলামেশা' তাতে কিছুই ফল হয় না! নিয়ে ঘর না করলে মানুষকে কতটুকু চেনা যায়? তা চেনা গেলে যে দেশে 'কোর্টশিপ্' করে বিয়েটাই চালু সেখানে এত ডিভোর্সের ঘটা কেন?...

সোমা তর্কের সুরে বলে, তার নানা কারণ।

সেই তো রে। কারণটা যখন 'নানা' হয়ে যায় তখন সেই কারণ রাশির মধ্যে 'তুচ্ছ কারণ' 'অকারণ' এগুলোও এসে ঢুকে যায়। তাই একটু সতর্ক থাকা ভাল। শরীরের কোনখানে 'পচ্ ধরলে' সেখানটা কেটে বাদ দেওয়া অবশ্যই দরকার, কিন্তু হাত পায়ে কোনখানে যদি দু'এক ফুলকি আগুন লেগে ফোসকা পড়ে তৎক্ষণাৎ হাতটা পাটা কেটে বাদ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু ওরে মেয়ে। রাত যে মাঝরাতে ঠেকল—

ঠিক এই সময় বাইরে একটি কৌতুকের গলা ধ্বনিত হল, ও ফুল্লকুসুম। তোমরা না হয় দিব্যি গল্প করে রাতকাবার করছ, কিন্তু সেই কলস্বরে পাশের ঘরে এক বেচারীর ঘুমের বিঘ্ন ঘটছে সেটা ভাবতে হবে তো?

ফুল্লকুসুম উঠে পড়ে দরজাটা একটু খুলে মুখ বাড়িয়ে বলেন, 'বিঘ্নটা' শব্দে না হিংসেয়? তা' কি করব ভাই, তোর বৌকে তো আর আমি রোজ রাত্তিরে পাব না? একদিনেই চুটিয়ে 'প্রেম' করে নিচ্ছি! আচ্ছা এইবার স্পীকটি নট।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে ঝুপ করে শুয়ে পড়ে বলেন, ওরে নাত বৌ এবার মুখে তালা চাবি!

নাতবৌ সে নিষেধ অগ্রাহ্য করে বলে ওঠে, আমাকে আর পাবেন না বললেন যে বড়? আমি বুঝি আর আসতে পাব না?...

বালাই ষাট। কেবল কেবল আসবি। তবে রোজ রোজ তো আর শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে 'নেপোয় দৈ মারতে' পারবে না? এবার কিন্তু সত্যিই আর নয়।

সাত

সক্কালবেলাই রওনা দেওয়া দরকার। আজই তো কলকাতার বাড়িতে বিয়ের আসল উৎসব ফুলশয্যা বৌভাত! ফুল্লকুসুম বলেন দেরি করলে তোর মা বাবা রেগে আমার ওপরই ফায়ার হবে।...একটু যা জল-খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। আয় তোদের একটু যাত্রা করিয়ে নিই।

লক্ষ্মীর ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, একটি মখমলের কেস থেকে একটি সুন্দর 'লবঙ্গফুল' হার বার করে সোমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন, এইটি তোমার

দাদাশ্বশুর প্রথম রোজগারের টাকা দিয়ে আমায় গড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রাণ ধরে এযাবৎ আর কাউকে দিয়ে দিতে পারিনি।...নীলুর বৌয়ের জন্যে তুলে রেখেছিলাম।

সোমা লজ্জিতভাবে বলে, বাঃ। কাল অতবড় একখানা গহনা দিলেন! আবারও—

আহা সে তো 'বৌ মুখ দেখানি'। এটি আলাদা জিনিস!...এর মধ্যে অনেকখানি ভালবাসা ভরা আছে।...

নীলাঞ্জন দুষ্টু হাসি হেসে বলে, তার মানে পরোক্ষে ইশারা করছ, রোজগার করার আর ভালবাসা জানাবার সার্থকতা হচ্ছে বৌকে গহনা গড়িয়ে দেওয়া। কেমন? তা তোমার কর্তার আমলে সস্তা গণ্ডার কাল ছিল ওসব চলত। একশো টাকায় পাঁচ ভরি সোনা হত। এখন তাতে একটু সোনা ধোওয়া জলও হবে না। ফুল্লকুসুম তোমার প্রাণের নাত বৌকে সেটি বুঝিয়ে দাও।

ফুল্লকুসুম বললেন থাম তো। তোর সব সময় ফাজলামি। এখনকার মেয়েরা অত গহনা পরে না। তবে কি জানিস 'সোনা' জিনিসটা কখনো মূল্য হারায় না বলেই, সেটা ভালবাসা প্রকাশের প্রতীক বলে উপহার বা আশীর্বাদী দেওয়ার চলন। এই দেখ না সেই কোনকালের ভালবাসার জিনিস, আজ আর এক ভালবাসার জিনিসের গলায় পরিয়ে দিতে পারলাম। আর কোন জিনিস এমন হয়? আয় বাবা। যাত্রাটা করিয়ে নিই।...এই দ্যাখো সোমা, দু'জনে একসঙ্গে এই পূর্ণ ঘটটি প্রণাম করো। আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারায় 'ঘট' হচ্ছে জীবনের প্রতীক।...তাই সকল শুভ কাজে পূর্ণঘটের প্রাধান্য। জীবনটি যেন সর্বদা পূর্ণ থাকে।

নীলু প্রণাম করেই মাথা তুলে বলে, ওঃ বুঝেছি, সেইজন্যেই 'সর্বঘটে কাঁঠালী কলার' বিধান। সেটাও ভারতীয় জীবনের প্রতীকের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়।

ফুল্লকুসুম ভারী হয়ে আসা সুরকে চেষ্টা করে হালকা করে বলেন, ফের ফাজলামী?

কি করি বল? ভাবছি ওরই জোরে যদি 'লবণ সমুদ্রে' বাঁধ দেওয়া যায়। যেরকম মুখ চোখের ভাব দেখছি দুজনার।

কিন্তু লবণ সমুদ্রে কি বাঁধ দেওয়া গেল?

গাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ। শুধু গাড়ির চালকের সামনের আর্শিটিকে বাঁচিয়ে পরস্পরের হাতের ওপর হাত রেখে তাকেই হৃদয়ের যা প্রকাশ করা।

'পূর্ণঘট' শব্দটা কি তাহলে সত্যিই প্রতীকী?

একটু পরে সোমাই নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে, আমি যদি এইখানেই থাকতে পেতাম।

মাই গড্। আমায় তালাক দিয়ে?

আঃ। ভাল হবে না বলছি। বলছিলাম—যদি দুজনেই থাকা যেত। এখানে যেন কোন ভয় ভাবনা নেই। তোমাদের কলকাতার বাড়ি ভেবে 'ভয় ভয়' করছে।

কি কাণ্ড। তবে যে শুনি আধুনিক বৌয়েরা আর শ্বশুরবাড়িকে ভয় করে না, বরং শ্বশুরবাড়িই ভয়ে ভয়ে তাকে সমঝে চলে।

কোথায় শুনেছ?

সে কি আর মনে আছে? তবে মহিলামহল থেকেই শোনা।

ওই তো দেখছ তো। তোমরা স্বজাতিরাই পরস্পরকে ভীতিকর করে রেখেছ। ...অথচ তা না করলে জীবনটা কত সহজ হয়ে উঠত।...নিজেরাই নিজেদের সমস্যা-সমূহ সৃষ্টি করে। হতভাগা পুরুষ জাতটার ওপর সব দোষ চাপানো।... 'ভয়' ত্যাগ করো হে মহারানী! আমার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে দেখো।

সেটা আবার কি? মন্ত্র-তন্ত্রও জানা আছে না কি?

আছে। আছে।

একটু আলোর ধারা ছড়িয়ে পড়ে। আরে জীবন জিনিসটা যে আমুল-মাখন নয়! আসবেই কিছু বিরক্তিকর। 'বিরক্তিকর' ব্যাপারটাকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে সিরিয়াস ভাবে না নিয়ে গায়ে মাছি বসবার মত ঝেড়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে দেখো। দেখবে অনেক শান্তি। কিছুতেই 'রাগব না' ভাবতে পারলেই, কেউ কিছুতেই হারাতে পারে না। কিছুতেই জব্দ করতে পারবে না।

সোমা বলে ওঠে, সেটা ছেলেদের পক্ষে যত সহজ মেয়েদের পক্ষে তত নয়।

নীলাঞ্জন বলে, ওই তো! নিজেরাই নিজেদের গায়ে অক্ষমতার টিকিট সেঁটে রেখেছে।...যা ছেলেরা পারে, তো মেয়েরাই বা পারবে না কেন?...তাছাড়া তোমাদের আজকের মেয়েদের জীবন তা সেকালের মত গণ্ডিবদ্ধ নয়? তোমাদের সামনে কত সম্ভাবনা, কত পথ। তোমাদের জীবন তো—'হলুদ পাঁচফোড়নে'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার কথা নয়? তবে নিজেকেই নিজে সীমাবদ্ধ রাখবে কেন? ছোট ছোট স্বার্থই মানুষকে ক্রমশই ছোট করে ফেলে!

সোমা বলে, এসব কথা বুঝি তুমি তোমার ঠাকুমার কাছ থেকে শিখেছ?

নীলাঞ্জন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, কাছ থেকে কি না জানি না হয়ত কাছে থেকেই।...অস্বীকার করব না, 'আমার সংসার' অনেক সময় আমায় পীড়িত করে, কিন্তু কিছু তো করার নেই! সবাইকে তো বদলানো যায় না? কাউকেই কি যায়? তবু তার মধ্যে থেকেই ওরা 'বেচারী' ভেবেই 'ক্ষমা' করে নিতে হয়। তুমিও তা পারবে না? তোমার সঙ্গে আমি তো আছি। তোমার জন্যে আমি! একি হল, আবার লবণ সমুদ্রে এত ঢেউ লাগল কেন? দুঃখ পাবার মত কিছু বলে ফেলেছি না কি?

ড্রাইভারের উপস্থিতি বিস্মরণ হয়ে সোমা নিজেকে ভেঙে তার দেড়দিনের দেখা বরের কোলের ওপর ফেলে দিয়ে রুদ্ধস্বরে বলে, না না।

তবে?

কিছু না।

তাহলে ওঠো। মুখ তোলো।

নাঃ! উঠবে না সোমা। এই রকমই থাকবে সে। ভাল লাগছে ভীষণ ভাল লাগছে তার।

রুচিরা পুনোমা স্বাতীরা সোমার এই অধঃপতন দেখলে হয় তো ছিঃ ছিঃ করে উঠবে। বলবে শেষ পর্যন্ত তাহলে 'মন্ত্রশক্তিতে'ই বিশ্বাসী হলি? কি লজ্জা!

কিন্তু য় কি? ভাল লাগলে কি করবে সোমা? আচ্ছন্ন করে রাখা একটা অনাস্বাদিত ভাল লাগা।...কিসের 'শক্তি' তা কে ভাবতে বসবে এখন? 'মন্ত্রশক্তিই' কেন? 'প্রথম কদম ফুল' বা নয় কেন?

কুমারী মনও কি হঠাৎ কোন দিন একটু মাত্র দেখায় বাঁধা পড়ে যায় না? তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে না একটি অনাস্বাদিত ভাললাগায়?...সেটিকে তো 'প্রেম' বলে গণ্য করা হয়। তারজন্যেই তো জগতের যত কাব্য, যত স্তুতি।

সেই দেখাটির আগে কয়েকটা মন্ত্র পড়াপড়ির ব্যাপার ঘটে গেলেই সে প্রেম জাত হারাবে? তাহলে তো বলতে হয় স্বাতী রুচিরা পুনোমারাও একধরনের শুচিবাই গ্রস্ত। অথচ ওদের কাছে খেলো হয়ে যাবার ভয়েই হয় তো সোমা নিজেকে 'বোকা' বলে ভাবতে থাকবে, 'বেচারী' বলে ভাবতে শিখবে। জীবনের স্বাদ হারাবে।

হয়ত কখনো বা তাই হবে। তবু এখন সোমা তার ভাল লাগার কাছেই আত্মসমর্পণ করে বিহ্বল হয়ে পড়ে থাকে একটি সুখময় উপাধানে!